প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব

ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম.এ ; পি. এইচ. ডি

অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলকাতা। ভূতপূর্ব অতিথি অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

পরিবেশক

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ✆ ২২৪১-৬৯৮৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺সুধেন্দুনাথ ভট্টাচার্য
এবং পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ৺প্রতিভা ভট্টাচার্যের
শ্রীচরণারবিন্দে—

ভূমিকা

'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব' আমার গবেষণাকর্ম। আজ থেকে ২৩ বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই গবেষণাকর্মের জন্য পি.এইচ. ডি উপাধী দান করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাপণ্ডিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক স্বর্গতঃ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় আমি এই গবেষণা-কর্ম সম্পন্ন করেছিলাম। তাঁর চরণে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণতি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'তন্ত্রের প্রভাব' কথাটির দ্বারা আমি তন্ত্র-তত্ত্ব ও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রভাবকে নির্দেশ করেছি,—তন্ত্রগ্রন্থের প্রভাবকে নয়। তন্ত্রোক্ত ভাবনা ও তত্ত্ব এবং তান্ত্রিক সংস্কার কিভাবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রভাবিত করেছে, এই গ্রন্থে আমি তারই একটি রেখাচিত্র দান করেছি। বহুযুগব্যাপী যে তান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কার বাংলা ও বাঙ্গালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানস-চৈতন্যকে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে, সেই তান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। তন্ত্র ও তান্ত্রিকতা যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই বিষয়েরই আলোকপাত।

তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধন-ক্রম কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা তত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ; এগুলি হচ্ছে শিব-শক্তিতত্ত্ব, ষঠ্চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীযোগ-ক্রিয়া, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব প্রভৃতি। বিবিধ আসন, মুদ্রা, ন্যাস, যন্ত্র, মণ্ডল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তন্ত্র-সাধনার যে সুবিশাল পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছে, তা' নিঃসন্দেহে অন্যান্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতি থেকে পৃথক। শবসাধন, লতাসাধন, চিতাসাধন, চক্রানুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে যে জটিল সাধন-রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বিরাজিত, সেটিও সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রশাস্ত্রের স্বকীয় অবদান।

তন্ত্র কেবলমাত্র সাধন-শাস্ত্র নয়, তন্ত্র মানুষের জীবনচর্যা, মানস-প্রকর্ষ ও অধ্যাত্মতত্ত্বের এক পরিপূর্ণ বলয়।

ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মাদর্শ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে তান্ত্রিকধর্মের একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তন্ত্র মানুষের বাস্তব জগৎ ও জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার করে নি এবং ভোগমুখী মানুষকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে নি। বরং কামনা-বাসনাসক্ত, সংসার-জর্জরিত মানুষকে তন্ত্র স্বীয় অঙ্কে স্থান দান ক'রে তার পরমাশান্তি ও মুক্তির পথটি নির্দেশ করেছে। তন্ত্রশাস্ত্র একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ববিধ সমস্যার প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ সমাধানের ব্যবস্থা করেছে, অপর দিকে তেমনই আবার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিকতত্ত্বের সন্ধান দান করেছে।

জগৎ-সংসারের মর্মমূল থেকে অহরহঃ বহুবিচিত্র কামনা-বাসনার যে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, তন্ত্র তাকে স্তব্ধ করতে চায় নি, বরং সেই কামনার সরোবর থেকে মুক্তি-শতদল আহরণের পথ-নির্দেশ করেছে। প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে নিবৃত্তিতে আরোহণ, সংসার-স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান এবং মায়াময় বাস্তবজগতের মধ্য দিয়ে অনির্বচনীয় আত্মতত্ত্বে উত্তরণই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার মর্মকথা। এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্র ক্রিয়ামূলক। প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমেই তান্ত্রিকসাধক একের পর এক সোপান বেয়ে তত্ত্ব-দর্শনের আবাঙ্মনসগোচর লোকে উপনীত হন।

রমণীকে তন্ত্রশাস্ত্র 'নরকের দ্বার' বা ধর্মসাধনার পথে কন্টকস্বরূপ মনে করে নি, বরং রমণীকে সর্বকর্মের অধিকার দান করে অধ্যাত্ম-পথের অপরিহার্য সঙ্গিনীরূপে গ্রহন করেছে। যে শিবশক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধি তান্ত্রিক সাধনার পরমলক্ষ্য, তার মূলসূত্রটিই বিন্যস্ত রয়েছে শক্তিস্বরূপিণী নারীর মধ্যে। রমণীকে সুউচ্চ মহিমা-দান এবং উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মুক্তিবিধান বা শিবত্ব-প্রাপ্তির আয়োজনই হচ্ছে তন্ত্রের মৌলিক অবদান। তন্ত্রের এই উদার ও সার্বজনীন সাধন-পদ্ধতির আকর্ষণেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কোন না কোন ভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে যেভাবে অদ্বিতীয়া মহাশক্তির অখণ্ড প্রাধান্য ও শক্তিবাদের মহিমা বিঘোষিত হয়েছে, তা' ভারতের অন্য কোন ধর্ম-দর্শনে দেখা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতির ধর্মে এবং প্রাগার্যযুগের ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম ও আচারানুষ্ঠানের মধ্যে স্ত্রীদেবতার পূজার মধ্যে তান্ত্রিক শক্তিবাদেরই অস্ফুট আভাস পরিলক্ষিত হয়। শক্তিতত্ত্বকে আমি তন্ত্র-সাধনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করি। কারণ, শক্তিতত্ত্ব তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার মধ্যে যেরূপ গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিকশিত হয়েছে, তা' অন্যত্র হয় নি। বেদ-উপনিষদাদিতে শক্তিবাদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' তান্ত্রিকতারই দ্যোতক। পুরাণগ্রন্থসমূহে যেখানে শক্তিতত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা' তান্ত্রিক ভাবধারারই প্রতিফলন। কালক্রমে তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই এই শক্তিবাদ এবং শিবশক্তিতত্ত্ব বহুবিস্তৃত রূপলাভ করেছে। বস্তুতঃ, শক্তিসাধনার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতেই তন্ত্র-সাধনার সুবিশাল সৌধটি বিনির্মিত এবং পুরুষ-প্রকৃতিবাদ বা শিবশক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই তন্ত্রোক্ত সকল আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়া-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

তন্ত্রের এই বিশিষ্ট তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন-ক্রিয়া কালপ্রবাহে ভারতের বৌদ্ধসহজিয়া, নাথধর্ম, বৈষ্ণবসহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মর্তব্য যে, বৌদ্ধতন্ত্র থেকে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি হয় নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অধিকাংশ মনীষীর অভিমত হচ্ছে যে, ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির আমলেই তান্ত্রিক আচার ও সাধনার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই যে ভারতে তন্ত্রধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, এবং ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায়ই তন্ত্র-সাধনার মূলতত্ত্বগুলি অনুশীলিত হত, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আমি গ্রন্থ-মধ্যে এ'বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রাচীনত্বের উপর নির্ভর করে না। তান্ত্রিক সাধন-তত্ত্ব ও তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানাদির অনুশীলন ও প্রচলনের প্রাচীনত্বই তন্ত্রের প্রাচীনতার নির্দেশ করে। এই গ্রন্থে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রোক্ত সাধনা অনুশীলিত ও অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। ভারতের বিভিন্ন পর্বতগাত্রে, মন্দিরে এবং প্রাচীন পুঁথি-পত্রে তান্ত্রিক যন্ত্র, মণ্ডল, মুদ্রা, দেবদেবী প্রভৃতির যে সমস্ত চিত্র ও বর্ণনা পাওয়া যায়, তার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই ভারতে তন্ত্রের ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার

উল্লেখ থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তান্ত্রিক আচার ও ক্রিয়াদি প্রাপ্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তন্ত্রের সার্বজনীন আবেদন এবং তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপক চর্চা ও জনপ্রিয়তার ফলে তন্ত্রগ্রন্থগুলি পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, তান্ত্রিক সাধন-রহস্যের মূলতত্ত্বগুলি সর্বত্রই অপরিবর্তিত রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সাধন-পদ্ধতি ও ক্রিয়ারীতির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও তান্ত্রিক দর্শন ও তত্ত্ব সর্বত্রই এক ও অভিন্ন।

ভারতের সর্বত্রই বিভিন্ন প্রদেশের লিপিতে লিখিত তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রবিষয়ক বহু পুঁথি পাওয়া যায়। এই সমস্ত পুঁথির অনেকগুলির অক্ষর বেশ প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের তন্ত্র ও শৈবাগম বিষয়ক কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, মাদ্রাজ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় তান্ত্রিক পুঁথি রক্ষিত আছে।

বস্তুতঃ, আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার ধারা প্রবাহটি বহমান। বাংলাদেশও তন্ত্র সাধনার এক প্রাচীন পীঠভূমি। বাংলার সমাজ-জীবন, ধর্ম-চেতনা ও সংস্কৃতিতে তান্ত্রিক সংস্কার গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত। তন্ত্রোক্ত কায়াসাধনার ধারাটি বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে এবং আজও বাংলার জাতীয় জীবন ও ধর্মসংস্কারে তন্ত্রপ্রভাব বলিষ্ঠভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে আমি এই তন্ত্র-প্রভাব নির্ণয়েরই প্রয়াস পেয়েছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের কাল-পর্বে বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী এবং চিন্তাধারাকে তন্ত্র-তত্ত্ব ও তান্ত্রিক ধ্যানধারণা কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সেই সেই ধর্মসম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্য-ধারায় তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারা কতখানি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, সেই বিষয়টি আমি এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কয়েকটি সাহিত্যশাখায় তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তিতত্ত্ব, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব প্রভৃতি কিভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে, তারই একটি ধারাবাহিক আলোচনা এই গ্রন্থটি। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে এবং বাঙ্গালীর মনোভূমিতে যে তান্ত্রিক সংস্কার বিজড়িত রয়েছে, তা'ই বিচিত্ররূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এই তন্ত্র-প্রভাবের স্বরূপ-নির্ণয়ে আমি বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দান করেছি এবং ভিন্ন ভিন্ন

সাহিত্যশাখায় একই তান্ত্রিকতত্ত্বের প্রতিফলনের জন্য কোন কোন উদ্ধৃতির পুনরুল্লেখ করেছি। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় সমস্ত উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ দেওয়া সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যে-সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থের বচনসমূহ উল্লিখিত হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই মধ্যযুগের প্রখ্যাত তন্ত্র-সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলি বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বাংলার এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে যে সমস্ত তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হয়েছে, তাতেও ঐ সমস্ত মূল তন্ত্রগ্রন্থগুলির উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, সামান্য পাঠভেদ সত্ত্বেও বহু পূর্ব থেকেই তান্ত্রিক সাধনধারার সঙ্গে ঐ সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ, এখানে তন্ত্র-তত্ত্ব, তান্ত্রিক সাধন-প্রক্রিয়া, তান্ত্রিক সংস্কার ও চেতনার প্রভাবকেই বুঝতে হবে।

বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীজাতির ঐতিহ্যের এক প্রধান অঙ্গ ও উপাদান তন্ত্র ও তান্ত্রিকতা। আবহমানকাল থেকে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাংলার জনজীবন ও জনমানসে তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণা ও তন্ত্র-প্রভাবজাত শাক্তসংস্কার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আজও বিদ্যমান। বাঙ্গালী মানসের এই তন্ত্র-চেতনা বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাবনাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেই নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই তান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে তন্ত্র-ভাবনা ও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমি সম্প্রতি একটি গবেষণা সমাপ্ত করেছি। আশাকরি, কিছুদিনের মধ্যেই সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সেটি উপস্থাপিত করতে পারব।

তন্ত্র-চেতনা এবং তন্ত্রোদ্ভূত শাক্ত-সংস্কারের সঙ্গে প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের এক নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তন্ত্রতত্ত্ব ও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের যথার্থ রসাস্বাদন ও পঠন-পাঠন সম্ভব নয়। এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য করেই আমি একদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলাম। আজ বহুবৎসর পরে সুধীজনের নিকট সেই গবেষণার ফসল

উপস্থাপিত করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করছি। নানাকারণে গ্রন্থ প্রকাশে সুদীর্ঘ বিলম্ব ঘটেছে। তবে এই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমি আলোচনা করেছি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করেছি।

পরিশেষে একটি কথা বলি। তন্ত্র ও তান্ত্রিকতা সম্পর্কে সাধারণ জনমানসে একটা ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণা বিদ্যমান। আমার এই আলোচনা সেই অস্বচ্ছ ধারণার নিরসন করবে। গ্রন্থটি তন্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু সর্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য নিবারণে যেমন সাহায্য করবে, তেমনই বাংলা সাহিত্যের সেবক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরও উপকার সাধন করবে।

প্রুফ্-সংশোধনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে, সহৃদয় পাঠক সেটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন। গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদৃত হলে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য জ্ঞান করব। ইতি—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার পরিচয়

তন্ত্রের সংজ্ঞা ও পরিচয় ঃ

'তন্ত্র' শব্দটি বহুল প্রচলিত ; বিভিন্ন অর্থে এটি প্রযুক্ত হয়। 'স্ব-তন্ত্র', 'পরতন্ত্র', 'স্বেচ্ছাতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দগুলির অন্তর্গত 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ অধীন। সংস্কৃত সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ 'পঞ্চতন্ত্র' কথাটি পাঁচটি প্রসঙ্গ বা গল্পের সমষ্টিকে নির্দেশ করে। বিশেষ বিশেষ মতবাদ, রাজশাসন-পদ্ধতি প্রভৃতিও 'তন্ত্র' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়; যেমন,—প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। 'শতপথ-ব্রাহ্মণ', 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 'তন্ত্র' শব্দটি প্রধান অংশ বা সারাংশ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কেউ কেউ বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু থেকে 'তন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দেশ করেছেন,—"তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্", অর্থাৎ যার দ্বারা জ্ঞান বিস্তার বা বর্ধিত হয়, তা-ই তন্ত্র। এদিক থেকে 'তন্ত্র' শব্দশাস্ত্র বা দর্শনমাত্রকেই নির্দেশ করে ;যেমন সাংখ্যাদর্শনের নাম 'কপিলতন্ত্র' বা 'ষষ্ঠিতন্ত্র', ন্যায়দর্শনের নাম 'গোতমতন্ত্র', মীমাংসাদর্শনের নাম 'পূর্বতন্ত্র', বেদান্তদর্শনের নাম 'উত্তরতন্ত্র'। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভাগ বিশেষ অর্থেও 'তন্ত্র' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

তন্ত্র মানুষের সমস্ত অবিদ্যা বা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত ক'রে মানুষকে ত্রাণ করে বা আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত করে। তাই বলা হয়েছে যে,—

> "তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতান্।
> ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রত্যিভিধীয়তে।।"[১]

অর্থাৎ 'তন্ত্র' তত্ত্বমন্ত্র-সমন্বিত যে জ্ঞানের বিস্তার-সাধন ঘটায়, তা' মানুষকে ত্রাণ বা রক্ষা করে। তন্ত্র হচ্ছে বিশেষ সাধনতত্ত্ব বা উপাসনাপদ্ধতি-সমন্বিত শাস্ত্রবিশেষ এবং মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলসাধনের উপায় সমূহ তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্র মানুষের জাগতিক সর্ববিধ প্রয়োজনসিদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছে। তন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই বলা হয়েছে যে,—".....the tantra means knowledge of a systemetic and scientific expirimental method which offers the possibility of expanding

man's Consciousness and faculties, a process through which the individual's inherent, spiritual powers can be realized. "[২]

আগম, নিগম, যামল, সংহিতা, ডামর ইত্যাদি বিভাগে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশাল পরিধিটি রচিত। 'আগম' ও 'নিগম' হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ। 'আগম' ও 'নিগমে'র নিম্নোদ্ধৃত সংজ্ঞাটি সবিশেষ প্রচলিত ;যথা,—

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে।।
নির্গতো গিরিজা বক্ত্রাৎ গতশ্চ গিরিশশ্রুতিম্।
মতশ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে।।"[৩]

শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম 'আগম' এবং ভগবতীপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম 'নিগম'। বাসুদেব-সম্মত বলার তাৎপর্য এই যে, তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ নয়। তন্ত্রশাস্ত্রে 'সংহিতা' ভাগ সাধারণতঃ বৈষ্ণবতন্ত্রকে নির্দেশ করে।

'বারাহীতন্ত্রে' আগমের লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে যে,—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ।।
ষট্‌কর্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগ চতুর্বিধাঃ
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্‌বিদুর্বুধাঃ।।"

অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার্চনা, সকলের সাধন, ষট্‌কর্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ—এই সাতটি যাতে আছে, তা' আগম। কিন্তু এই লক্ষণগুলির দ্বারা সমস্ত তন্ত্র ও আগমের বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওযা যায় না। বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্চা—এই চারটি পাদ বা অংশে 'মতঙ্গপরমেশ্বরী' তন্ত্রের যে বিভাগ দৃষ্ট হয়, তার দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্র বিপুল এবং তন্ত্রগ্রন্থও অজস্র। তন্ত্রশাস্ত্রে ও তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত বা আলোচিত বিষয়বস্তু এইরূপ ঃ—তন্ত্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ, তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা, শিবশক্তিতত্ত্ব ও সৃষ্টিরহস্য, গুরু ও শিষ্য, দীক্ষা ও অভিষেক, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব, বিভিন্ন আচার ও ভাব, নানারকম সাধনপদ্ধতি এবং পঞ্চতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, যন্ত্র-মুদ্রা-ন্যাস-সিদ্ধি প্রভৃতি। এছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রে দেবতাদের সংস্থান, তীর্থসমূহের বর্ণনা, আশ্রমধর্মের বিবরণ, জ্যোতিষ্কগণের সংস্থিতি, প্রাচীন ইতিবৃত্তাদি কথন, শুদ্ধাশুদ্ধিতত্ত্বনিরূপণ, স্বর্গ-নরকের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম প্রভৃতি বহুবিচিত্র বিষয়ের আলোচনা রয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় হচ্ছে ক্রিয়া ও দর্শন। তন্ত্র মূলতঃ ক্রিয়ামূলক এবং ক্রিয়া থেকেই সর্বপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভব।

"The main object of the Tantra Literture is to indicate and explain the practical method for realising the truth, and so, the abstract metaphysical speculations could never find any prominence in it. * * * In short, the Tantra whether Hindu or Buddhistic, has to be regarded as an independent religious literature, which utilised relevant philosophical doctrines, but the origine of which may not be traced to any system or systems of philosophy; it contains essentially of religious methods and practices which are current in India from a very old time."[8]

তন্ত্রশাস্ত্র সর্বদাই প্রত্যক্ষকে অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হয়েছে ; এ' সম্পর্কে 'কুলার্ণবতন্ত্রে'র (২।৮৮-৯০) নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয় ঃ—

"কুলং প্রমাণতাং যাতি প্রত্যক্ষফলদং যতঃ।।
প্রত্যক্ষঞ্চ প্রমাণায় সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রিয়ে।
উপলব্ধিবলাত্তস্য হতাঃ সর্বে কুতার্কিকাঃ।।
পরোক্ষং কোনু জানীতে কস্য কিং ভবিষ্যতি।
যদ্ বা প্রত্যক্ষফলদং তদেবোত্তম দর্শনম্।।"

অর্থাৎ কুলশাস্ত্র (তন্ত্রশাস্ত্র) নিত্য প্রমাণ, যেহেতু তা' প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ। সমস্ত প্রাণীর কাছেই প্রত্যক্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হয়, সেক্ষেত্রে কুতার্কিক হত বা পরাস্ত হয়। কে পরোক্ষ জানতে পারে? কার কি হবে কে জানে? যা' প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করে, তাই উত্তম দর্শন।

এটাই হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান কথা। তন্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্র। চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতির ন্যায় তন্ত্রকেও প্রত্যক্ষশাস্ত্র বলা হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রকে মন্ত্রশাস্ত্রও বলা হয় ; কিন্তু মন্ত্রের যে অচিন্তনীয় শক্তি, তা' যোগ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না।

"ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা স্যাসৌ।
দ্বয়েবভ্যাস যোগেন শাস্ত্রসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।।"

যোগের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হয় না এবং মন্ত্রার্থ ত্যাগ ক'রে যোগাভ্যাসও পরমার্থ লাভের সহায়ক নয়। তন্ত্র হচ্ছে কর্ম এবং জ্ঞান-মিশ্রিত উপাসনাশাস্ত্র।

অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রে যোগের সঙ্গে ভোগের একটা বিরোধ বা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে যোগ ও ভোগের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। তন্ত্রমার্গে যোগ ও ভোগের যুগপৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোক্ষলাভের পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

(১) "যোগ-ভোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ কৌলং সমভ্যসেৎ।"

—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (২।১২)।

[কৌলমার্গটি যোগ ও ভোগ উভয়স্বরূপ। অতএব, কৌলমার্গের অভ্যাস করবে।]

(২) "যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেন্নৈব যোগবান্।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্বাধিকং প্রিয়ে।।"

—'কুলার্ণবতন্ত্র', (২। ২৪)।

[প্রিয়ে, কৌল ভিন্ন অন্নমতে যদি কেউ যোগী হয়, তা' হলে সে ভোগী হতে পারবে না, আর ভোগী হলে যোগী হতে পারে না। কিন্তু, কৌলমত (তন্ত্র-সাধনার সর্বশেষ ও সর্বোত্তম আচার কৌলাচার) ভোগযোগাত্মক। সেজন্য কৌলমত সর্বশ্রেষ্ঠ।]

ভোগ ও যোগ এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধনই হচ্ছে অন্ত্রশাস্ত্রের মৌলিক অবদান।

তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত উপাসনা বা সাধন-পদ্ধতির অন্তর্গত প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছে বিভিন্ন দেবতার মূলমন্ত্র ও বীজমন্ত্র, আসন, ন্যাস, মুদ্রা, দেবতার প্রতীকরূপী বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, 'পঞ্চমকারে'র (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন) ব্যবহার, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন প্রভৃতি ষট্‌কর্মসাধন, কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ, যোগ-প্রক্রিযা, জপ, ধ্যান, পুরশ্চরণ প্রভৃতি।

তন্ত্রশাস্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করে নি, মানবজীবনের ও সমাজের প্রায় সর্ব বিষয়ই তন্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, সমাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। তন্ত্র মানুষের দৈহিক, নৈতিক, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সর্ব বিধ আয়োজন করেছে বলেই তন্ত্রোক্ত সাধন-পথ বহুবিচিত্র ও ব্যাপক।

তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার প্রাচীনত্ব

তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা অত্যন্ত প্রাচীন। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানগুলির ধারা-প্রবাহ সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকদের মধ্যে নানাভাবে চলে আসছে। "তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমানে যে সকল তন্ত্র-গ্রন্থ আমরা পাই, তাহা যে সময়ের লেখাই হউক না, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানাদেশের লোকের মধ্যে নানাভাবে চলিয়া আসিতেছে।"[৫] মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, দৈব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইচ্ছানুরূপ ফললাভ, মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ষট্‌কর্মাদির অনুরূপ ক্রিয়া, উপাসনায় মদ্যাদির ব্যবহার প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

বশীকরণ তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের অন্তর্গত একটা বিশেষ অঙ্গ। অপরকে বশীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুপ্রাচীন কালেও আচরিত হত। মোম বা অনুরূপ কোন দ্রব্যের দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি নির্মাণপূর্বক সেটিকে অভিমন্ত্রিত করা এবং শত্রুর অঙ্গাদি বিনষ্টি অথবা প্রাণনাশের জন্য নখাদির দ্বারা ঐ প্রতিকৃতিকে আহত বা অগ্নিতে দগ্ধ করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ইরানীয়দের মধ্যেও এইরকম আচার প্রচলিত ছিল।[৬]

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোমের 'পান' পূজায়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে অনুষ্ঠিত স্ত্রী-সঙ্গাদি কার্যে ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক ধর্মসাধনার প্রথা দেখা যায়।[৭] ওয়াল সাহেবের মতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে লিঙ্গপূজার প্রভাব দেখা যায়। সুপ্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে শিবলিঙ্গের অনুরূপ লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। স্যার উইলিয়ম জোনস্ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে মিশরবাসীদের 'আসিরিস' ও 'আইসিসে'র সঙ্গে ভারতবাসীদের মহাদেব ও পার্বতীর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুতঃ, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতি ও ধর্মের মধ্যে মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের প্রতি বিশ্বাস, তন্ত্রোক্ত আসন, মুদ্রা ও ন্যাসের ন্যায় বিভিন্ন দৈহিক প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ধর্মসাধনায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, আভিচারিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন প্রভৃতি প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানগুলি তন্ত্রসাধনার প্রাচীনত্ব সুচনা করে।[৮]

ভারতে তান্ত্রিক আচার ও অনুষ্ঠানের নিদর্শন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পাওযা যায়। ব্রুস্‌ফুটের আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি লিঙ্গমূর্তির মধ্যে তান্ত্রিকতার একটা পূর্বাভাস রয়েছে।[৯] পণ্ডিতগণের অনুমান যে, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্যজাতির মধ্যে তান্ত্রিক

আচার ও সংস্কারের ন্যায় অনেক আচার ও ধর্ম-বিশ্বাস সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োতে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষসমূহের গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা মাতৃ-দেবতা শক্তি ও পুরুষদেবতা শিবের উপাসক ছিল। স্যার জন মার্শাল,[১০] ফাদার হেরাস,[১১] জ্যাক ফিনিগান,[১২] প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে শিব-শক্তির উপাসনা, পশু ও বৃক্ষাদির পূজা প্রচলিত ছিল এবং সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত পুরুষমূর্তিটি পশুপতি শিবের বলে অনুমিত হয়। মাতৃপূজার নিদর্শনস্বরূপ সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র থেকে অনেক মাতৃকাদেবীর ক্ষুদ্রকায়া মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

প্রাগার্যযুগের ভারতের আদিম আর্যেতর জাতির ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তান্ত্রিক সংস্কারের যে একটা যোগসূত্র রয়েছে, তা' অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক শ্যামশাস্ত্রীর মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের হাজার বছর পূর্বেই ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কতকগুলি ভারতীয় মুদ্রার উপর অঙ্কিত চিহ্নসমূহকে তান্ত্রিক যন্ত্র বলে অনুমান করেছেন।[১৩] বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার প্রতিফলন বিদ্যমান। এ' প্রসঙ্গে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য,—"Elements of varions Tantra rites are distinctly traceable to the vedic times, though there is a great Controversy among scholars of old as regards the question whether Tantras had a vedic origin or not. It is not only in the Atharvaveda—one of the latest of vedic Samhitas—that we meet with these elements. They are to be found even in the earliest of the vedic works, e.g., the Ṛgveda, as also in the other parts of the vedic Literature."[১৪]

. ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্তে' (১০।১২৫) ও 'রাত্রিসূক্তে' (১০।১০।১২৭) এবং সামবেদের 'রাত্রিসূক্তে' (৩।৮।২) তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্ব বা শক্তিমাহাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে তান্ত্রিক বীজমন্ত্রাদির স্বাক্ষর রয়েছে। অনেকের ধারণা এই যে, তন্ত্রমতের উৎস হচ্ছে অথর্ববেদের 'সৌভাগ্যকাণ্ড' এবং কোন কোন তন্ত্রে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর 'কালীকুলার্ণবতন্ত্রে'র পুঁথির প্রথমেই রয়েছে,— "অথাত আথর্বণসংহিতায়াং দেবুবাচ।" 'রুদ্রযামল' তন্ত্রের সপ্তদশ পটলে মহাদেবীকে অথর্ববেদশাখিনী বলা হয়েছে। দামোদর কৃত 'যন্ত্রচিন্তামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-প্রশংসা

প্রসঙ্গে তাকে অথর্ববেদসারভূত বলা হয়েছে।[১৫] তন্ত্রের বামাচারী সাধনার অনুষ্ঠানাদি এবং মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মের সঙ্গে অথর্ববেদোক্ত কৃত্যা ও অভিচারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রযেছে। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 'অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে অথর্ববেদের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে নির্ণয় ক'রে বলেছেন যে,—"প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রবিদ্যার কথা এতে (অথর্ববেদে) যত বেশী আছে, অপর কোন বেদে সেরূপ নেই।... ভারতীয় তন্ত্রবিদ্যা ও গৃহ্যকর্ম কোন্ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে কে জানে? অথর্ববেদেই একমাত্র ঐদিকটি ধরা রয়েছে?"[১৬] অধ্যাপক শ্যামশাস্ত্রী প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, অথর্ববেদ, তৈত্তিরিয় আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে তান্ত্রিক মন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৭] ঐতরেয়-আরণ্যকে (৪।২৭) তান্ত্রিকমন্ত্রের অনুরূপ যে মন্ত্রটি পাওয়া যাচ্ছে, তা' সায়ণাচার্যের মতে অভিচার-কর্মে প্রযুক্ত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের ধর্মসাধনার অঙ্গহিসাবে মদ্য বা মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, পশুবলি, স্ত্রী-সঙ্গাদি প্রভৃতির নিদর্শন বেদ-উপনিষদের বিভিন স্থানে পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণ', 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ্ (১।৪, ৬।৪) প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রী-সঙ্গাদির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতিপাদন, ছান্দোগ্য উপনিষদের 'বামদেব্য' উপাসনার বৈশিষ্ট্য, সৌত্রামণিযজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ প্রভৃতিতে দেবগণকে সুরা প্রদান, বৈদিক যজ্ঞে অশ্ব, মেষ, বৃষ, ছাগ বলিদান প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক সাধনার নরবলির ন্যায় বৈদিক 'পুরুষমেধ' যজ্ঞে মানুষবলির বিধান ছিল বলে জানা যায়।[১৮]

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে (১৪৫,১৫৯ সূক্তে) সপত্নী বিনাশ ও পতিবশীকরণের মন্ত্র, দস্যু তস্করগণ কর্তৃক গৃহস্থদের ঘুম-পাড়ানোর মন্ত্র (৭।৫৫), স্ত্রীলোকের গর্ভপাত নিবারণের মন্ত্র (১০।১২২), রোগ-উপশমের মন্ত্র (১০।১৬৩); তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৩।৯।১) সংগ্রাহণী নামক ইষ্টির বিবরণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (২।৩।১০) প্রজাপতি দুহিতা সীতার সোমকে বশীভূত করার জন্য আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম ও ক্রিয়াদির স্বাক্ষর রয়েছে। 'কুলার্ণবতন্ত্রে' (২।১০) কৌলাচারের বৈদিকত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। এই তন্ত্রে কুলশাস্ত্রকে বেদাত্মক বলে নির্দেশ করা হযেছে এবং কুলাচারের মূলীভূত কয়েকটি শ্রুতি উদ্ধৃত হয়েছে। যথা,—

(১) "এতান্যেব কুলস্যাপি ষড়ঙ্গানি ভবন্তি হি।
তস্মাদ্ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে।।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (২।৮৬)।

(২) "কুলশাস্ত্রাণি সর্বাণি ময়েবোক্তানি পার্বতি।
প্রমাণানি ন সন্দেহো ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।।

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মধু বাতা ঋতায়তে।
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া ক্ষীরং সর্পিমধূদকম্।।
হিরণ্যপাবাঃ খাদিশ্চ অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।
দীক্ষামুপেয়াদিক্যাদ্যাঃ প্রমাণং শ্রুতয়ঃ প্রিয়ে।।"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (২।১৪০-১৪২)।

'সৌন্দর্যলহরী'র ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লক্ষ্মীধর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক থেকে শ্রুতি উদ্ধার ক'রে তন্ত্রোক্ত শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী দেবীর বৈদিকত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

বস্তুতঃ সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন-ধারার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ—

"…. বৈদিক ধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত এবং বহু তান্ত্রিক বিষয় অতি প্রাচীন সময় থেকেই পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ….ভারতবর্ষের প্রায় সবক্ষেত্রেই বৈদিক সংস্কৃতির সমান্তরালভাবে তান্ত্রিক সংস্কৃতির বিস্তার হইয়াছিল। কোনো কোনো সময়ে ইহার স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা ছিল, কখনও তটস্থরূপ এবং কখনও অঙ্গীভূতরূপে। কখনও কখনও প্রতিকূলরূপেও এই সংস্কৃতির প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু সর্বদা ও সর্বত্র ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশরূপেই পরিগণিত হইত।"[১৯]

ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব-কালেও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানাদির প্রচলন ছিল। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন স্থানে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'তেবিজ্জসুত্ত' থেকে জানা যায় যে, একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীর রক্ষা ও অনিষ্ট দূর করার জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন এবং কেউ কেউ অপরের উন্নতি ও অবনতি সাধনের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। 'ব্রহ্মজালসুত্তে'ও তান্ত্রিক আচারের ন্যায় বিভিন আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২০]

'মহাভারতে' তন্ত্র-আগম এবং 'পাশুপত' (শৈবতান্ত্রিক), 'পাঞ্চরাত্র' (বৈষ্ণবতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায় বিশেষ) সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে। যথা,—

(১) "সত্যং যজ্ঞস্তপো বেদাস্তন্ত্রা মন্ত্রাঃ সরস্বতী।।"
—(শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ১৯৯ অধ্যায়)।

(২) "যানীহাবগমশাস্ত্রাণি যাশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্।।"
—(অনুশাসনপর্ব, ১২২ অধ্যায়)।

(৩) "সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।"
—(শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ৩৪৯ অধ্যায়)।

'রামায়ণে' তান্ত্রিকতার প্রভাব প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুখময় ভট্টাচার্য বলেছেন যে,—"লঙ্কায় নিকুম্ভিলায় ভদ্রকালীর মন্দির ছিল। ইন্দ্রাজিৎ সেই দেবীর পূজা করিতেন।... রাক্ষস সমাজের সভ্যতার আচরণে বেদ ও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।"[২১]

প্রাচীন ধর্মসূত্র ও সংহিতাগুলির মধ্যে 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্র,' 'ব্রহ্মসূত্র', 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা' প্রভৃতিতে তান্ত্রিকতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে ভগবান বুদ্ধের সময়ে ভারতে তান্ত্রিকতার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল।[২১] শাক্যসিংহের জীবনবৃত্তান্ত 'ললিতবিস্তরে' উল্লিখিত আছে,—"নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম,"—অর্থাৎ নিগম, পুরাণ, বেদ প্রভৃতিতে বুদ্ধদেবের সর্বাপেক্ষা বিশেষ্যত্ব ছিল।[২২] 'নিগম' তন্ত্রশাস্ত্রেই বিভাগ বিশেষ। পালি 'ত্রিপিটকে' বর্ণিত বুদ্ধদেবের মূলশিক্ষার মধ্যেও স্থানে স্থানে তান্ত্রিকতার বীজ দেখা যায়।[২৩]

'মার্কণ্ডেয়পুরাণ','লিঙ্গপুরাণ', 'বরাহপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'ব্রহ্মাপুরাণ' প্রভৃতি পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই যে তান্ত্রিকতার প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে।

শঙ্করাচার্য (খ্রীঃ ৮ম-৯ম শতক) তাঁর 'আনন্দলহরী' ও 'শাক্তামোদে' তন্ত্রকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন এবং 'শারীরিক ভাষ্যে' তিনি ষট্‌চক্রের উল্লেখ করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্রটি শঙ্করাচার্যের রচনা বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন।[২৪] শঙ্করাচার্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠে তন্ত্রোক্তদেবী শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রবর্তন করেছিলেন।[২৫] বস্তুতঃ, শঙ্করাচার্যের সময়ে যে সমগ্র ভারতবর্ষে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিকধর্মের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে তন্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তান্ত্রিক সাধনার ধারা-প্রবাহটি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত হলেও প্রাপ্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলি সমস্তই যে প্রাচীন, সেকথা বলা যায় না। কোন কোন তন্ত্র গ্রন্থে আধুনিকতার স্বাক্ষর যে বিদ্যমান, তার নিদর্শনস্বরূপ 'যোগিনীতন্ত্রে 'র কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণু সিংহ বা বেণুসিংহের বিবরণ, 'মেরুতন্ত্রে'র ইংরেজ জাতি ও লণ্ডনের কথা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাই বলে সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলিই অর্বাচীন, এ'কথা আদৌ সত্য নয়। 'যোগিনীতন্ত্র' সম্পর্কে বলা যায় যে, স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে' এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে 'যোগিনীতন্ত্রে'র উল্লেখ আছে। এঁরা খ্রীষ্টীয়

ষোড়শ শতকের ব্যক্তি। কোচবিহাররাজ বিষ্ণুসিংহের রাজত্ব তিনশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অতএব 'যোগিনীতন্ত্রে' কোচবিহার রাজবংশের উল্লেখ পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত, এ'কথা বলা যায়।[২৬]

তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থই যে অত্যন্ত প্রাচীন, সে' বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গুপ্তযুগে লিখিত তন্ত্রগ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে লিখিত 'কুব্জিকাতন্ত্রে'র একটা পাণ্ডুলিপি কলকাতার বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'নিশ্বাস সংহিতা' ও 'সর্বজ্ঞানোত্তর' তন্ত্রের পুঁথি দুটিও গুপ্তাক্ষরে লিখিত।[২৭] পল্লবরাজ রাজসিংহ বর্মার (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কৈলাশনাথ মন্দির লিপিতে দাক্ষিনাত্যের অষ্টাবিংশতি শৈবাগমের উল্লেখ রয়েছে এবং নবম দশম শতাব্দীর তামিল শৈব কবিগণের রচনায় ও তৎকালীন কাশ্মীরের শৈবসাহিত্যে এই আগম সাহিত্যের উল্লেখ আছ। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে অষ্টাদশ শৈবআগম নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগে আবির্ভূত হয়। গুপ্তযুগে ভারতে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা এবং তন্ত্রধর্মের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতগণের মতে বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থের পূর্বরূপের স্বাক্ষর বৌদ্ধধারণীগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলির আবির্ভাব হয়।[২৮] খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর নিদর্শনরূপে কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায়। জাপানের হরিউজি বিহারে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হস্তলিখিত পাঁচখানি তন্ত্রগ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ অঁমোঘবজ্র ৭৪৬-৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে গমন করেছিলেন এবং তিনি চীনা ভাষায় 'বজ্রকুমারতন্ত্র', 'উষ্ণিষচক্রবর্তিতন্ত্র', 'গরুড় গর্ভতন্ত্র' প্রভৃতি কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। অতীশ দীপঙ্করের চতুর্বিধ তন্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে কম্বোজে তন্ত্রসাধনা এবং কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ নীত হয়েছিল। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে এই তন্ত্রগ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং শৈবাগমের অন্তর্গত।[২৯] এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐ. তন্ত্রগ্রন্থগুলি বহুপূর্ব থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের কৌলাচার এবং কৌলমার্গ-সম্পর্কন্বিত 'মহাকৌলজ্ঞান বিনির্ণয়,' 'তন্ত্রালোক' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে কৌলতান্ত্রিকদের সাধনার ধারা চলে আসছে। অভিনব গুপ্তের (খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দী) 'তন্ত্রালোক' গ্রন্থটিতে তান্ত্রিক কৌলাচার ও কৌলশাস্ত্র সম্পর্কে সুসংবদ্ধ বিস্তৃত আলোচনা রযেছে। অভিনব গুপ্তের কৌলগুরু ছিলেন শম্ভুনাথ এবং তিনি এই গুরুর কাছ থেকে কৌলশাস্ত্র ও সাধনা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য জলন্ধরে গিয়েছিলেন। এর থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তন্ত্রের কৌলধর্ম ও

কৌলশাস্ত্রের চর্চা ভারতে বহু পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই যে প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আবিষ্কৃত তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের অজস্র পুঁথির দ্বারা। এই সমস্ত তান্ত্রিক পুঁথির মধ্যে কতকগুলির অক্ষর অত্যন্ত প্রাচীন।

ভারতের কামরূপ, জালন্ধর, পূর্ণ গিরি, উড্ডীয়ান প্রভৃতি প্রাচীন পীঠস্থানগুলি তান্ত্রিক সাধনার প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। বিভিন পুরাণ-সংহিতা গ্রন্থে এবং প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে তান্ত্রিকাচার ও তন্ত্রোপাসনার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে সমস্ত উক্তি ও মন্তব্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়,[৩১] তার দ্বারাও স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল।

অতএব, বর্তমানকালে কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থকে আমরা যে আকারেই পাই না কেন, তার দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের অর্বাচীনত্ব প্রমাণ করা যায় না। এ' প্রসঙ্গে ডঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ;—"It thus seems that several of the Tantras are fairly old, some going back as early as the begining of the christian era. But it is most likely that like the Purana literature the Tantra literature also swelled in course of time with introduction of fresh material in the form of new works or interpolated passages."[৩২] তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার ধারা-প্রবাহটি সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশেও তন্ত্র অনুশীলিত হত।

তন্ত্র ও অন্যান্যশাস্ত্র

তন্ত্র সম্বন্ধে আজও এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা উন্নাসিকতা দেখা যায়। কেউ কেউ তন্ত্রমার্গকে বেদ-বিরুদ্ধ বলেছেন এবং কোন কোন পুরাণে তন্ত্র-নিন্দা পরিদৃষ্ট হয়। অনেক বেদপন্থী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তান্ত্রিকদের বিরোধ এবং ঐ বিরোধে তান্ত্রিক আচার্যদের শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা তন্ত্রের প্রামাণিকতা ও বৈদিকত্ব স্থাপনের ঐকান্তিক প্রয়াস দেখা যায়।[৩৩] আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তন্ত্রের সঙ্গে বেদের সম্পর্ক রয়েছে। তন্ত্রের উৎস ভূমি যাই হোক না কেন,—তন্ত্রশাস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র ও দর্শন বিচার করলে দেখা যায় যে, তন্ত্র বেদ-সমর্থিত সাধনশাস্ত্র। হিন্দুধর্ম বেদ-বিরুদ্ধ কোন ধর্মকেই স্বীকার করে নি, তার প্রমাণ বৌদ্ধধর্মের পরিণতি। অথচ, তন্ত্র-ধর্ম সেই সুপ্রাচীনকাল

থেকে আজও নানা আকারে ও নানাভাবে বিকশিত ও প্রবাহিত। বেদ হচ্ছে সমগ্র সনাতনধর্মের একমাত্র 'প্রমাণ'। বেদবৃক্ষের কাণ্ডের উপরই হিন্দুধর্মের বিভিন মত ও সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্র গবেষক Sir John woodroffe বিভিন্ন দিক থেকে বেদ ও তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ ক'রে বলেছেন যে,—"The Shakta Tantra shastra contains a most elaborate and wonderful ritual, partly of its own and party of Vaidik origin."....

"Therefore not only is the authority of the Veda acknowledged along with Agama, Nigamas and Tantras but there is not a single doctrin or practice, amongst those hitherto mentioned, which is either not generally held, or which has not the adherence of large numbers of Indian worshippers. It accepts all the notions common to Hinduism as a whole. Nor there is a single doctine previously mentioned which is contrary to Veda, that is on the assumtion of the truth of Advaitavada."[৩৪]

তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অনেক কিছুর পরিচয় যে বেদে পাওয়া যায়, তা' পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 'মনুসংহিতা'র প্রখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেছেন যে, শ্রুতি দ্বিবিধ ঃ— বৈদিক ও তান্ত্রিক। তন্ত্র-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তন্ত্রকে 'পঞ্চমবেদ' বলে মনে করেন। 'নিরুত্তরতন্ত্রে' (৭।১৬) বলা হয়েছে যে,—"আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ কৌলস্তু পরমাশ্রয়ঃ," অর্থাৎ আগম পঞ্চমবেদ এবং কৌল পঞ্চমাশ্রম। তান্ত্রিক 'পঞ্চমকারাদি' সাধনায় বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। বস্তুতঃ, তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতিতে কতকগুলি অবৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হলেও বেদের সঙ্গে তন্ত্রের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা' অস্বীকার করা যায় না।

উপনিষদ্ ও বেদান্তের মূলতত্ত্বের সঙ্গে তন্ত্রের অনৈক্য নাই। উপনিষদের সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবাদের ধারণা 'মহানির্বাণতন্ত্র', 'কুলার্ণবতন্ত্র', 'নির্বাণতন্ত্র', 'কুব্জিকাতন্ত্র' প্রভৃতি বিভিন তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতিও নির্দিষ্ট হয়েছে। তান্ত্রিকী দীক্ষাক্রমের অন্তর্গত পূর্ণাভিষেকের সময় সাধককে ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করা হায়। বেদান্তের মূলকথা হচ্ছে অদ্বৈতবাদ। যোগ বা ভাবনার দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একাত্মতা-লাভের কথা বলা হয়েছে বেদান্তে। তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ মুখ্যকথা ;তন্ত্রে উক্ত হয়েছে য়ে,—

"জীবঃ শিবঃ শিবোজীবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধঃ স্মৃতোজীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।।"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (৯।৪২)।

পাশমুক্তির দ্বার জীবের শিবত্ব-লাভই তন্ত্রের উদ্দেশ্যে। কিন্তু, তন্ত্রে জীবের শিব বা পরমব্রহ্মলাভের পথটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেবল যোগের মাধ্যমে নয় ; যোগ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে,—মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়াদির মিলিত সাধনাই তন্ত্র-সাধনার লক্ষ্য। এখানেই তন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

পুরাণগ্রন্থ সমূহে তন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। কোন কোন পুরাণে তন্ত্র-নিন্দা দেখা গেলেও তন্ত্রের শিব-শক্তিতত্ত্ব পুরাণগুলিকে যে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরাণগ্রন্থগুলিতে প্রতিটি পুরুষদেবতার একটি ক'রে শক্তিদেবতার পরিকল্পনার মধ্যে তন্ত্রের শিব-শক্তিবাদের প্রভাব রয়েছে ; যেমন,—লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, ইন্দ্র-শচী, চন্দ্র-রোহিনী, বায়ু-স্বস্তি, অগ্নি-স্বাহা। বিভিন্ন পুরাণে তান্ত্রিক দেবদেবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত তন্ত্র-প্রভাবিত পুরাণগুলির মধ্যে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', দেবীভাগবত', 'কালিকাপুরাণ', 'ভাগবতপুরাণ' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' বিভিন্ন স্থানে তন্ত্র-প্রভাব দেখা যায়, তন্মধ্যে একটি স্থান উদ্ধৃত হল,—

"য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।।"
—'শ্রীমদ্ভাগবত' (১১।৩।৪৭)।

অর্থাৎ যিনি দেহাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত আত্মস্বরূপ জীবতত্ত্বের বন্ধনকারী অহঙ্কারবৃত্তিকে আশু ছেদনের বাসনা করেন, বেদোক্ত বিধানের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিধির সমবায়ে তাঁর কেশবের আরাধনা করাই বিধেয়।

অবশ্য, তন্ত্রের বাহ্যিক পূজার্চনায় পৌরাণিক প্রভাবও যে কিছুটা রয়েছে, তা' অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এইখানে যে, তান্ত্রিক উপাসনায় উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অভেদত্ব কল্পনা ক'রে কতকগুলি বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে পূজানুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে হয়, কিন্তু পৌরাণিক পূজায় উপাস্য ও উপাসকের একত্ব চিন্তার প্রশ্ন ততটা উঠে না এবং এই উপাসনায় ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে একটি দ্বৈতভাব বিরাজ করে।

বিশ্বসৃষ্টির হেতুরূপে পুরুষ-প্রকৃতির তত্ত্ব সাংখ্য-দর্শন ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রেই স্বীকৃত। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিবাদের সঙ্গে তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব বা শিব-শক্তিতত্ত্বের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সাংখ্যের পুরুষ তন্ত্রের শিবের ন্যায় বিশ্বের পরমাত্মা এবং অখণ্ড, অনন্ত ও শাশ্বত ব্রহ্ম নন। সাংখ্যের প্রকৃতি থেকে তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি ভিন্ন। তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মের পরমাশক্তি ; সর্ব ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী। তন্ত্রের পুরুষ ও প্রকৃতি এক অখণ্ড -অনন্ত

পরমব্রহ্ম বা পরম শিবেরই অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদী ও নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু, তন্ত্রশাস্ত্র অদ্বৈতবাদী ও ঈশ্বরবাদী।

বস্তুতঃ, বিভিন্ন শাস্ত্র ও দর্শনের সঙ্গে তন্ত্রের ঐক্য থাকলেও তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি এক স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। তন্ত্রশাস্ত্র কেবলমাত্র দর্শন নয়, এটি সাধনশাস্ত্র।

'ইহা যেমন বুঝিতে হইবে, তেমনই সাধিতে হইবে, বোধের অভাবে সাধনের প্রভাবেও ইহা প্রত্যক্ষ হইবে, কিন্তু সহস্র বোধ সত্ত্বেও সাধনের অভাবে ইহা প্রত্যক্ষ হইবার নহে।"[৩৫]

তন্ত্র-ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

তন্ত্র-ধর্ম ও তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রাচার কেবলমাত্র শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়েরই সাধন-ভজন প্রণালী তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী প্রতিপালিত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই নিজের নিজের শ্রেণীর তন্ত্র ও আগম গ্রন্থাদি রয়েছে। তন্ত্রে যেমন কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যা ও বিভিন্ন স্ত্রীদেবতার উপাসনা ও সাধনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তেমনই শিব, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি সমস্ত পুরুষদেবতার বীজমন্ত্র, যন্ত্র ও সাধন-ক্রম তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' (৫।৯২।৩) শৈব, বৈষ্ণব, স্বায়ম্ভুব, চান্দ্র, পাশুপত, জৈন, চীন, কালমুখ, বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। শৈব, শাক্ত প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলি আবার বিভিন্ন শাখা ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। উপাস্য-দেবতা এবং উপাসনা-প্রক্রিয়ার তারতম্যের জন্য তান্ত্রিক উপাসকগণের মধ্যে বিভিন্ন শাখা ও সম্প্রদায় রয়েছে। যারা যোগমার্গের, তাদের যোগাভ্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তন্ত্রানুসারী। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত।[৩৬] ব্রহ্মজ্ঞানলাভই তান্ত্রিক সাধকের চরমলক্ষ্য।

শিবশক্তিতত্ত্বই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান কথা। তন্ত্রমতে ব্রহ্ম শিবশক্তিময় ;যথা,—

"শিবশক্তিময়ং ব্রহ্ম নিত্যানন্দময়ং বপুঃ।"

—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৫/৩)।

সৃষ্টিকার্যের জন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বা পরমশিব পুরুষ-প্রকৃতি বা শিবশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হন।

"সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিনী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিণী।।
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসন্তজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১।১৪-১৫)।

তন্ত্রশাস্ত্রমতে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শিবশক্তিই পরমব্রহ্ম। শক্তি বা প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের অবিনাভাবসম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতীত ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃতি থাকেন না, উভয়ে চণকাকারে একীভূত হয়ে আছেন। ব্রহ্ম বা শিব চৈতন্যমাত্র, তিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁর কোন কর্তৃত্ব নাই। শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি -স্থিতি-প্রলয় কার্য সংঘটিত হচ্ছে।

(১) "প্রকৃত্যা জায়তে সর্বং পুনস্তস্যা প্রলীয়তে।।"

* * *

"ব্রহ্মাবিষ্ণুঃ শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্
তথা প্রলয়কালে তু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (৩/১-২)।

(২) "পঙ্গুপ্রায়ঃ সদা ঈশঃ গমিতুং নৈব শক্যতে।
ভুবনেশীং সমারাধ্য সর্বাস্বামী চ ঈশ্বরঃ।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (৭/১৮)।

শক্তিই সর্বকর্তৃত্বময়ী। শক্তি ব্যতিরেকে শিব শবমাত্র ;যথা,—
"শক্তিহীনঃ শবঃ সাক্ষাচ্ছক্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৪/৩৩)

শিব নির্গুণ, শক্তির দ্বারা উপাধিবিশিষ্ট হয়ে শিব সগুণ হন। আবার, পরমা প্রকৃতি বা পরমাশক্তি নির্গুণও বটে, সগুণাও বটে ;যথা,—

"নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিনী দেবী সর্বভূত প্রকাশিনী।।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র' (১/৪৪)।

তন্ত্রাশাস্ত্রানুসারে সমগ্র বিশ্বই শক্তিময়, শক্তিই সমস্ত বিষয়ের মূল। শক্তিমার্গ ছাড়া জীবের

কোন গতি নাই। যথা।—

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দনঃ।
শক্তিঃ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ কুবেরো বরুণশ্চ যঃ।।"

*　　　*　　　*

"শক্তিমার্গং বিনা জন্তোর্ণ ভক্তির্ণ চ সদ্‌গতি।
শক্তিমূলং জগৎ সর্বং শক্তিমূলং পরং তপঃ।।
শক্তিমূলং পরং কর্ম জন্ম কর্ম মহীতলে।
বিনা শক্তিপ্রসাদেন ন মুক্তির্জায়তে প্রিয়ে
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৪/৩৮, ১০/৭-৮)।

শক্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। যেহেতু শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কর্মক্ষম নন, সেইহেতু ধর্মাধর্ম সমস্ত কার্যের ফলগ্রহণকারিণীও প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি।[৩৭] পরমাশক্তিই নির্বাণদাত্রী। শক্তির জ্ঞান ব্যতীত কখনই মুক্তি সম্ভব নয়।

(১)　"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী নির্বাণং নৈব জায়তে।"
—'নিরুত্তরতন্ত্র' (২।১৫)।

(২)　"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবীস্মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১০/৪৪)।

এই কারণেই তন্ত্রে শক্তি-উপাসনার স্থান সর্বোচ্চে এবং তান্ত্রিক সাধক শক্তি-আরাধনার দ্বারাই ভুক্তি-মুক্তি লাভ করেন। তন্ত্রমতে সমস্ত তত্ত্ব ও পদার্থ শিবশক্তিময় বলেই তন্ত্রের বহুবিচিত্র সাধন-পদ্ধতি শিবশক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিবশক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধিই তান্ত্রিক সাধকের চরম লক্ষ্য।

তন্ত্রের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে জগতের সমস্ত পুরুষজীব শিবস্বরূপ এবং স্ত্রীজীব শক্তিস্বরূপ।[৩৮] পৃথিবীর সকল পুরুষ ও নারীর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে শিব ও শক্তিই প্রতিভাত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পার্বতীর প্রতি শিবের উক্তি ঃ—

"সর্বা নার্যস্তমেবাসি সর্বেঽহং পুরুষাঃ প্রিয়ে।
এতদ্বিজ্ঞানমাত্রেণ জায়তে সিদ্ধিভাজনঃ।।"
—'নিরুত্তরতন্ত্র' (৬/৪)।

[হে প্রিয়ে। সকল স্ত্রী তুমিই, আর সকল পুরুষ আমি—এই জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধির পাত্র হয়ে থাকে।]

তন্ত্রে শক্তি বা নারীসহ সাধনার যে বিশিষ্টক্রম ও বিধান রয়েছে, তা' মূলতঃ এই শিবশক্তি তত্ত্বোপলব্ধির জন্যই, কামনার চরিতার্থতার জন্য নয়।

তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার একটা প্রধান তত্ত্ব হচ্ছে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ। অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে দেহ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ।

(১) "ব্রহ্মাণ্ডং বৈ শরীরন্তু সর্বেষাং প্রাণধারিণাম্।
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৬/৪০)।

সমস্ত জীবের এই শরীরটি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ আছে, এই শরীরে সেই সমস্ত গুণ আছে।

(২) "ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি তানি সন্তি কলেবরে।
বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডং যদ্রূপং তদ্রূপং ক্ষুদ্ররূপকম্।।"
—'তোড়লতন্ত্র' (২/২)।

ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সব তীর্থ দেহেও আছে। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটি যেরূপ, এই ক্ষুদ্রাকার ব্রহ্মাণ্ডটি সেইরূপ।

পিণ্ডে বা দেহের মধ্যেই চতুর্দশভুবন, সর্বদেবদেবী, সর্বতীর্থ, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্ব ও পদার্থ বর্তমান।[৩৯] দেহের মধ্যেই শিবশক্তি বা পরমাত্মার অবস্থান। এই দেহতত্ত্ব বা পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধিই তান্ত্রিক সাধনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। দেহই হচ্ছে তন্ত্র-সাধনার মুখ্য অবলম্বন এবং তন্ত্রের পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ বা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব ভারতের বৌদ্ধতান্ত্রিক, নাথযোগী, বৈষ্ণব সহাজিয়া, আউল-বাউল প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। এ' সম্পর্কে আমরা গ্রন্থ মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তান্ত্রিক সাধনার মূল 'কুণ্ডলিনীযোগ'। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে কুণ্ডলিনীযোগক্রিয়া ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। যে পরমাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী, যিনি সর্ব ক্রিয়ার মূল এবং সর্বচৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী, সেই আদ্যাশক্তিই জীবদেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিত। কুণ্ডলিনী শক্তিই সর্বশক্তির উৎস ; ইনিই প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি এবং জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। এই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান শক্তিরূপে সর্বত্র বিরাজিতা। কুণ্ডলিনীশক্তি সম্পর্কে তন্ত্র শাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ স্মরণীয়ঃ—

(১) "মূলাধারে তু যা শক্তির্ভুজগাকাররূপিনী।
জীবাত্মা পরমেশানি। তন্মধ্যে বর্ততে সদা।।"
—'মাতৃকাভেদতন্ত্র' (৩/৪)।

[হে পরমেশ্বরি! মূলাধারে ভুজগাকারা যে কুণ্ডলিনীশক্তি আছেন, জীবাত্মা সর্বদা তার মধ্যেই অবস্থিত।]

(২) "মূলাধারসরোজে তু ত্রিকোণং সুমনোহরম্।
কামং ভ্রমন্তং তন্মধ্যে বালার্ককোটি-সন্নিভম্।।
তদূর্ধ্বে কুণ্ডলীশক্তিং তড়িৎকোটি সমপ্রভম্।
প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র' (৬।৬০-৬১)।

[মূলাধার কমলে সুমনোহর ত্রিকোণ আছে, তার মধ্যে কোটিবালসূর্যতুল্য কাম ভ্রমণ করছে। তার উর্ধ্বে কোটি বিদ্যুতের প্র ভার ন্যায় নিদ্রিত সর্পাকার সার্ধ ত্রিবলয়যুক্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করছেন।]

(৩) "মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধেত যন্ত্রমন্ত্রার্চনাদিকং।
জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্য সঞ্চয়ৈঃ
তদা প্রসাদমায়ান্তি যন্ত্রমন্ত্রার্চনাদয়ঃ।।"
—'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।

[যে পর্যন্ত কুণ্ডলিনী মূলাধারে নিদ্রিতা থাকেন, সে পর্যন্ত যন্ত্রমন্ত্রপূজা কিছুই সিদ্ধ হয় না। বহু পুণ্যফলে যদি সেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তা'হলে যন্ত্রমন্ত্রপূজা প্রভৃতি সমুদায়ই সফল হয়।]

এই কারণে তন্ত্র-সাধনার প্রধান কথাই হচ্ছে দেহস্থিত প্রষুপ্ত পরমাশক্তি স্বরূপিণী কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তান্ত্রিক সাধককে দেহমধ্যস্থ নাড়ীতত্ত্ব, বিভিন চক্র বা পদ্ম প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে মানুষের দেহে সাড়ে তিন লক্ষ্য নাড়ী আছে। এর মধ্যে চৌদ্দটি প্রধান ;এই চৌদ্দটির মধ্যে আবার প্রধান তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মানবদেহের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের অধঃসীমা থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রপর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্নার বামভাগে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত। সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে ছয়টি চক্র বা পদ্ম বিরাজিত। যথা,—

"ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষন্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্‌স্থানেষু চ ষট্‌শক্তি ষট্‌পদ্মং যোগিনো খলু।।"
—'শিবসংহিতা' (২।২৭)।

[ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীর মধ্যস্থলে সুষুন্না নামক যে নাড়ী আছে, তারই ছয় স্থানে ছয়টি পদ্ম বা ছয়টি শক্তি আছে, তা' কেবল যোগিগণই জানেন।]

দেহমধ্যস্থ ছয়টি চক্র বা পদ্ম হচ্ছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। মূলাধারচক্রেই কুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজিতা। মানবদেহের মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধার পদ্ম বিরাজিত। এই পদ্ম চতুর্দল। এই পদ্মের মধ্যস্থলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শোভা পাচ্ছেন। ঐ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ মহাদেবকে তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি সার্ধত্রিবলায়াকৃতিরূপে সর্পাকারে বেষ্টনপূর্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ ক'রে নিদ্রিতা রয়েছেন।[৪০] তান্ত্রিক সাধক বিশেষ যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ক'রে ব্রহ্মানন্দে আপ্লুত হন।

আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল অবস্থিত। এই সহস্রার পদ্মটি অধোমুখী এবং এই স্থানেই পরমশিব বা পরমব্রহ্ম বিরাজিত।[৪১] এইস্থানই বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের পরমস্থান। এঁকে শৈবরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্থান, সাংখ্য ঋষিরা প্রকৃতি-পুরুষস্থান, শাক্তেরা মহাশক্তির স্থানরূপে অভিহিত করেন। মূলধার পদ্ম থেকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে সংযুক্ত ও একীভূত হলে উভয়ের সামরস্য সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হয় এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হয়ে সাধক একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে সহস্রার পদ্মস্থ পরমশিবের মিলনের দ্বারাই সাধক নির্বাণমুক্তি লাভ করে। তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ব্যতীত আত্মজ্ঞান-লাভ বা ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। এজন্যই তন্ত্রোক্ত জপ-পূজা-মুদ্রা-ন্যাস-প্রাণায়াম, যৌগিক প্রক্রিয়া প্রভৃতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মূলাধার পদ্মে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। ষট্‌চক্রভেদ ও কুণ্ডলিনী যোগক্রিয়াই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে জীব স্বরূপতঃ শিব। এ'সম্পর্কে 'কুলার্ণবতন্ত্রে' (১/৮) বলা হয়েছে যে,—

"স্বয়ং জ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।।"

[স্বয়ং জ্যোতি আদ্যন্তহীন নির্বিকার পরাৎপর নির্গুণ সচ্চিদানন্দ শিব। জীবনামধারীরা তাঁরই অংশসমূহ।]

জীব ও শিব মূলতঃ অভেদ। জীব অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার ফলে আত্মস্বরূপ-বিস্মৃত। অবিদ্যার জন্যই জীব উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্বিধ শরীর ধারণ করে। এই চতুর্বিধ শরীর ধারণ করতে করতে জীব পুণ্যবান মানুষ হয় এবং মানুষ হয়ে যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তা'হলেই মোক্ষলাভ হয়; যথা,—

"স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাব্‌জাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্‌বন্‌মোক্ষিশশ্চ যথাক্রমম্।।
চতুর্বিধশরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।।"
—'কুলর্ণবতন্ত্র' (১/১২-১৩)।

অতএব, মানবদেহেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং মনুষ্যজন্ম ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। মানবজন্মই মোক্ষের সোপান। কিন্তু অবিদ্যা বা মায়া দূরীভূত না হলে মুক্তি বা শিবত্ব লাভ হয় না। তন্ত্রে জীবমাত্রকেই 'পশু' বলা হয়েছে; 'পশু' শব্দটি তন্ত্রশাস্ত্রে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। পাশবদ্ধ জীবকে 'পশু' বলা হয়। এবং পাশমুক্ত হলেই জীব 'শিব' হয়। যথা,—

(১) "পাশবদ্ধঃ পশুর্জ্ঞেয় পাশমুক্তো মহেশ্বরঃ।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১৩/৯১)।

(২) "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (৯/৪২)।

তন্ত্রশাস্ত্রে সাধারণতঃ ঘৃণা, লজ্জা, শঙ্কা, ভয়, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি— এই আটটিকে পাশ বলা হয়। যথা,—

"ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টা পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১৩।৯০)।

অতএব, জীবের এই পাশমুক্তিই তন্ত্রের সাধনা। মায়াচ্ছন্ন পাশবদ্ধ মানুষ পাশমুক্ত হলেই শিবত্ব লাভ করে। কিন্তু এই পাশমুক্তি সহজ কথা নয়। বহুজন্মের সঞ্চিত কর্মের ফলে যে বিবিধ পাশ বা বন্ধনের দ্বারা মানুষ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত, সেই পাশগুলি মোচনের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক সাধনক্রমের বিধান দিয়েছে। তন্ত্রের এই সাধন-

ক্রম বা পদ্ধতি তিনটি 'ভাব' বা সাতটি 'আচারে'র মধ্যে সুবিন্যস্ত।

তন্ত্র-সাধনার তিনটি 'ভাব' হচ্ছে—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। যথা,—

(১) "ভাবং চ ত্রিবিধং দেবি দিব্য-বীর পশুক্রমাৎ।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র' (৭।৬)।

(২) "পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকং।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবং ত্রয়ং ক্রমাৎ।।"
—'রুদ্রযামলতন্ত্র', ষষ্ঠপটল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাশবদ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তিমাত্রেই পশু। এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষই স্থূল জৈবপ্রবৃত্তির অধীন এবং দয়া, মোহ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি পাশে আবদ্ধ। এজন্যই তন্ত্রমার্গে প্রথমে পশুভাবের সাধনা। পশুভাবের সাধককে সংযমী ও শুদ্ধাচার-পরায়ণ হতে হয়। তিনি মদ্যপান ও আমিষ আহার বর্জন করবেন এবং রাত্রিতে কখনও যন্ত্র ও জপ-মালা স্পর্শ করবেন না। পশুভাবের স্তরে সাধককে কঠোরভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। সাধক মনের দ্বারাও পরস্ত্রী স্মরণ করবেন না এবং ঋতুকাল ভিন্ন নিজের স্ত্রীকেও স্পর্শ করবেন না।"[৪৩] স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পশুভাবের স্তরের সাধনা সাধকের প্রস্তুতিপর্ব। এই পর্যায়ে সাধক দেহ ও মনকে সর্বদিক থেকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন পরবর্তী স্তরে সাধনার সুকঠিন আদর্শ বহনের জন্য।

পশুভাবের সাধন-ক্রমে সাফল্য লাভ ক'রে তান্ত্রিক সাধককে বীরভাবের সাধনায় ব্রতী হতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে 'বীর' শব্দটিও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। 'কৌলমার্গরহস্যে' বলা হয়েছে যে,— "যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত, অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃত হ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম 'বীর'।" যে সাধক জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নাকে জয় করতে সমর্থ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করেছেন, তিনিই 'বীর'। তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধনায় 'পঞ্চ-ম-কার'সহ (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন) সাধনা, শবসাধনা, চিতাসাধনা, চক্রসাধনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সমস্ত সাধন-প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ। মহাবলশালী, বীর্যবান, সাহসী ও সুখে-দুঃখে সমজ্ঞান পুরুষই তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধনার যথার্থ অধিকারী। বীরভাবের সাধক রাত্রিকালেই জপ-পূজাদি সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

বীরভাবের সাধনায় উত্তীর্ণ-হলে তান্ত্রিক সাধক দিব্যভাব অবলম্বন করেন। দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত সাধক শুদ্ধচিত্ত, সর্বজীবে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন। দিব্যভাবের সাধনায় সাধক সমস্ত স্ত্রীজাতিকে শক্তিস্বরূপ এবং

সমস্ত পুরুষকে শিবস্বরূপ ভাবনা করেন। তিনি পাশমুক্ত আত্মজ্ঞ পুরুষ। দিব্যভাবের সাধক সম্পর্কে তন্ত্রে বলা হয়েছে যে,—

(১) "দিব্যশ্চ দেবতা প্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্বভূতসমঃ ক্ষমী।।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র' (১।৫৬)।

(২) "বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ সুরসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎসর্বং শিরসা শিবরূপিণম্।।
হৃদয়ে পার্বতীং দেবী শিরসা শিবরূপিণম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু স এব দেবতাত্মক।।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র' (৭।৭-৮)।

তন্ত্রশাস্ত্রে পশুভাবকে অধম, বীরভাবকে মধ্যম এবং দিব্যভাবকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

"উত্তমো দিব্যভাবশ্চ বীরভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমঃ পশুভাবশ্চ দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র' (৭।৩১)।

সাধকের মনোবৃত্তিকে ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে নিয়োজিত করাই হচ্ছে উপরিউক্ত তিনটি ভাব সাধনার লক্ষ্য। মানসিক ধর্মের নাম ভাব, এই ভাব মনের দ্বারাই অভ্যাস করতে হয়।

"ভাবোহি মানসো ধর্ম মনস্যৈব সদাভ্যসেৎ।"
—'বামকেশ্বরতন্ত্র', ৫১ পটল।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মানুষের মনোভাব তিন প্রকার হয় বলেই তান্ত্রিক সাধনায় তিনপ্রকার ভাবের কথা বলা হয়েছে। তমোগুণীলোকের জন্য পশুভাব, রজোগুণী লোকের জন্য বীরভাব এবং সত্ত্বগুণী লোকের জন্য দিব্যভাব।

"দিব্যাস্তু সাত্ত্বিকা বোধ্যা বীরা রাজস বিগ্রহাঃ।
পশবস্তামসাঃ সৌম্যা কৌলভাবা স্ত্রিধা মতাঃ।।"
—'ভৈরবযামলতন্ত্র', তৃতীয় পটল।

তন্ত্রসাধনায় সাতটি আচারের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা,— বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। এই সাতটি আচার তান্ত্রিক সাধনার ক্রমোন্নত সাতটি স্তর।

"সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি।।"
—'কুলার্ণবতনত্র' (২।৭-৮)।

অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচার অপেক্ষা আর কোন উত্তম আচার নাই।

কৌলাচারই তান্ত্রিক সাধনার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। কৌলাচারে সাধক ধর্মাধর্ম ও সর্ব বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে উপনীত হন। কৌলসাধক রাগ-দ্বেষবিবর্জিত, শীত-গ্রীষ্ম-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, সর্বভূতে সমদর্শী এবং সর্বদা আত্মভাবে সন্তুষ্ট। কৌলাচারেই সাধকের যোগ ও ভোগ লাভ হয়। কুলাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারাই সাধক শিবস্বরূপ হয়ে যান ;যথা,—

"কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র' (৪।৩৮)।

বস্তুতঃ, কুলাচারেই সাধক সমস্ত পাশ ছেদন ক'রে জীবন্মুক্ত হন এবং ব্রহ্মাজ্ঞান লাভ করেন। এটাই তান্ত্রিক সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য।

তান্ত্রিক সাধনার সাতটি আচার পূর্বোক্ত তিনটি ভাবসাধনার অন্তর্গত। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের এবং কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত। যথা,—

"বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং।
সিদ্ধান্ত বামে বীরং তু দিব্যং সৎ কৌলমুচ্যতে।।"
—২৪পটল, 'বিশ্বসারতন্ত্র'।

পৃথিবীর মানুষের প্রকৃতি, মানসিকতা ও রুচির মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। সমস্ত মানুষই একরকম প্রকৃতি বিশিষ্ট নয়। গুণভেদে সকলেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে তিনপ্রকার ভাব ও সাতটি আচারের বিধান দেওয়া হয়েছে। যে যে- ভাবের উপযুক্ত, সে সেই ভাব ও আচারকে গ্রহণ ক'রে সাধনায় ব্রতী হবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত ক্রম বিন্যস্ত সাধন-পদ্ধতির দ্বারা সিদ্ধির উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করবে। অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার সর্ববিধ মোহপাশ

বিনষ্টির দ্বারা মানুষকে ধীরে ধীরে জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞ পুরুষে পরিণত করবার জন্যই তন্ত্রে সাতটি আচার ও তিনটি ভাবের ক্রমোন্নত সাধনার বিধান দেওয়া হয়েছে।

"আদৌভাবং পশোকৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদাবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলং।।"
—ষষ্ঠ পটল, 'রুদ্রযামলতন্ত্র'।

তান্ত্রিক সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্রমে ক্রমে মানুষকে প্রবৃত্তির রাজ্য হতে দিব্যচেতনায় নিয়ে যাওয়া এবং পশুত্ব হতে শিবত্বে অধিষ্ঠিত করা।

"The tantras offer unique discipline to wake up the finer dynamism of spirt. It moves the vital and the spiritual energies and transforms the vital nature by spiritual infusion. But this trasformation is gradual, the blind seeking of the vital nature including vital obscurities is slowly eliminated, not by suppression, but by exposing the nature and the constitution of our vital being ."[৪৪]

তন্ত্রোক্ত সাধনার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব বা 'পঞ্চম-ম-কার'। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন,—এই পাঁচটিকে পঞ্চতত্ত্ব বা সংক্ষেপে 'পঞ্চ-ম-কার' বলা হয়।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবী নির্বাণমুক্তিহেতবে।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১১।৭)

তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চতত্ত্বকে নির্বাণমুক্তির হেতু বলা হয়েছে। তন্ত্রের বিভিন্ন সাধন-প্রক্রিয়ায় পঞ্চতত্ত্ব অপরিহার্য উপাচাররূপে গণ্য হয়। তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজাদি অভিচাররূপে কথিত হয়েছে এবং তাকে পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল বলা হয়েছে। 'পঞ্চ-ম-কার' ছাড়া সাধনা করলে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি দূরের কথা বরং পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। যথা,—

"পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।।
শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরোভবেৎ।
পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ।।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র' (৫।২৩-২৪)।

তন্ত্রশাস্ত্রের এই পঞ্চতত্ত্বসহ সাধনার প্রতি অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেন। পূজা ও সাধনায় মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনের ব্যবহারের ফলে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই বিরূপতার কারণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তান্ত্রিক ধর্মানুষ্ঠান বাস্তবসচেতন ও মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির ও রুচির মানুষ রয়েছে। কেউ প্রবৃত্তিমুখী, কেউ নিবৃত্তিমুখী। বিভিন্ন প্রকৃতি, সংস্কার ও রুচিসম্পন্ন মানব-সমাজের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র অধিকার অনুসারে বিভিন্ন সাধন-পথ নির্দিষ্ট করেছে। মানুষ সাধারণতঃ ভোগমুখী, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের তাড়নাই তার মধ্যে প্রবল। প্রবৃত্তি-দমন ও ইন্দ্রিয়-নিরোধ সহজ কথা নয়। অথচ প্রবৃত্তি ও ভোগস্পৃহাকে সম্পূর্ণরূপে লোপ না করলে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। তাই তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনানুষ্ঠানে পরিমিত ভোগের মধ্য দিয়ে মোক্ষের বা আত্মজ্ঞানলাভের পথ নির্দেশ করেছে। যে সমস্ত দ্রব্য বা বিষয় মানুষকে অধঃপতিত করে এবং মানুষের আত্মতত্ত্বোপলব্ধির প্রবল অন্তরায় হয়, তন্ত্রশাস্ত্র সেই সমস্ত দ্রব্য বা বিষয়ের গুরু-উপদিষ্ট পথে বিহিত ভোগের দ্বারা মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে।

"যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (৫।৪৮)।

পূর্বে বলেছি যে, অন্যান্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনায় যোগের সঙ্গে ভোগের একটা বিরোধ রয়েছে। তন্ত্রমার্গে যোগ ও ভোগ, ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লাভ হয়।

এই সূত্রেই তন্ত্রোক্ত সাধনায় 'পঞ্চ-ম-কার' বা পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহারের বিধান দেওয়া হযেছে। কিন্তু মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনরূপ পঞ্চতত্ত্বসহ সাধনা সকলের জন্য নয়। সাধারণ সাধক বা পশুভাবের সাধকদের জন্য 'পঞ্চ-ম-কার'-এর প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। এই শ্রেণীর সাধকদের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের পরিবর্তে বিভিন্ন অনুকল্প ব্যবহারের বিধান দেওয়া হযেছে।[৪৫] উচ্চকোটির সাধাকদেরই 'পঞ্চ-ম-কার' সহ সাধনার অধিকার রয়েছে। যারা বীর ও দিব্যভাবের সাধনায় প্রকৃত অধিকার অর্জন করেছে, তারাই গুরু-উপদেশানুসারে চক্রানুষ্ঠানাদি বিভিন্ন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার করতে পারে। আবার, অধিকারী সাধকেরাও অসংস্কৃত বা অশোধিত মদ্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। তান্ত্রিক সাধনা ও পূজায় মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বকে বিধানানুসারে শোধন ক'রে নিতে হয়।[৪৬] পূজাকাল ও সাধন-ক্রিয়া ব্যতীত অন্য সময়ে পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং আত্মসুখের জন্য এর উপভোগে সাধকের পতন অনিবার্য। বস্তুতঃ, পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার সাধকের কামনা চরিতার্থতার জন্য নয় ;—বাসনা-ক্ষয়ের জন্য,

প্রবৃত্তির পূর্ণ নিবৃত্তির জন্য। সর্ববিধ ভোগ্যবস্তুর সম্মুখেও সাধক কিরকম ইন্দ্রিয়-সংযম করতে পারেন এবং অবিকৃত থেকে পরমাত্মার সাধনায় নিমগ্ন হতে পারেন, তার পরীক্ষার জন্যই তন্ত্রোক্ত 'পঞ্চ-ম-কার' সহ সাধনার বিধান। তাই তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে,—

"বামে রামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্রম্।
মধ্যে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।।
স্কন্ধে বীণা ললিত-সুভগা সদ্‌গুরুণা প্রপঞ্চঃ।
কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।।"
— 'কৌলাবলীনির্ণয়' (২১।১৮৯-১৯০)।

অর্থাৎ কৌলসাধকের বামে রমণকুশলা রমণী, দক্ষিণে পানপাত্র, মধ্যে সাধকের সম্মুখে উষ্ণ শূকর মাংস। সাধকের স্কন্ধে ললিত রমণীয় বীণা। সদ্‌গুরুর নির্দিষ্ট এই প্রপঞ্চ। কৌলধর্ম পরমগহন, যোগীদেরও অগম্য।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, গুরুনির্দিষ্ট প্রপঞ্চ (মায়া) বা মোহ-সঞ্চারী ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে থেকেও কৌলসাধককে অবিচলিত ভাবে সাধনা করতে হয়। 'পঞ্চ-ম-কার'সহ তন্ত্রোক্ত সাধনায় তান্ত্রিক সাধককে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় বলেই 'কুলার্ণবতন্ত্রে' (২।১২৩) একটি সুন্দর উক্তি করা হয়েছে,—

"কৃপাণধারাগমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্তনম্।।"

অর্থাৎ কৃপাণের ধারমুখের উপর দিয়ে হাঁটা, বাঘের গলা জড়িয়ে ধরা, শরীরে সাপ জড়ানো, এ সবের চেয়েও কুলমার্গের অনুসরণ দুষ্কর।

অতএব, শুদ্ধান্তকরণ-নির্বিকার অদ্বৈতপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী।[৪৭] জল যেমন জলে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরকম তন্ত্রসাধকও পঞ্চতত্ত্ব সেবায় পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়।

"যথা তোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পারমেশ্বরি।
তথৈব তত্ত্বসেবায়াং লীয়তে পরমাত্মনি।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১১।৪)।

তন্ত্রশাস্ত্রে বৈষ্ণবদেরও 'পঞ্চতত্ত্ব'-এর উল্লেখ রয়েছে। বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব হচ্ছে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব। যথা,—

"শৃণু তত্ত্বং বরারোহে বৈষ্ণবস্য ত্রিলোচনে।
গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং বর্ণতত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১২।২)

তন্ত্রশাস্ত্রে 'পঞ্চ-ম-কারে'র সূক্ষ্ম তত্ত্বও বর্ণিত আছে। তন্ত্রোক্ত স্থূল 'পঞ্চ-ম-কার'সহ সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে সূক্ষ্মতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধি। এই সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বের উপলব্ধির জন্য সাধককে ষট্‌চক্রভেদ ও কুলকুণ্ডলিনী-যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। পঞ্চতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য বা অধ্যাত্মিক অর্থ সম্পর্কে তন্ত্র-বচন নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ—

"অমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্য সুখোদয়ঃ।।
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ।।
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে।।
মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ।।
অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ।।
পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎস্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ।।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র' (৫।১০৭-১১২)।

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, সাধককে ব্রহ্মারন্ধ্রেসহস্রার মহাপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির মিলনসাধন করতে হবে এবং শিব-শক্তির সামরস্য-জনিত যে অমৃতক্ষরিত হবে, সাধক তাই পান করবে। এই সুধাপানই কৌলশাস্ত্রবিহিত মদ্যপান। জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা পুণ্যাপুণ্যরূপ পশু বধ ক'রে যে পরতত্ত্বে চিত্ত লয় করে, সেই যথার্থ মাংসাশী। যে সাধক ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত ক'রে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে, সেই মৎস্যাশী, অন্যরা প্রাণিহিংসকমাত্র। পশুভাবাপন্ন সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধা, কৌলিক বা কৌলাচারী সাধকের শক্তি প্রবুদ্ধা। সেই প্রবুদ্ধা শক্তির যে সেবা করে, সে শক্তিসেবক বা মুদ্রা সাধক (এখানে 'শক্তি' অর্থ মুদ্রা)। পরাশক্তি ও পরমাত্মার সংযোগই

মৈথুন। অর্থাৎ মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ষট্‌চক্রভেধ পূর্বক শিরঃস্থিত সহস্রদল কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবের সঙ্গে মিলন-সাধনই মৈথুন।

পঞ্চতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতত্ত্ব গুরুমুখে লভ্য। গুরুর সহায়তা ব্যতীত সাধক কোনক্রমেই পঞ্চতত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ।

গুরুবাদ তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার প্রধান কথা। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর মাহাত্ম্য অপরিসীমরূপে কীর্তিত হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্রেও গুরুর বা আচার্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তন্ত্রে যেরূপ উচ্ছ্বসিতভাবে গুরুর মহিমা ঘোষিত হযেছে, অন্যান্য শাস্ত্রে সেরকম দেখা যায় না। তন্ত্রে গুরুই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং পরমব্রহ্মস্বরূপ। স্বয়ং পরমেশ্বরই গুরুরূপে মায়ামুক্ত দেহ ধারণ ক'রে শিষ্যের পশুপাশ বিমোচন করেন। সাধক কেবলমাত্র গুরুসেবার দ্বারাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ করতে পারে। তাই, সাধক ও শিষ্যের প্রতি তন্ত্রশাস্ত্রের সতর্ক বাণীঃ—

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১২।৪৯)

অর্থাৎ শিব রুষ্ট হ'লে গুরু ত্রাণ করেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে কেউই ত্রাণ কর্তা নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর এই সর্বোচ্চ স্থানের কারণ হচ্ছে তন্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা।

"ইয়ং পরম্পরা বিদ্যা গুরু বক্ত্র বিনির্গতা।
শ্রুতা যে নৈব বিধিনা জায়তে তেন সর্বথা ।।"

—'ভৈরবডামরতন্ত্র', পূর্বভাগ।

গুরুর প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ বা তন্ত্রশাস্ত্রের মর্মোদ্ধার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, তন্ত্রে এমন কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ রয়েছে, যা এক নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতার আবরণে আবৃত। এগুলির প্রকৃত রহস্যোদ্ধার কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য বা শব্দশাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্যই তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে,—

"তন্ত্রার্থং শাস্ত্র ব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃপুমান্।
স এবান্ধো বিজানীয়াদুলুক ইব ভাস্করম্।।

—'ভৈরবভামরতন্ত্র', পূর্বভাগ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি দ্বারা তন্ত্রের অর্থ জানতে ইচ্ছা করে, পেচকের সূর্যদর্শনের ন্যায় তার প্রয়াস বিফল হয়।

বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের বীজমন্ত্রের অর্থ-পরিজ্ঞান, জপ-প্রক্রিয়া, পুরশ্চরণ, শবসাধন, চিতাসাধন, লতাসাধন প্রভৃতি বহুবিচিত্র সাধন-ক্রম সম্পূর্ণরূপে গুরুনির্ভর। সদ্‌গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও নির্দেশ ব্যতিরেকে তান্ত্রিক সাধন-মার্গে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব নয় বলেই তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে,—

"ধ্যানমূলং গুরোমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥
গুরুমূলাঃ ক্রিয়াঃসর্বা লোকোঽস্মিন কুলনায়িকে।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসংযুতৈঃ॥"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১২/১৩-১৪)।

তান্ত্রিক সাধনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে দীক্ষা। দীক্ষা ব্যতীত তন্ত্রোক্ত ধর্মাচরণের কোনপ্রকার অধিকারই হয় না। যার দ্বারা আত্মোন্মেষ হওয়ায় পাশবদ্ধজীব শিব হয়ে যায়, তাকেই পশুপাশমোচনকারিনী দীক্ষা বলা যায়।[৪৮] তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির জপপূজাদি সমস্ত কর্মই প্রস্তরে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল এবং দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধি ও সদ্গতিনাই। সেই কারণেই সর্বপ্রযত্নে সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হবে। যথা,—

"অদীক্ষিতা যে কুর্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ফলন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবী দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে গুরুণা দীক্ষিতা ভবেৎ॥"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১৪।৯৬-৯৭)

যথাবিহিত দীক্ষার দ্বারা মানুষের পূর্বপাপসমূহ দগ্ধ হয় এবং ক্রমে ক্রমে সাধনার প্রভাবে মুক্তিলাভ ঘটে। তন্ত্রশাস্ত্রে স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা, মানসদীক্ষা, ক্রিয়াদীক্ষা, বর্ণদীক্ষা, কলাদীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দীক্ষার উল্লেখ রয়েছে।[৪৯]

তন্ত্রশাস্ত্রের দীক্ষা পদ্ধতি কয়েকটি ক্রমোন্নত স্তর বা পর্যায়ে সজ্জিত; যথা,— দীক্ষা, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্রাজ্যাভিষেক ও পূর্ণদীক্ষা। অর্থাৎ সাধককে সাধারণ মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর সাধনশক্তি অনুসারে শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক প্রভৃতি একের পর এক অভিষেক গ্রহণ ক'রে ক্রমোন্নত সাধন-সোপানে

আরোহণ করতে হবে এবং সর্বশেষে পূর্ণদীক্ষাভিষেকের অধিকারী হলেই সাধক আধ্যাত্মিকতত্ত্বের চরমশিখরে উপনীত হন। সর্বশেষস্তরে সাধক 'সোঽহং'-তত্ত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ক'রে জীবন্মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ যে অদ্বৈততত্ত্বোপলব্ধি তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য, সাধক সেই পরমতত্ত্বে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হন। তন্ত্রের দীক্ষাপদ্ধতি এবং ক্রমগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, তন্ত্রশাস্ত্র এক অপূর্ব কৌশলে মায়া-মোহাচ্ছন্ন মানুষকে ধীরে ধীরে পূর্ণজ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যায় বা শিবত্বে উপনীত করে।

তান্ত্রিক সাধনা মন্ত্র-প্রধান। মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক অচিন্ত্য শক্তি, তাই তন্ত্রে মন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। যার মননের দ্বারা ধর্মার্থকামমোক্ষ লাভ ঘটে, সংসার-বন্ধন থেকে পরিত্রাণ ঘটে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাই মন্ত্র। 'পিচ্ছিল্লাতন্ত্রে' মন্ত্র-লক্ষণে উক্ত হয়েছে যে,—

> "মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
> যতঃ করোতি সংসিদ্ধং মন্ত্র ইত্যুচ্যতে।।"

মন্ত্র অক্ষরমাত্র নয়, মন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ। মন্ত্রসমূহ শব্দব্রহ্ম স্বরূপিনী-চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিরই স্বরূপবিভূতি। মন্ত্রের নিত্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে 'সারদাতিলক', 'কামধেনুতন্ত্র' প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তন্ত্রে প্রত্যেক দেবদেবীর বীজমন্ত্রসমূহ বর্ণিত হয়েছে। দেবতা ও দেবতার বীজমন্ত্র অভেদ। যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতা, সেই বীজ থেকে সেই দেবতার মূর্তি আবির্ভূত হবেন, এটা নিশ্চিত; যেহেতু দেবতার শরীর বীজমন্ত্র থেকেই উৎপন্ন। যথা,—

> "যদ্দেবো জায়তে বীজ তস্য মূর্তির্ভবেদধ্রুবম্।
> দেবতায়াঃ শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে।।"[৫০]

দেবতার বীজমন্ত্রের পরিকল্পনা তন্ত্রশাস্ত্রের এক স্বতন্ত্র অবদান। দেবতার বীজমন্ত্রের জপ ও ধ্যানের দ্বারাই দেবতার সাক্ষাৎকার ঘটে। মন্ত্রশক্তির দ্বারা যে অসাধ্য সাধন করা যায়, সেবিষয়ে তন্ত্রে বিবিধ সাধন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতিতে মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পঞ্চমুণ্ডি আসন, চিতাসাধন, শবসাধন, পুরশ্চরণ, বিবিধ ন্যাস, মুদ্রা, জপ প্রভৃতির বিধান দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ যোগ, মন্ত্র ও দ্রব্যশক্তি—এই তিনের সমন্বয়ে যথাবিহিত সাধন-ক্রমই তন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

তন্ত্র মূলতঃ ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়াই তান্ত্রিকধর্মের মূলকথা। প্রকৃত ক্রিয়াবান সাধকই তন্ত্রের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। ক্রিয়া বা নিয়মতান্ত্রিক সাধনানুষ্ঠানের মাধ্যমেই

তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত দর্শনের উপলব্ধি হবে। কেবলমাত্র মেধা, বিদ্যা ও আলোচনার সাহায্যে তন্ত্রতত্ত্বের রহস্যোদঘাটন সম্ভব নয়। এইকারণেই তান্ত্রিক সাধনায় এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে, যা আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরোধী মনে হয়। তন্ত্রের ষট্‌কর্ম, যোগিনীসাধন, নারীসহ সাধনা, পঞ্চতত্ত্বসহ সাধনা, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধন-ক্রিয়াগুলি অনেকের নিকট আপত্তিজনক মনে হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সাধন-প্রক্রিয়াগুলি এক দুরবগাহ রহস্যে আবৃত। সদ্‌গুরুর সহায়তায় যথার্থ ক্রিয়ানিষ্ঠ সাধকই উক্ত সাধনাসমূহের মর্মোদ্ভেদ করতে পারে। অনধিকারী সাধারণ ব্যক্তিরা তান্ত্রিক আচারাদির কদর্থ করতে পারে বলেই তান্ত্রিক কৌলাচার ক্রিয়ানুষ্ঠানকে সুগুপ্ত রাখবার জন্য তন্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা,—

"কুলধর্মমিদং দেবি সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
গোপয়েচ্চ প্রযত্নের জননীজারবৎ প্রিয়ে।।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।।"

—'কুলার্ণবতন্ত্র' (১১।৮৪-৮৫)।

[হে দেবি, সর্বদা সর্বাবস্থায় জননীজারবৎ এই কুলধর্ম গোপন রাখতে হবে। বেদশাস্ত্র-পুরাণসমূহ সামান্য গণিকার মত। আর এই শাম্ভবী বিদ্যা অর্থাৎ কুলশাস্ত্র কুলবধূর ন্যায় গুপ্তা।]

তন্ত্রের কোন আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াই অর্থহীন নয়। তন্ত্রশাস্ত্র মানুষের ইহলৌকিক ও আধ্যাত্মিকজীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বহুবিচিত্র সাধন-ক্রিয়াদির ব্যবস্থা দান করেছে। উপযুক্ত অধিকারী তান্ত্রিক সাধক এই সমস্ত ক্রিয়ার যথাবিহিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ফললাভ করেন। পূর্বে বলেছি যে, তন্ত্র প্রত্যক্ষ শাস্ত্র ;নিছক ভাবকল্পনার স্থান তন্ত্রে নাই। প্রত্যক্ষসিদ্ধির দ্বারাই ক্রিয়াবান তান্ত্রিকসাধক একের পর এক স্তর অতিক্রম ক'রে সর্বশেষে পরমব্রহ্মে বিলীন হয়ে যান। Sir John Woodroffe তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার এই ক্রিয়াভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন যে,—"The tantra, infine, is from its very nature an Encyclopaedic science. It is practical, has no concern with wordy warefare. It lights the torch and shows the way, step by step, until the sojourner comes to the end of his journey."[৫১] ক্রিয়ার মাধ্যমেই তান্ত্রিক সাধনার মূলীভূত দর্শন উপলব্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র হচ্ছে তথ্য ও তত্ত্ব, ক্রিয়া ও দর্শন, জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতত্ত্বের সম্মিলিত সাধনশাস্ত্র।

তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে এই যে, রমণীকে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তন্ত্র। তন্ত্র-ধর্ম নারীকে যেরকম সর্বোচ্চ মহিমায় ভূষিত করেছে, সেইরকম আর কোন ধর্মে বা সম্প্রদায়ে দেখা যায় না। বেদে ও বৈদিকধর্মে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু তান্ত্রিকধর্মে সর্বপ্রকার সাধনায় ও অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তন্ত্রোক্ত দীক্ষাদান কর্মে স্ত্রীগুরুর ভূমিকা স্বীকৃত। তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র বর্ণিত হয়েছে।[৫২] তন্ত্রোক্ত শক্তি-সাধনা, কুমারীপূজা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নারীর অপরিসীম মহিমাই বিঘোষিত হয়েছে। কৌলাচারী তান্ত্রিক সাধকের নিকট মহাশক্তি স্বরূপিনী নারীর আসন সর্বোচ্চে। তন্ত্রের কুলাচার নিরূপণে বলা হয়েছে যে, সাধক সমস্ত জগতকে স্ত্রীময় ভাবনা করবে এবং নিজেকেও স্ত্রীময় জ্ঞান করবে। বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা রমণীকেও ইষ্টদেবতাস্বরূপ চিন্তা করবে। স্ত্রীলোকের নিন্দা করা, স্ত্রীলোকের প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন প্রভৃতি অবশ্য পরিত্যাজ্য। স্ত্রীগণই সমস্ত দেবীস্বরূপ, স্ত্রীগণ প্রাণ-সমূহ স্বরূপ। স্ত্রীগণই সকলের বিভূষণস্বরূপ। এই বিষয়ে তন্ত্রোক্তবচন নিম্নে উদ্ধৃত হল; যথা,—

(১) "স্ত্রীময়ঞ্চজগৎ সর্বং স্বয়ং তাবত্তথা ভবেৎ।

* * *

বালাং যৌবনোম্মত্তাং বৃদ্ধাম্বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্যবিভায়েৎ।
তাসাং প্রহারং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যপ্রিয়ং তথা।
সর্বথা চ ন কুর্যাত্তু চান্যথা সিদ্ধিরোধকৃৎ॥"[৫৩]

(২) "স্ত্রিয়ো দেব্যঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্॥"

—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৫।৩৮)।

তন্ত্রের দৃষ্টিতে যেহেতু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই শক্তিময় এবং জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতি পরমাশক্তিরই অভিব্যক্তি, সেই হেতু তান্ত্রিক সাধনায় নারীর মহিমা উচ্ছ্বসিতভাবে কীর্তিত হয়েছে।[৫৪]

বস্তুতঃ, তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনা এক উদার মানবিকতা ও সার্বজনীন জীবনাদর্শের উপর অধিষ্ঠিত। তন্ত্রোক্ত সাধনায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত জাতিরই অধিকার রয়েছে। মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও রুচি পরিদৃষ্ট হয়' তন্ত্রশাস্ত্র প্রকৃতি, সংস্কার ও রুচি অনুসারে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই পৃথক পৃথক সাধন-

ক্রম নির্দিষ্ট করেছে। তান্ত্রিক সাধনার সুবিশাল চন্দ্রাতপের নিম্নে ভোগী-সংযমী, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সকলেরই উদার আমন্ত্রণ। "......কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতে তন্ত্রের আপত্তি নাই।"[৫৫] তন্ত্র মানুষের বাস্তবজীবনকে অস্বীকার করে নি। ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবসংসারের প্রতি তন্ত্র প্রেমপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে মানুষের পার্থিবজীবনের সমস্যা-সমাধানের সর্ববিধ পথ-নির্দেশ করেছে বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান ও সাধন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তারপর ধীরে ধীরে স্তর পরম্পরায় সংসার-বদ্ধ মানুষকে নিয়ে গিয়েছে ব্রহ্মতত্ত্বের নিঃসীমলোকে। অদ্বৈততত্ত্বের উপর দণ্ডায়মান হয়ে তন্ত্রশাস্ত্র পার্থিব থেকে অপার্থিবে, অবিদ্যা থেকে বিদ্যায়, জীবত্ব থেকে শিবত্বে উপনীত হওয়ার যে বিচিত্র পথ নির্মাণ করেছে, তা' আর কোন সাধন-শাস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় নি।

বৌদ্ধতান্ত্রিকদের উদ্ভব ও বিকাশ

তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধনার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল ভারতের বৌদ্ধধর্মের উপর। বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রভাবের ফলেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, তান্ত্রিক সাধনার কোন কোন আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনই আবার ভারতের প্রাগার্যযুগের আর্যেতর জাতিসমূহের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। তন্ত্র-সাধনার শক্তিতত্ত্ব, দৈবক্রিয়ার দ্বারা মনোভীষ্টপূরণ, ধর্মসাধনায় নারী ও সুরার ব্যবহার প্রভৃতির ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। তন্ত্র যে কেবল ভারতের শৈব ও শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়; বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মসাধনাকেই তন্ত্র প্রভাবিত করেছে।

তন্ত্রসাধনা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে বিচিত্রগতিতে প্রবাহিত। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই তন্ত্র ভারতীয় জীবন-ধারায় এবং ধর্মে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৫৬] পণ্ডিতগণের অনুমান যে, বুদ্ধদেবের সময় থেকেই এই তান্ত্রিকাচার প্রবেশের পথটি প্রস্তুত হচ্ছিল।[৫৭] সাধারণ মানুষ ধর্ম সাধনার নিবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা প্রবৃত্তিমার্গের পথেই অধিক আগ্রহশীল। কাজেই বুদ্ধদেব যখন কঠোর নিবৃত্তিমার্গের ভিক্ষুধর্মে মানুষকে দীক্ষিত করতে লাগলেন, তখন এমন কিছু লোক দেখা গেল, যারা বুদ্ধের সুকঠোর নিয়মাবলী পালনে সক্ষম হল না। 'বিনয়পিটক' থেকে

জানা যায় যে, এই শ্রেণীর ভিক্ষুরা মদ্যপান, নৃত্য গীতাদি উপভোগ, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকত। বুদ্ধদেব এটা জানতে পেরে তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে ঐ সমস্ত ভিক্ষুদের সম্পর্কে 'পব্বজনীয় কম্ম' করার জন্য অর্থাৎ তাদেরকে বহিষ্কৃত করার জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সমস্ত ভিক্ষুরাই তৎকালীন প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনাকে বৌদ্ধধর্মের আবরণে গ্রহণ করে। তন্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় পথেই ধর্মসাধনার বিশিষ্ট পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকায় সম্ভবতঃ তারা সমকালীন তান্ত্রিক ধর্মসাধনার পথটিকে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।[৫৮]

নির্বাণলাভের জন্য বৌদ্ধধর্মের অত্যধিক কৃচ্ছ্র সাধনাই পরবর্তীকালে এই ধর্মের মধ্যে একটা ভাঙ্গন ধরিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের হীনযানী সম্প্রদায় কেবলমাত্র আত্মমুক্তি কামনা করত, তারা অর্হত্ব লাভেই পরমকৃতার্থ। কিন্তু মহাযানী সম্প্রদায়ের কাছে জগতের মুক্তিই ছিল কাম্য। সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তি এবং নির্বাণ না হাওয়া পর্যন্ত মহাযানীরা সন্তুষ্ট নয়। এজ্যই আপামর জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্মের পরিমণ্ডলে আনয়ন করবার জন্য মহাযানীদেরকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রসম্মত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ মানুষ মন্ত্রশক্তির সাহায্যে বিপন্মুক্তি, শত্রুদমন, দেবদেবীর কৃপায় অভীষ্টলাভ এবং অলৌকিক ক্ষমতায় মনোরথসিদ্ধি প্রভৃত্তি বিশ্বাস করে এবং এইগুলি তান্ত্রিক চিন্তাধারা বা তন্ত্রমতের অঙ্গীভূত। সাধারণ মানুষের এই প্রবৃত্তিমুখী ধর্ম বিশ্বাস এবং জাগতিক সুখলাভের বাসনার জন্যই মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। এ'ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে, তন্ত্রের বিশ্বজনীন মনোভাবই মহাযানী বৌদ্ধদেরকে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কারণ, তন্ত্রে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বমানবের মুক্তির জন্য বিবিধ সাধনপথের বিধান আছে। তন্ত্র কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেনি। প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী মানুষ—উভয়ের জন্যই তন্ত্রে বিশেষ বিশেষ সাধনপদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। সম্ভবতঃ, মহাযানীরা তন্ত্রের উদার সার্বজনীন চিন্তাধারাকে নিজেদের সর্বকল্যাণমূলক আদর্শের অনুকূল মনে করেছিল বলেই মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রমত প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল এবং এই সম্প্রদায় থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত সৃষ্ট হয়ে[৫৯] পরবর্তীকালে বহু বিস্তৃত রূপলাভ করেছিল। এই বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত; যথা,—'বজ্রযান', 'কালচক্রযান' ও 'সহজযান'।

বজ্রযানই বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রধান শাখা। মহাযান-মতবাদের শূন্যতত্ত্বই বজ্রযানীদের দ্বারা 'বজ্র' নামে অভিহিত হয়েছে। শূন্যতা 'অভেদ্য', 'অদাহ্য', 'অচ্ছেদ্য' হওয়ার জন্যই বজ্র নামে অভিহিত হয়েছে।[৬০] বজ্রযানীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমতত্ত্বকে

'বজ্রসত্ত্ব'রূপে কল্পনা করেছে। বজ্রসত্ত্বই আদিবুদ্ধ। বজ্রযানী বৌদ্ধতন্ত্রে হিন্দুতন্ত্রের পরমব্রহ্মের কল্পনার ন্যায় 'বজ্রসত্ত্ব'কে পরমদেবতা বা পরমেশ্বর এবং মানবের অন্তর-সত্তা বা আত্মারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব, দেবদেবী ও মন্ত্রশক্তিতে আস্থাবান হওয়ার ফলেই বজ্রযানী সম্প্রদায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁদের প্রত্যেকের 'শক্তি' বা 'দেবী' কল্পনা করেছে। বজ্রযানে দেবতা, মুদ্রা, মণ্ডল প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। তন্ত্রের প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে না পারলে সত্যজ্ঞান লাভ করা দুরূহ। এজন্যই বজ্রযানী সম্প্রদায় প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিকে আয়ত্তাধীন ক'রে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলকে সাধনাঙ্গ করেছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করবার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য, তেমনই বজ্রযানীদের মতে প্রজ্ঞাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্যই মুদ্রা, মণ্ডল প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে। হিন্দু কৌলতান্ত্রিকদের চক্রপূজার ন্যায় বজ্রযানীদের মধ্যেও মদ্য,, মাংস, মুদ্রা (স্ত্রী) সহকারে গোপন পূজা-পদ্ধতি ছিল। হিন্দুতন্ত্র যেমন জগতের সমস্ত নারীকে মহাশক্তির প্রতীক মনে করে, তেমনই বজ্রযানীদের মতে কামিনী প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিনিধিস্বরূপা। হিন্দুতান্ত্রিকদের ন্যায় বজ্রযানী বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও অক্ষুব্ধচিত্তে নারীসহ সাধনাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়রূপে গণ্য করেছে।[৬১]

'কালচক্রযান' বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অপর একটি শাখা। কালচক্রযানে কালচক্রকেই বলা হয়েছে বজ্রসত্ত্ব। কালচক্র শূন্যতা ও করুণার সম্মিলিতসত্তা এবং সর্বজ্ঞ ও পরম আদিবুদ্ধ। কালচক্রযানীরা সাধনায় বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করুণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির প্রাধান্য দিয়েছেন।[৬২] তাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করতেন। নেপাল থেকে আবিষ্কৃত কালচক্রযানীদের একখানি পুঁথির নাম হচ্ছে 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'; এর অন্য নাম হচ্ছে 'বিমলপ্রভা'।

সহজযান তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উল্লেখযোগ্য শাখা। সহজযানের সঙ্গে আমাদের আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সহজযানে তন্ত্রোক্ত সাধনার বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি, এতে অন্তরঙ্গ গুহ্য সাধনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সহজযানের অধিকাংশ প্রাচীনশাস্ত্র তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত তিল্লোপাদ, কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকোষে আমরা সহজযানের সাধনার পরিচয় পাই। মীননাথ, লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রভৃতি বাংলার চর্যাপদের রচয়িতারা এই সহজযানী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। দেবদেবীর পূজা, মন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সহজযানী সাধকেরা কটাক্ষপাত করেছেন। কাহ্নপাদ একটি দোহায় বলছেন,—

"আগমবেঅ পুরাণে পংড়িঅ মান বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহোরিত ভূময়ন্তি।"[৬৩]

অর্থাৎ আগম, বেদ, পুরাণাদি পড়ে লোকে গর্ব করে, কিন্তু মধুমক্ষিকা যেমন পাকা বেলফলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তারাও তেমনই ঐ সব শাস্ত্রের বাইরের দিকটাই দেখে।

সরহপাদ বলছেন,—

'আইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণেহিঁ বইসী খণ্ডা চালী॥
অক্‌খি নিবেসী আসন বন্ধী।
কণ্ণেহি খুস খুসাই জন ধন্ধী॥"[৬৪]

অর্থাৎ মিথ্যাচারী গায়ে ভস্মলেপন ক'রে এবং মাথায় জটাভার বহন ক'রে শিষ্যকে বিপথে চালনা করে। ঘরে প্রদীপ জ্বেলে এবং ঈশান কোণে ব'সে ঘণ্টা নেড়ে মিথ্যা পূজার ভান ক'রে লোককে প্রতারণা করে। চক্ষু স্থির ক'রে এবং আসনবন্দী হ'য়ে ধন্ধজনের কানে খুসখুস ক'রে মন্ত্র দেয়।

সহজসিদ্ধি যে যাগযজ্ঞাদি, মন্ত্রতন্ত্র ও স্নানাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা লভ্য নয়, এটাই তিল্লোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্নপাদ নানাভাবে নানাস্থানে বলেছেন। সহজযানের চরম লক্ষ্য— পরমমহাসুখরূপ সহজের উপলব্ধি। সহজানন্দই হল চিত্তের তুরীয় অবস্থা এবং এটাই মহাসুখ। এই মহাসুখলাভের জন্য সহজযানীরা তন্ত্রের কতকগুলি শারীরিক চর্যা ও সাধনপ্রক্রিয়াকে গ্রহণ করেছিল।

তন্ত্রের মন্ত্রবিশ্বাস, মুদ্রা, প্রাণায়াম, কুণ্ডলিনীযোগক্রিয়া, যন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দুতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায় যে হিন্দু তন্ত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা' বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রও দেহমধ্যে পরমাত্মার অবস্থিতি কল্পনা করে দেহকেই সাধনপীঠ চিন্তা করেছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 'হঁউবুদ্ধ', 'হঁউনিরঞ্জন'[৬৫] হিন্দুতান্ত্রিকদের 'শিবোঽহং' উক্তিকেই স্মরণকরিয়ে দেয়। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেও দেহমধ্যে

মেরুদণ্ডকে মেরু-পর্বতরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুতন্ত্রে মানবদেহে প্রধানতঃ মূলাধার, স্বধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্রের কথা বলা হয়েছে এবং সর্বোপরি মস্তকে সহস্রার পদ্মের কল্পনা করা হয়েছে। হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রকে একত্র ক'রে বৌদ্ধতন্ত্রে নাভির নিম্নে 'নির্মাণচক্র' বা 'নির্মাণকায়' চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুতন্ত্র হৃদয়ে যাকে 'অনাহত' চক্র বলেছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাকেই 'ধর্মকায়' বা 'ধর্মচক্র' বলা হয়েছে। কণ্ঠদেশে অবস্থিত হিন্দুতন্ত্রের 'বিশুদ্ধচক্র' বৌদ্ধতন্ত্রে 'সম্ভোগকায়' বা 'সম্ভোগচক্র' নামে অভিহিত। হিন্দুতন্ত্রের সহস্রদল পদ্মের ন্যায় মস্তকের শীর্ষদেশে 'মহাসুখচক্র', 'উষ্ণীষকমল' বা 'মহাসুখকমলে'র কথা বলা হয়েছে। এটি 'সহজকায়' নামেও কথিত।

হিন্দুতন্ত্রে যেমন বিভিন্নচক্রে শক্তির অধিষ্ঠান বর্ণনা করা হয়েছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও তেমনই চারটি চক্রে চারটি দেবীর (লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা ও তারা) অবস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। 'হেবজ্রতন্ত্রে' এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত মানবদেহের বামভাগস্থিত 'ইড়া' নাড়ী বৌদ্ধতন্ত্রে 'ললনা', 'অলি', 'ধমন', 'চন্দ্র' প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত। হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত দেহের দক্ষিণদিকস্থ 'পিঙ্গলা' নাড়ী বৌদ্ধতন্ত্রে 'রসনা', 'কালি', 'চমন', 'সূর্য' প্রভৃতি নামে কথিত। হিন্দুতন্ত্রের ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ীই বৌদ্ধতন্ত্রে 'অবধূতী' নামে আখ্যাত। 'অবধূতী'কে বৌদ্ধতন্ত্রে 'দেবী', 'প্রজ্ঞা', 'নৈরাত্মা', 'যোগিনী', 'সহজসুন্দরী' প্রভৃতি বলা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে 'ললনা'কে 'প্রজ্ঞা' এবং 'রসনা'কে 'উপায়' বলা হয়েছে এবং এই দুই নাড়ীর মিলন মধ্যবর্তী নাড়ী 'অবধূতী'তে হলে প্রজ্ঞোপায়ের মিলন সাধিত হয়।

'গুহ্যসমাজতন্ত্রে' উল্লিখিত ষড়ঙ্গযোগ মূলতঃ হিন্দুতন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের উক্তিটি এ'প্রসঙ্গে স্মরণীয়;—'বলা বাহুল্য তন্ত্রশাস্ত্রে শিব ও শক্তির যে স্থান কিংবা তাৎপর্য, বজ্রযান ও সহজযানের শূন্যতা ও করুণা অথবা বজ্র ও কমলেরও অনেকাংশে সেই স্থান ও তাৎপর্য। সুতরাং অর্বাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে যে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা বর্ণিত দেখা যায়, অথবা যেখানে বজ্রের সঙ্গে কমলের সংঘটনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তির মিলনই বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে যন্ত্রমধ্যে এই মিলন বুঝাইবার জন্য দুইটি সমকেন্দ্র ত্রিকোণ—একটি ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ ও একটি অধোমুখ ত্রিকোণ—পরস্পর জড়িত রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণদ্বয়কে সাধারণতঃ ষট্‌কোণ বলা হয়। এই ষট্‌কোণের কেন্দ্রস্থানেই বিন্দুর অবস্থান। সহজিয়াগণও মহামুদ্রাকে 'এবং' আকার বলিয়া বর্ণনা করেন, সুতরাং তাঁহারাও তান্ত্রিক বিষয়কেই

স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভাষায় 'এ' বলিতে মাতা বা চন্দ্র এবং 'ব' বলিতে রতাধিপতি বা সূর্য বুঝাইয়া থাকে। বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল। 'এ'-কার ও 'ব'-কারের সংযোগ মাতা-পিতা অথবা চন্দ্র-সূর্যের সংযোগ ভিন্ন অপর কিছুই নহে।"[৬৬]

হিন্দুতন্ত্রের শিব-শক্তির সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের ও উপায়ের কেবল যে তত্ত্বগত ঐক্য, তা নয়;শিবশক্তিতত্ত্বের স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধতন্ত্রে; যথা,—

(১) "শিবশক্তি সমাযোগাৎজায়তে চাদ্ভুতং সুখম্।"[৬৭]

(২) "শিবশক্তি-সমাযোগাৎ সৎ-সুখংপরমাদ্বয়ম্।
ন শিব নাপি শক্তিশ্চ রত্নান্তর্গত-সংস্থিতম্।।"[৬৮]

হিন্দুতন্ত্র যেমন জগতের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে শিব ও শক্তির প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন, বৌদ্ধতন্ত্র তেমনই নারীকে 'প্রজ্ঞা' এবং পুরুষকে 'উপায়' বলে[৬৯] অভিহিত করেছে। আরও লক্ষীয় বিষয় এই যে, বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞারূপিনী নারীকে 'কমল' এবং উপায়রূপী পুরুষকে 'বজ্র' বলা হয়েছে। এই দুইটি শব্দ হিন্দুতান্ত্রিকদের যোনিলিঙ্গের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের প্রতীকরূপেই বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা ব্যবহার করেছেন।[৭০]

তন্ত্রের মন্ত্রশক্তি বা বীজমন্ত্র বৌদ্ধধর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের আটহাজার শ্লোকসমন্বিত "অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞা পারমিতা" নামক প্রধান ধর্মগ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে 'প্রং' নামক একটি একাক্ষর বীজমন্ত্রে পরিণত করা হয়।[৭১] এই 'প্রং' মন্ত্র জপের দ্বারা শূন্যতা, প্রজ্ঞা-পারমিতা দেবীরূপে দর্শন দিবেন। এই জাতীয় মন্ত্র আমাদেরকে হিন্দুতন্ত্রের 'হ্রীং', 'গং', 'শ্রীং' প্রভৃতি মন্ত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দুতন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রের মধ্য দিয়ে যেমন নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ প্রতিপাদিত হয়েছে, বৌদ্ধতন্ত্রের 'প্রং' মন্ত্রটি ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধদের 'ধারণী' মন্ত্র, অবলোকিতেশ্বরের "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" প্রভৃতি এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রপ্রভাবেরই স্বাক্ষর।

এইভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেহমধ্যে চক্র-কল্পনায়, প্রজ্ঞা-উপায়তত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুতন্ত্রোক্ত চক্র, নাড়ী ও শিব-শক্তিতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের দেবদেবীর পরিকল্পনায়ও হিন্দুতন্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অবশ্য, পরবর্তীকালে উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, এ' কথাও সত্য।

পাদটীকা

১। Ajit Mukherjee and Madhukhanna, ' The Tantric way' (Art, Science, Ritual), Thames and Hudson Ltd. London, 1977; Page-9.

২। Sir John Woodroffe—'Shakti and Shakta', Ganesh & Co., Madras 1920, Page-18.

৩। বিহারীলাল সরকার, 'তন্ত্রপ্রদীপ', ১ম খণ্ড, তারক ভবন, ৭৮এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা। পৃ: ১-২।

৪। S.B. Dasgupta—'An introduction to Tantric Buddism,' Calcutta University, 1974, Page-1.

৫। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তন্ত্রকথা', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬২; পৃ: ১।

৬। Chintaharan Chakravorty—'Tantras, Studics on their religion and Literature', Calcutta; 1972, Page-8.

৭। Chintaharan Chakravorty—ibid. Page-9.

৮। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলায় বাউল ও বাউলগান,' কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ: ১৬৯-১৮২।

৯। Chintaharan Chakravorty—ibid. Page-10.

১০। John Marshall, 'Mohenjodaro and Indus Civilisation', London, 1931; Preface—Page V-VII

১১। Father Heras—'The Religion of Mohenjodaro people according to the insecription', Journal of the University of Bombay, V. Part-I, Page-3.

১২। Jack Finegan—'The Archelogy of World Religion', Princeton University, U.S.A. 1952; Pages 125-622.

১৩। R. Shamasastry—'Theory of the origin of the Devanagari Alphabet', The Indian Antiquary, Bombaty, October, 1906; Page-277.

১৪। Chintaharan Chakravorty—ibid; Page-10.

১৫। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮।

১৬। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'অর্থববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি', কলকাতা, ১৩৭০; পৃ: ৩,২২।

১৭। R. Shamsastry—ibid; Pages 267-277.

১৮। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২০৩।

১৯। গোপীনাথ কবিরাজ, 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত', ১ম খণ্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৬৯; পৃ: ২১, ৩৬।

২০। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪।

২১। B. Bhattachary, 'An introduction to Buddhist Esotirism', Humphery Milford, Oxford University press, 1932, Page 48.

২২। যাদদেবশ্বর তর্করত্ন, 'তন্ত্রের প্রাচীনত্ব', সাহিত্য সংহিতা (মাসিক), আশ্বিন, ১৩১৭।

২৩। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'ভারতে শক্তিসাধনা', ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯; পৃ: ৩২৯।

২৪। সুখময় ভট্টাচার্য, রামায়ণের চরিতাবলী—'বানর ও রাক্ষস', আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক), ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ সাল।

২৫। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৩।

২৬। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৩।

২৭। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৫৫।

২৮। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮।

২৯। P.C. Bagchi, 'Studies in the Tantras', Calcutta University, 1952, Page 4ff and 102.

৩০। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, কলকাতা; পৃ: ১৬১।

৩১। গোপীনাথ কবিরাজ, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৬।

৩২। 'যাজ্ঞ্যবল্ক্যসংহিতা', 'কূর্মপুরাণ', 'বরাহপুরাণ', 'লিঙ্গপুরাণ', 'অদ্বয়সিদ্ধি', 'তথাগতগুহ্যক', 'জৈনদিগেরর ভরটক দ্বাত্রিংশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৩। Chintaharan Chakravorty, ibid; page-24.

৩৪। যমুনাচার্যের 'তন্ত্র প্রামাণ্য', বেদোত্তমের 'পাঞ্চরাত্র প্রামাণ্য', ভট্টোজি দীক্ষিতের 'তন্ত্রাধিকারি নির্ণয়' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩৫। Sir John Woodroffe, *ibid*, pages-12, 52.

৩৬। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, 'তন্ত্রতত্ত্ব', কলকাতা, ১৩৮০, পৃ: ১৩।

৩৭। 'মহানির্বাণতন্ত্র', 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৩৮। 'কুব্জিকাতন্ত্র' (১। ২৮-৩০)।

৩৯। 'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৩। ৫১); 'নিরুত্তরতন্ত্র' (২। ৮)।

৪০। 'তোড়লতন্ত্র' (২।১-৪); 'শিবসংহিতা' (২। ১-৪)।

৪১। 'কুব্জিকাতন্ত্র', ষষ্ঠ-পটল।

৪২। 'কুব্জিকাতন্ত্র', ষষ্ঠ-পটল।

৪৩। 'মহানির্বাণতন্ত্র' (১।৫৫)।

৪৪। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত, 'কৌলমার্গরহস্য', সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাবলী, নং ৭৬; পৃ: ৯।

৪৫। Mahendranath Sircar, 'Eastern Lights, Calcutta, 1935; page-89.

৪৬। 'যোগিনীতন্ত্র', ষষ্ঠপটল।

৪৭। 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫ম ও ৬ষ্ঠ পটল।

৪৮। 'কুলার্নবতন্ত্র', ১৪।৮৬।

৪৯। 'কুলর্নবতন্ত্র', ১৮।৩৪-৭০।

৫০। 'কামধেনুতন্ত্র', প্রথম পটল।

৫১। Sir John Woodroffe, 'Principles of Tantras', Madras, 1952; Page-39.

৫২। 'মাতৃকাভেদতন্ত্র', 'রুদ্রযামলতন্ত্র', 'গুপ্তসাধনতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫৩। 'তন্ত্রসার', পৃ: ১০৫৪।

৫৪। 'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৪র্থ ও ৫ম পটল), 'গন্ধর্বতন্ত্র' (৪৮।৪৪), 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র' (৩।৮৫-৮৬) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৫৫। শিবচন্দ্র বিদ্যার্নব, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৭৭।

৫৬। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'ভারতে শক্তিসাধনা', কলকাতা, ১৩৬৯ সাল, পৃ: ১৯৮।

৫৭। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, 'অন্ত্রতত্ত্ব', গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'তন্ত্রতত্ত্বনির্দেশিকা' নামে সম্পাদিত ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ: ১৫-৫১।

৫৮। উপেন্দ্রনাথ দাস, 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', বিশ্বভারতী, ১৩৭৩; পৃ: ১০০৭-১০০৮।

৫৯। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩০।

৬০। অমূল্যনাথ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩০-৩৩২।

৬১। "তথা তথা প্রবর্তেত যথা ন ক্ষুভ্যতে মনঃ
সংক্ষুব্ধে চিত্তেরত্নেতু সিদ্ধির্নৈব কদাচন।।"
—'প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' (৫।৪০)।

৬২। প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ: ৪৬।

৬৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩১৬; পৃ: ১২৩।

৬৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'প্রাগুক্ত'; পৃ: ৮৪-৮৫।

৬৫। প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'প্রাগুক্ত', পৃ:৫২।

৬৬। গোপীনাথ কবিরাজ, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম', 'উত্তরা' (কার্ত্তিক) ১৩৩৪; পৃ: ১১২।

৬৭। 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ', বরোদাসংস্করণ, পৃ: ২৮।

৬৮। 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ', বরোদাসংস্করণ, পৃ: ২৮।

৬৯। "যোষিৎ তাবৎ ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃত।"

৭০। "স্ত্রীন্দ্রিয়ং চ যথা পদ্মং বজ্রং পুংসেন্দ্রিয়ং তথা।"

—'জ্ঞানসিদ্ধি', ২য় পরিচ্ছেদ, শ্লোক নং ১১।

বরোদাসংস্করণ।

৭১। B. Bhattacharya, 'An introduction of Buddhist Esoterism', Humfrey Milford, Oxford University free, 1932; Page-56.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় তান্ত্রিকধর্ম

বাংলায় তন্ত্র ও তান্ত্রিকধর্মের রূপ-প্রকৃতি ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে বাংলায় তন্ত্র ও তান্ত্রিকধর্মের রূপ-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে। কারণ সাহিত্য হচ্ছে মানুষের জীবনবেদ। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে সাহিত্যের মধ্যে। মানব সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিচিত্র প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যও বাংলার সমাজ-জীবনেরই পরকলা। বিশেষতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবন-প্রবাহের বিচিত্র রূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অতএব, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তন্ত্র ও শাক্তধর্মের যে প্রভাব পড়েছে, তা' প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর ধর্মজীবনে তন্ত্র-প্রধান্যেরই সূচক। তান্ত্রিকতা ও শাক্ত-সংস্কারের সঙ্গে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির গভীর সংযোগের ফলেই প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তন্ত্রোক্ত ধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি বাঙময় হয়ে উঠেছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রবাহ চলে আসছে। বাংলাদেশই তন্ত্র-সাধনার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশক্ষেত্র। ভারতের প্রায় সর্বত্রই তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক সাধনার পরিচয় পাওয়া গেলেও ভারতের কতকগুলি বিশেষ অঞ্চল কেবলমাত্র তান্ত্রিক সাধনার জন্যই প্রসিদ্ধ। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, কামরূপ, বাংলা এবং হিমালয় পর্বত-সংশ্লিষ্ট ভূভাগকে সাধারণতঃ তান্ত্রিক-অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমে তন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। তারপর উত্তর-পূর্ব ভারতে তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং বাংলাদেশ তন্ত্রমতের প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়ে।[১] বাংলাদেশ ও কামরূপ তান্ত্রিক-সাধনার পীঠস্থানরূপে প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বর্তমানে কামরূপ আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও কামাখ্যা মহাপীঠ বাংলার অন্তর্গত ছিল।

ভৌগোলিক সংস্থান অনুসারে তন্ত্রের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তার দ্বারাও

বাংলাদেশে তন্ত্র-প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। অশ্বক্রান্তা (গজক্রান্তাও বলা হয়), বিষ্ণুক্রান্তা ও রথক্রান্তা—এই তিনটি বিভাগের মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত থেকে চট্টল পর্যন্ত হচ্ছে বিষ্ণুক্রান্তার সীমা। কাজেই বাংলাদেশ এর অন্তর্গত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ" বলে যে প্রধান তিনটি তান্ত্রিক-সংস্কৃতির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে,[২] তাতেও আমরা বাংলাদেশের উল্লেখ পাচ্ছি। অনেকের অনুমান যে, বাংলাদেশ থেকেই যবদ্বীপ (জাভা), কম্বোজ প্রভৃতি দেশে তন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।[৩]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সঙ্গে তন্ত্র ও তান্ত্রিকধর্মের সম্পর্ক সুগভীর। বাংলায় বৈদিক ধর্মের প্রভাব অপেক্ষা তন্ত্রধর্ম ও তান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয়ই বেশী। বাংলা চিরদিনই তান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। বাঙ্গালীর ধর্মজীবন, দৈনন্দিন জীবনের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তান্ত্রিক ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রভাব সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান। বাংলার ইতিহাস থেকেও আমরা বাংলা ও বাঙ্গালীর সঙ্গে তন্ত্রের এই নিগূঢ় সম্পর্কের প্রমাণ পাই।

বাংলায় আর্য-সভ্যতা বিস্তারের পূর্বে বাংলাদেশে ধর্মের রূপ-প্রকৃতি অবৈদিক ও আর্যেতর ছিল। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান স্বচ্ছ নয়। তবে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা আর্যেতর জাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে মাতৃ-দেবতা শক্তি ও পুরুষ দেবতা শিবের উপাসনা, লিঙ্গপূজা, পশু ও বৃক্ষাদির পূজা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।[৪] প্রাগার্যযুগের ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আমরা মন্ত্রে বিশ্বাস, বশীকরণ-মন্ত্র, ভূত-প্রেত-অপদেবতার দৃষ্টি-নিবারণ প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাস ও মানসিক সংস্কারের যে পরিচয় পাই, প্রাগার্যযুগের বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও সম্ভবতঃ সেই জাতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতদের অনুমান যে, প্রাগার্যযুগের বাঙ্গালীর মধ্যে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠন ও ধর্ম-সংস্কার বিদ্যমান ছিল, তার সঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম ও সংস্কারের একটা সম্পর্ক রয়েছে।[৫] বাংলার আদিম অধিবাসীদের মন্ত্রে বিশ্বাস, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, নানাপ্রকার গুহ্যক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তান্ত্রিকতার একটা আভাস পরিলক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় আর্যসভ্যতার প্রভাব পড়েছিল।[৬] আর্য সভ্যতার প্রভাবে বাংলায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। কিন্তু গুপ্তযুগের অর্থাৎ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর পূর্বে বাংলার এই সকল ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ

পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগের বাংলায় আমরা বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পরিচয় পাই।[৭] গুপ্তযুগের বাংলায় বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটলেও বাংলার জনসাধারণের ধর্মাচরণে ও পূজা অনুষ্ঠানে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। গুপ্তযুগে মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার প্রবেশ লাভ ঘটে। কারণ, হিন্দুধর্মের পূজার্চনা-পদ্ধতির দেবদেবীর মূর্তিকল্পনা, আসন, মুদ্রা, ন্যাস, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, ধ্যান, দেবতার প্রতীক বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, ধ্যান, যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতির মধ্যে তান্ত্রিক অংশই সমধিক। গুপ্তযুগে তন্ত্রোক্ত ভাবধারা পৌরাণিক ধর্ম, শৈব-আগম ও শৈব-যামলগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই যুগের শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্র-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গুপ্তযুগে হিন্দুতন্ত্রের একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৮]

গুপ্তযুগের পর পালযুগে বাংলায় ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে একটা মিলনমূলক ভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম-সংস্কৃতি, বৌদ্ধধর্ম এবং তান্ত্রিক ধর্ম—ধর্ম ও সংস্কৃতির এই তিনটি ধারার মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটে। এই সময় তান্ত্রিকধর্ম যেমন পৌরাণিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনই বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্মীয় চেতনা ও সংস্কারও তান্ত্রিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। পালবংশের রাজত্বকাল থেকে প্রায় চারশত বৎসরকালব্যাপী বাংলায় ধর্মীয় পরিমণ্ডল ও সমাজজীবনে তান্ত্রিক ভাবধারার সবিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতেপাল-নৃপতিদের সময়ে বাংলার যে সকল বজ্রাচার্যের আবির্ভাব হয়, তাঁরা সিদ্ধিবলে নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করতেন। এই সময় রচিত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বাংলায় তন্ত্র-প্রভাবের স্বাক্ষর বহন করে।[৯] পালযুগেই সিদ্ধাচার্যদের হাতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদে'র সৃষ্টি হয়। 'চর্যাপদে'র মধ্যে আমরা তান্ত্রিকতার সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করি। এ'যুগের উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীর যুগল মূর্তিগলি তন্ত্র-ধর্মের ব্যাপক প্রভাবের বিষয়ই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ'সময়ের সর্বমঙ্গলা, অপরাজিতা, মহেশ্বরী, কৌমারী, বারাহী, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীমূর্তিগুলি বাংলায় শাক্ত ও তান্ত্রিকধর্মের প্রাধান্যের পরিচায়ক। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পে তন্ত্র-চেতনার স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।[১০]

বাংলায় সেনযুগে বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-নির্ভর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও হিন্দু-তান্ত্রিকধর্ম এই সময়েই একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজা বল্লাল সেন তন্ত্র-সাধনায় আগ্রহী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁরও "একটি চণ্ডালিনী শক্তিরূপে ছিল।"[১১] সেনযুগের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেব ভট্টকে তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রে

ব্যুৎপন্ন বলা হয়েছে। এই যুগে হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রাবল্যে বজ্রযানী বৌদ্ধেরা হিন্দুতন্ত্রের আশ্রয়ে আসতে থাকে। তত্ত্ব, দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শগত ঐক্যের ফলে সেন আমলেই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই হিন্দুতান্ত্রিক ও বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের মিলন সাধিত হয়েছিল।

অতঃপর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালীর প্রধান ধর্মই ছিল তান্ত্রিক শাক্তধর্ম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার গণজীবন ও সমাজ-মানসে তন্ত্রের ও শাক্তধর্মের প্রভাব ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতক 'দনুজমর্দন' উপাধীধারী রাজা গণেশের[১২] মুদ্রায় 'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' বলে লিখিত আছে;—এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল এবং তাঁরা শক্তিপূজার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। কেবল সে সময়েই নয়, পরবর্তীকালেও বাংলার প্রায় অধিকাংশ ভৌমিক ও জমিদারদের বংশই তান্ত্রিক ছিলেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এই সময় বাংলাদেশে তন্ত্রোক্ত শাক্তধর্মের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাঙ্গালী-সমাজে মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি শক্তি দেবীর বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং তান্ত্রিক শাক্তধর্ম বাংলার জনজীবনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন শক্তিদেবীর পূজা এবং সেইসঙ্গে পঞ্চমকারাদির সাধনা দেশে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল।[১৩] চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার পর্যন্ত অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তান্ত্রিকাচার ও অনুষ্ঠান সমগ্র বাংলাদেশে যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে' সম্পর্কে একজন পণ্ডিতের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"ধর্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্বাচীন বৌদ্ধের সহজসাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত-তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপার বাংলার নরম মাটিতে সত্বরে পুষ্পে-ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্তসাধক যখন ইন্দ্রিয়সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল;মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, বাসলী, প্রভৃতির পূজায় এবং তামসিক উৎসবে সাধারণ লোকের ধর্মকর্ম যখন বিকৃত হইতেছিল, তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় ভাগবত বৈষ্ণব মতের নব আবির্ভাব সহজ হইল।"[১৪] চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলায় যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন দেখা গেল, সেই বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যেও তন্ত্রোক্ত ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বাংলার ষড়-গোস্বামিগণ চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের যে রূপদান করেছেন, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট।[১৫] স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দনের 'দীক্ষাতত্ত্ব' মধযুগের বাংলাদেশে তন্ত্র-ধর্মের ব্যাপক প্রচলনের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। রঘুনন্দনের

'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' পর্যালোচনা করলে তাঁর সময়ে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব', 'দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব' 'উদ্বাহতত্ত্ব' প্রভৃতিতে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে বহু প্রমাণ উদ্ধার করেছেন।

বস্তুতঃ "তন্ত্রধর্মই বাংলার আদিম ধর্ম।"[১৬] বাংলার জনজীবনে তন্ত্র-প্রাধান্য ও শাক্তসংস্কার মজ্জাগত ; বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যেই তন্ত্রধর্ম ও শাক্তসংস্কার বিদ্যমান। বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মাচরণে এবং পূজাপদ্ধতিতে তন্ত্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিগ্রহ করেছে। "......বাঙ্গালী জনসাধারণ যে ধর্ম জীবনে আচরণ করে, তাহার বাহিরের দিকটা পৌরাণিক, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর ভাগ তান্ত্রিক।"[১৭] আজও বাংলায় এই তান্ত্রিক-সংস্কার ও শাক্তভাবনা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত—"চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বাংলার ছত্রিশ জাতিকে এক সূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোন ধর্মই করে নাই।"[১৮]

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ পরমহংস প্রভৃতি অনেক তান্ত্রিক সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলাদেশে। ত্রিপুরা জেলার মেহারের সর্বানন্দের তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের অলৌকিক কাহিনী আজও সকলের স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল। সর্বানন্দকৃত 'সর্বোল্লাস' নামক একখানি তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ আছে। চাঁদ রায়, কেদার রায়ের গুরু গোঁসাই ভট্টাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর নির্মিত দুটি দেবীযন্ত্র এঁর বংশধরদের কাছে আজও রক্ষিত আছে। বাংলার মিত্রার অর্ধ-কালিকার বংশের কথা সুপ্রচলিত। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, বামাক্ষেপা প্রভৃতি তান্ত্রিকবর্গের অসামান্য সাধন-শক্তির কথা বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয়।

বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের প্রথম ঋত্বিক রামমোহন রায়ের চিন্তায়, কর্মে ও সাহিত্য-সাধনায় তন্ত্র-চেতনা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তন্ত্রের সর্বসংস্কার মুক্তির বাণী রামমোহনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রামমোহন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে যেমন বুৎপন্ন ছিলেন, তেমনই তন্ত্র ও আগমনশাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামক একজন বিশিষ্ট তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও তন্ত্র সাধকের সঙ্গে যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ'কথা রামমোহনের জীবনীকারেরা স্বীকার করেছেন।[১৯] রামমোহন এই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর দ্বারাই 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র সঙ্গে পরিচিত হন এবং এই তন্ত্র গ্রন্থটি তিনি উত্তমরূপে পাঠ করেন। রামমোহনের জীবন ও কর্মে এবং চিন্তাধারায় 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র প্রভাব অপরিসীম। রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণাই ছিল এই 'মহানির্বাণতন্ত্র'। তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট 'মহানির্বাণতন্ত্র' ও 'কুলার্ণবতন্ত্র' গ্রন্থ দুটি সাধন-পথের প্রামাণ্য

নির্ণায়ক। রামমোহনের স্বকীয় ধর্মমত, সমাজ-সংস্কার এবং উদার-মুক্ত চিন্তাধারার পরম অবলম্বন যে এই তন্ত্রগ্রন্থ দুটি ছিল, তার প্রমাণ,—তাঁর অধিকাংশ পুস্তকে এই তন্ত্রগ্রন্থ দুটি থেকে তিনি একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের বক্তব্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তন্ত্রোদ্ধৃত অজস্র বচনসমূহের দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছিলেন। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য এবং আত্মপক্ষকে সমর্থনের জন্য রামমোহন বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রাদি থেকে যেমন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তেমনই বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থের বচন উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের গ্রন্থগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন।[২০]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য আবির্ভাব তন্ত্রসাধনার এক চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত। ঋষি অরবিন্দের জীবনদর্শন ও বাণী তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারারই পরিচায়ক। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ এবং সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তান্ত্রিক ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি একদিন বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সিদ্ধমন্ত্ররূপেই উদ্গীত হয়েছিল;এই সঙ্গীতটির মধ্যেও শাক্ত-তান্ত্রিক চেতনাই বিদ্যমান।

তন্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচার এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থরচনায় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার এক গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। মহামহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্যের 'কাম্যযন্ত্রোদ্বার' নামক গ্রন্থটি বাংলার একটি অতি প্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থ। পুঁথিটি সম্ভবতঃ ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দের।[২১] কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি তাঁন্ত্রিক সাধনা ও পূজার্চনার ক্ষেত্রে বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।[২২] কৃষ্ণানন্দের বংশোদ্ভূতরূপে প্রসিদ্ধ রামতোষণ বিদ্যালংকারের 'প্রাণতোষণী' এবং কৃষ্ণানন্দের এক পৌত্র গোপালপঞ্চাননের 'তন্ত্রদীপিকা' উল্লেখযোগ্য তান্ত্রিকগ্রন্থ। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রহ্মানন্দ 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' এবং 'তারারহস্য' নামক দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে[২৩] 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী' ও 'ষট্‌কর্মোল্লাস' নামক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যবংশের মথুরেশ বিদ্যালংকারের রচিত 'শ্যামাকল্পলতিকা' (১৬৭২ খ্রীঃ) গ্রন্থটি তান্ত্রিককৃত্য ও তন্ত্রের এক উজ্জ্বল স্মারক। গৌড়শঙ্করের (গৌড়ীয়শঙ্কর) 'তারারহস্যপুস্তিকা' (১৬৩০ খ্রীঃ) এবং রঘুনাথ তর্কবাগীশের 'আগমতত্ত্ববিলাস' (১৬৮৭ খ্রীঃ) দুটি উল্লেখযোগ্য তান্ত্রিক গ্রন্থ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনেক তন্ত্রগ্রন্থ ও তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হয়েছে।

উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীতেও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গালীর সুগভীর আগ্রহ ও

অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের 'তন্ত্রতত্ত্ব', অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জপসূত্রম্', মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের 'আগমশাস্ত্রের দিকদর্শন', 'ভারতীয় সাধনার ধারা', 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত', চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'তন্ত্র-কথা', বিহারীলাল সরকারের 'তন্ত্রপ্রদীপ', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য ও সুতীব্র ঔৎসুক্যের পরিচায়ক। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দুইটি দশকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য', 'প্রবাহিনী', 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকায় তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক সার্থক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে 'তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য', 'বাংলার তন্ত্র', 'তন্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব', 'তন্ত্রে দেহতত্ত্ব', 'শিব ও শক্তি', 'কাম ও মদন', 'মানস পূজা', 'তন্ত্রে মূর্তি পূজা', 'দেহের ও দেশের আত্মা', 'রমণী ও জননী', 'পঞ্চমকার' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রবন্ধে লেখকের তন্ত্র ও তান্ত্রিকতা সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি এবং সুগভীর উপলব্ধি অনবদ্য রূপলাভ করেছে।

তান্ত্রিকগ্রন্থ প্রকাশে বাংলার জমিদারবংশের ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। 'তীক্ষ্মকল্প'-এর রচয়িতা ঢাকার জমিদার রাধামোহন এবং 'পঞ্চমবেদসারনির্ণয়' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীহট্টের জমিদার হরগোবিন্দ রায়ের নাম স্মরণীয়।

বিভিন্ন পুরাণে এবং তন্ত্রে উল্লিখিত তান্ত্রিক পীঠস্থানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বাংলাদেশে বিদ্যমান। খুলনার যশোরেশ্বরী, কাটোয়ার অট্টহাসপীঠ, বহুলাপীঠ, বীরভূমের তারাপীঠ, বক্রেশ্বর পীঠ, কলকাতার কালীঘাট, চট্টগ্রামের দেবী ভবানী, বর্ধমানের যুগাদ্যাপীঠ (দেবী মহামায়া) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামপ্রসাদের সাধনপীঠ হালিসহর, কমলাকান্তের সাধনস্থান বর্ধমানের বোররাট, বামাক্ষেপার সাধনভূমি তারাপীঠ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-মহিমায় বিভূষিত দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থান বাঙ্গালীর তন্ত্র সাধনার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

এইভাবে বিভিন্ন আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তান্ত্রিকধর্মের সঙ্গে বাংলা ও বাঙ্গালীর সম্পর্ক গভীর। সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এই তান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান। বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই তন্ত্র-প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাংলার বিভিন্ন ধর্মমত এবং বিভিন্ন ধর্মমতবাদের মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া ও দর্শনের প্রকাশ

বাংলার বিভিন্ন ধর্মমতের উপর তন্ত্র-প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের উপরেই তন্ত্র গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্প্রদায়ভেদে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার আগমের দ্বারাও আমরা বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করি। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' (৫/৯২/৩) শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, মহাবীর, পাশুপত, বীরবৈষ্ণব, বীরশৈব, চান্দ্র, স্বায়ম্ভুব, একাদশ প্রকার শাবর, একাদশ প্রকার ঘোর, মায়া কাপালিক, বীর, বৌদ্ধ, জৈন, দশপ্রকার চীন, শতপ্রকার বৌদ্ধ, দশপ্রকার পাশুপত এবং আটপ্রকার কৌল আগমের কথা বলা হয়েছে। ভারতের প্রায় সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্রোক্ত ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়।[২৪] এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য, "তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সেই অদ্বৈতবাদ, সেই সোঽহং এবং সাহং একত্র সংযুক্ত হইয়া নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের মূল ভিত্তি রচনা করিয়াছে। ....ভারতখণ্ডের আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণাপথের সর্বত্র ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত যাবতীয় নরনারী জাতি এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিকগুরুর আদেশমত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর ভজন-পূজন করিতেছেন।"[২৫] এ'কথা বাংলাদেশ সম্পর্কেও সত্য। বাংলার বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারার পরিচয়টি সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশ প্রধাণতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রধান। এইজন্য শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখা যায় বাংলাদেশে। বাংলার ধর্মোপাসনার মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শক্তিতত্ত্ব। তন্ত্রের শিব-শক্তিবাদ বা পুরুষ-প্রকৃতির লীলা বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশে শিব-দুর্গা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, উপায়-প্রজ্ঞা, বজ্রসত্ত্ব-বজ্রেশ্বরী এবং রাধা-কৃষ্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। বাংলার সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ই প্রতিটি দেবতার একটি করে শক্তি কল্পনা করেছে এবং দেব-দেবীর বা পুরুষ-প্রকৃতির মিলনাত্মক সাধনাকে গ্রহণ করেছে। বাংলার বৌদ্ধ-সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথ-সম্প্রদায়, অবধূত, বাউল প্রভৃতির মধ্যে এই তন্ত্রোক্ত সাধনার ধারা বিদ্যমান।

বাংলার সহজ-সাধনা তান্ত্রিক মানসিকতাকে আশ্রয় করেই উদ্ভূত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সহজিয়া ধর্ম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা' তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধনায় সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজনীয়তা,

কুলকুণ্ডলিনী-যোগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ-সহজিয়াদের প্রজ্ঞা-উপায় ও 'যুগনদ্ধ' এবং বৈষ্ণব-সহজিয়াদের রাধাকৃষ্ণ ও 'যুগলমিলন' প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রের শিব-শক্তিতত্ত্বেরই প্রতিবিম্বন। তন্ত্রের শিব ও শক্তির সামরস্য-জনিত কেবলানন্দ উপলব্ধিই হচ্ছে বৌদ্ধ-সহজিয়াদের প্রজ্ঞা-উপায় মিলনজাত 'মহাসুখ' এবং বৈষ্ণবেদের রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত মহাভাবের অনুভূতি।

'পাঞ্চরাত্র-আগম' বা তন্ত্রের প্রভাব বৈষ্ণবদের উপর বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।[২৬] বৈষ্ণবেরা সাধারণতঃ 'সনৎকুমারতন্ত্র', 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'শারদাতিলক', 'ক্রমদীপিকা' প্রভৃতির অনুসরণ করেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্মে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের এক অনবদ্য বিকাশ দেখা যায়। শক্তি তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই বাংলার বৈষ্ণবগণের দ্বারা রাধাতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল।[২৭] বৈষ্ণবদের রসতত্ত্ব-সাধনাতেও তন্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান। তন্ত্রের প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সাধনাই বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব-সাধনা মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত। এছাড়া, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ, পুরশ্চরণ, ভূতশুদ্ধি, পীঠন্যাস, মাতৃকন্যাস, যন্ত্রে পূজা, দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ন্যাস ও মুদ্রা, ধ্যান, জপ প্রভৃতি পূজার্চনার বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাধন-পদ্ধতি তন্ত্র-নির্দেশিত পথেই সম্পাদিত হয়।

শৈবসম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ ও সাধন-পদ্ধতি শৈবতন্ত্র ও শৈবাগম অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার নাথধর্মেও তন্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট। নাথধর্মে তন্ত্রের কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ষট্‌চক্র-সাধন, 'অজপা'-জপ প্রভৃতি মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। এ'প্রসঙ্গে ডঃ কল্যাণী মল্লিকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,—"নাথেরা মূলতঃ শৈব এবং নাথেরা শিব ও আদিনাথের উপাসক হলেও নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগতত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। তন্ত্রের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব অনুভূতি-সাধন এবং শক্তিপূজা নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।"[২৮]

বাংলার বাউলধর্মেও আমরা তন্ত্রের গুরুবাদ, পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, ধর্মের অঙ্গরূপে প্রকৃতি-সাধন প্রভৃতির গভীর প্রভাব দেখতে পাই।

বাংলার শাক্ত সম্প্রদায় তন্ত্র-ধর্ম ও তান্ত্রিকাচারের পূর্ণ প্রতিভূ।

এইভাবে দেখা যায় যে, বাংলার প্রায় প্রতিটি ধর্মমতবাদের মধ্যে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া ও দর্শনের প্রভাব কোন না কোনরূপে পড়েছে। এমনকি বাংলার পীর-ফকির, সুফী প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের দেহের মধ্যে পরমাত্মার বাস, আত্মোপলব্ধিমূলক সাধনা ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান-ত্যাগের মধ্যেও তান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অতএব, বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। বাংলা ও বাঙ্গালী চিরদিনই তান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। আজও বাংলার ধর্মে তন্ত্র ও শাক্তসংস্কার প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা; বাঙ্গালীর ধর্মজীবনে দেবী

কালিকার প্রাধান্য অপরিসীম। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলেছেন,—
"......তন্ত্রের বিরাট বিশাল অসংখ্য পুস্তকরাশি দেখিলে ইহা মনে স্থির ধারণা হয় যে, এককালে এই তান্ত্রিক ধর্ম বাংলার জাতীয় ধর্ম ছিল, রাজমান্য এবং রাজার দ্বারা পরিচালিত ধর্ম ছিল। এই সকল তন্ত্রপুস্তকের মধ্যে বাংলার দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস লুকানো আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতি-নীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্রসাগর মন্থন করিতে পারিলে বাংলার বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইতে পারে, বাংলার ইতিহাসের বহু তমসাবৃত কোটরে আলোকমালা ফুটিয়া উঠিতে পারে।"

"............বাঙ্গালীর প্রতিভা যেন দ্বাদশ সূর্যের মত তন্ত্রের পত্রে পত্রে জ্বলিতেছে; যে দেখিতে জানে, সেই দেখিতে পায়—তাহারই জীবন ধন্য হয়।"[২৯]

".......তান্ত্রিক ধর্মই বাংলার ধর্ম, তন্ত্র-সাহিত্যই বাংলার মূল সাহিত্য।"[৩০]

প্রাচীনযুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমরা বাংলার ধর্মে, সংস্কৃতিতে ও গণজীবনে তন্ত্রের যে প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলাম, তার দ্বারাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব নির্ণয় সম্ভব হবে। প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিচিত্র ধর্মীয় উপলব্ধি, চিন্তাধারা ও দর্শনকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সুবৃহৎ পরিমণ্ডলটি রচিত হয়েছিল। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই তন্ত্র প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাব।

পাদটীকা

১। উপেন্দ্রনাথ দাস, 'শাস্ত্রমূলক ভারতের শক্তিসাধনা' বিশ্বভারতী ১৩৭৩, ১৪০২।

২। গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 'তান্ত্রিকভাবধারা ও বাংলা', মাসিক বসুমতী (আশ্বিন-কার্ত্তিক), ১৩৭৯; পৃঃ ৭১৪।

৩। গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৭১৪।

৪। John Marshall, 'Mohenjo Daro and Indus Civilisation', London, 1931 ; Preface pages V-VIJI.

৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ ১৮২।

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৩ সাল; পৃ ১৪৩।

৭। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ১৮৭।

৯। কল্যাণী মল্লিক, 'নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী', কলকাতা, ১৯৫০; পৃ ১৫২।

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ২০৫।

১১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তন্ত্রের ঐতিহাসিকমূল্য', প্রবাহিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

১২। J.N. Sarkar, 'History of Bengal', Vol. II Dhaka University, Page 121।

১৩। বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ।

১৪। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাংলা', কলকাতা, বাং ১৩৩০ সাল; পৃ ২৫৩।

১৫। S.K. Dey, 'Introduction to...... 'পদ্যাবলী' (রূপগোস্বামী) Dhaka University, Page-VIII।

১৬। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার তন্ত্র', প্রবাহিনী, বৈশাখ, ১৩২২।

১৭। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ২০৭।

১৮। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য', প্রবাহিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

১৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৭; পৃঃ ১৩-১৪।

২০। অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত, 'রামমোহন রচনাবলী', হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩; পৃঃ ৭৪, ১৫৫, ২৫০, ২৬৪, ৩৩৮, ৩৪২।

২১। Chintaharan Chakraborty, 'Tantras, Studies on their Religion and Litirature', Kolkata, 1972; Page-66।

২২। Chintaharan Chakraborty, Ibid, Page, 67।

২৩। Chintaharan Chakraborty, ibid; Chakpter II and IV।

২৪। D.C. Sarkar edited 'Religious Life In India' (Upendranath Thakur, 'Tantric Cult in Eastern India), Calcutta University, 1972 ; Pages 112-114.

২৫। 'হিমাদ্রি' (মাসিক), জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০।

২৬। গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৩৩।

২৭। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য', কলকাতা, ১৩৬৭; পৃঃ ১৪৭।

২৮। কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ১৬৪।

২৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য', প্রবাহিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

৩০। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলার তন্ত্র', প্রবাহিনী, বৈশাখ, ১৩২২।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও তন্ত্র

প্রাচীনযুগের বাংলার জাতীয় মানস ও তন্ত্র ঃ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বাংলায় তন্ত্র-প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সুপ্রাচীন কাল থেকে তান্ত্রিক ভাবধারা এবং শাক্ত-সংস্কার কিরূপে বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও গণমানসকে প্রভাবিত করে চলেছে, তার একটা রূপচিত্র আমরা পেয়েছি। এবার বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাচীনযুগের বাংলার জাতীয় মানসের সঙ্গে তান্ত্রিক চিন্তাধারার সম্পর্কটি আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। এখানে বাংলার প্রাচীনযুগ বলতে আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের রচনা কালটিকেই ধরব। চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধরা যেতে পারে। চর্যাপদের এই রচনাকাল বাংলার পাল ও সেনরাজত্ব-কালের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, পাল ও সেনরাজত্বের সময়ে বাংলার জাতীয় মানসের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্কটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি যে, তন্ত্র-ধর্মের প্রতি প্রবণতা বাঙ্গালীর মজ্জাগত সংস্কার। পাল-আমলে বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। তন্ত্র-ধর্ম এই সময়ে বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর জনসাধারণকেই প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাল-বংশের রাজত্বকালে তন্ত্র-প্রভাবেই বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে। কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান—এই তিন যান-সমন্বিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাংলার ধর্মীয় পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। পালযুগের উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি যেসমস্ত দেবদেবীর যুগলমূর্তিগুলি পাওয়া যায়, তা' তান্ত্রিক মানসিকতারই স্মারক এবং ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীমূর্তিগুলি শাক্ত ও তন্ত্রধর্মের সূচক। বস্তুতঃ, পালযুগে শক্তিপূজার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল।[১] সম্ভবতঃ, খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে রচিত[২] 'দেবীপুরাণে' বামাচার অনুসারে রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে দেবীপূজার যে উল্লেখ আছে, তার দ্বারাও এই সময় বাংলায় তন্ত্র-ধর্মের

প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেন আমলে বাংলায় বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও এই সেনযুগেই উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাংলার গণজীবনে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল।

তন্ত্র-প্রভাবিত বজ্রযান, সহজযান, কুলাচার, নাথধর্ম প্রভৃতি প্রাচীনযুগের বাংলার জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই সময় বাংলার জাতীয়-মানসে হিন্দুতান্ত্রিকতা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতা, কৌলমার্গ, নাথপন্থ প্রভৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের আভাসও লক্ষ্য করি। এই সময় সমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত হিন্দুধর্ম এবং নিম্নস্তরে অনুশীলিত কায়াসাধন-প্রণালী উভয়ের মধ্যেই তন্ত্রের বিচিত্র প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, প্রাচীন যুগের বাংলার জাতীয় মানসকে তন্ত্রধর্ম ও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, শক্তি-মাহাত্ম্য প্রভৃতি প্রাচীনকালেই বাংলার গণজীবন ও জাতীয় মানসে গভীর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাই, তান্ত্রিক ভাবধারাকে বক্ষে ধারণ ক'রেই বাংলা সাহিত্যের যাত্রারম্ভ ঘটেছে।

প্রাচীনযুগের সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদ' ঃ

বাংলা ১৩২৩ সালে (ইং ১৯১৬ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা"—এই নামে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরোজবজ্রের (সরহপাদের) 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব' এই তিনখানি পুঁথি একত্র সম্পাদিত ক'রে প্রকাশ করেন। এর মধ্যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'ই একমাত্র বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ; সাধারণতঃ 'চর্যাপদ' নামেই বাংলা সাহিত্যে এর পরিচয়। এই চর্যাপদেই আমরা তন্ত্র-প্রভাব নিরূপণ করব। চর্যাকারগণ সকলেই সিদ্ধ বা মহাসিদ্ধ নামে খ্যাত। তিব্বতী বৌদ্ধমতে "গ্রুব-ছেন-গ্যাবশি" বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধ। মিথিলার জ্যোতিরীশ্বর কবি শেখরাচার্যের (খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক) 'বর্ণরত্নাকরে'ও "অথ চৌরাশি সিদ্ধ বর্ণনা" প্রসঙ্গে 'চউরাশী সিদ্ধা'র স্বীকার করা হয়েছে। এই ৮৪জন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে আমরা চর্যাপদে লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকু, সরহ, বিরূপা, ডোম্বী প্রভৃতি ২৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাচ্ছি। সাধারণভাবে এই সিদ্ধাচার্যদেরকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার অন্তর্গত সহজপন্থার সাধক বলা হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা সহজযান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অদ্বয় মহাসুখের উপলব্ধিই সহজযানের পরমলক্ষ্য। এই মহাসুখলাভের জন্য সহজযানীরা তন্ত্র-নির্দেশিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক চর্যা বা সাধন-প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। সিদ্ধাচার্যদের সাধন-পদ্ধতিতে তন্ত্রোক্ত সাধনার বিচিত্রদিকগুলি

পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সিদ্ধাচার্যদের জীবনী আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, এঁরা তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।[৩] তন্ত্রের-পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্ব, ভাণ্ডের (দেহের) মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধির প্রয়াস, ধর্মসাধনায় শক্তির প্রয়োজনীয়তা, কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ প্রভৃতি ছিল সিদ্ধাচার্যদের সাধনা-রীতির অঙ্গীভূত। সরহপাদ ও কাহ্নপাদের পদগুলি আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এঁরা তান্ত্রিক যোগসাধনার সাহায্যে মোহমুক্ত হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব ও তন্ত্র

[চর্যপদে বর্ণিত মহাসুখ, করুণা, শূন্যতা, চণ্ডালী, ডোমনী প্রভৃতির উপর তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীযোগ প্রভৃতির প্রভাব।]

চর্যাপদে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের যে ধর্মমত প্রকাশিত হয়েছে, তার মূলে, রূপ ও প্রকৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। চর্যাকারগণকে বৌদ্ধতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বৌদ্ধমতবাদের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে চর্যাপদে। চর্যার ধর্মতত্ত্বে তান্ত্রিক দেহতত্ত্ব, তান্ত্রিক যোগপ্রক্রিয়া ও সাধন-পদ্ধতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। চর্যার রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদেরকে যদিও সাধারণভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান শাখার সহজপন্থার সাধক বলা হয়েছে, তৎসত্ত্বেও মনে রাখা উচিত যে, চর্যাপদে সহজযান, মন্ত্রযান কিংবা কালচক্রযান কোন একটা যান বা পথের কথাই প্রধান নয় ;সমস্ত যানের কথাই চর্যাগীতিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, চর্যাপদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মমতবাদের মহাযানীশাখার বিভিন্ন বিবর্তিতরূপের একটা সম্বন্ধ রয়েছে এবং বিভিন্ন যান বা সাধন-পদ্ধতির সমন্বয়ের প্রতি সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মমত আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা আলোচনা করব যে, তন্ত্রমতকে আশ্রয় ক'রে কিভাবে চর্যার ধর্মমত গড়ে উঠেছে এবং তথাকথিত বৌদ্ধসহজিয়া মতবাদের অন্তরাল থেকে কিরূপে তন্ত্রোক্ত তত্ত্ব ও তথ্য পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক্ গুরুবাদের কথা। বিভিন্ন চর্যাপদে পুনঃ পুনঃ গুরুর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হয়েছে ;যেমন—

(১) "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।" (চর্যা—১নং)

(২) "বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি।" (চর্যা—৮নং)

(৩) "সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।" (চর্যা—১২নং)

(৪) "কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।" (চর্যা—৩৮ নং)

(৫) "বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিবঅ।
কাহ্নু ভণই তরু পুণ ন উইজঅ।।" (চর্যা—৪৫ নং)

এইরূপে চর্যাপদে বিভিন্ন স্থানে সিদ্ধাচার্যগণ গুরুর মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন। গুরুবাদ বৌদ্ধসহজিয়া সাধকদের ধর্মের মূলকথা। তাঁদের পুনঃ পুনঃ সতর্কবাণী,—তাঁদের এই সাধনমার্গ স্বকীয় প্রচেষ্টায় দুর্জ্ঞেয় ও আয়ত্তের অতীত ;এ অতিশয় গুপ্ত। গুরুর সাহায্য ব্যতীত কোনক্রমেই এ' সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবলমাত্র গুরুর সহায়তাই এই সাধনপথে অগ্রসরের মূল অবলম্বন। চর্যাপদের ধর্মতত্ত্বের এই গুরুবাদ মূলতঃ তন্ত্র-প্রভাবই সূচিত করে। সিদ্ধাচার্যদের ধর্মরহস্য তন্ত্রের মতই গুরুমুখী বিদ্যা। তন্ত্রশাস্ত্রেই গুরুর অখণ্ড প্রাধান্য সর্বাধিক কীর্তিত। তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন সাধন-রহস্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে গুরুর প্রত্যক্ষ সাহচর্যই চরম ও পরম আশ্রয়। তন্ত্রে বার বার বলা হয়েছে যে, গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের মর্মোদঘাটন সম্ভব নয়। এ' সম্পর্কে 'ভৈরবডামরে' উক্ত হয়েছে যে,—

"তন্ত্রার্থ শাস্ত্রব্যুৎপত্ত্যাজ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ পুমান্।
স এবান্ধো বিজানীয়াদূলুক ইব ভাস্করং।।"[৪]

অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিত যদি তাঁর সেই ব্যুৎপত্তির বলে তন্ত্রশাস্ত্রের তাৎপর্য অবগত হতে ইচ্ছা করেন, তা' হলে পেঁচা যেমন সূর্যের প্রতিমূর্তি অবগত আছে, সেইরকম সে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে অন্ধ হয়েই থাকবে। গুরুপদেশ ভিন্ন তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা নাই। এজন্যই বলা হয়েছে,—"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন্।"[৫] অর্থাৎ যার প্রতি শিব রুষ্ট হন, তাকে গুরুদেব ত্রাণ করতে পারেন, কিন্তু যার প্রতি গুরু কুপিত হন, তার নিস্তারকর্তা আর কেউ নাই। সুপ্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রে এই যে গুরুমাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়ে আসছে, তাই পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে ও সাধনপদ্ধতিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্ত্রের গুহ্যসাধনার বিশিষ্ট দিকগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই বাংলার সিদ্ধাচার্যরা গুরুকে সর্বোচ্চ আসন দান করে নিজেদের নিগূঢ় সাধনরহস্যের সঙ্গীতগুলি রচনা ক'রে গিয়েছেন। তন্ত্রের গূঢ় ও সূক্ষ্ম যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি চর্যাকারগণের সাধনার মূল অবলম্বন ছিল বলেই চর্যাপদে গুরুবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে।

তন্ত্রের প্রধান কথাই হচ্ছে,—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃসন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে ;"[৬] অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান আছে, সে সমস্ত দেহের মধ্যেই রয়েছে।

মানবদেহেই সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরুপর্বত, নদনদীসমূহ, সমুদ্র সকল, পর্বতসমূহ, গ্রহনক্ষত্র, পুণ্যতীর্থসকল, সর্বদেবদেবী প্রভৃতির অধিষ্ঠান।[৭] 'শিবসংহিতা'য় (২।৪) বলা হয়েছে যে,—

> "ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।
> মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে।।"

অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য যে ভাবে আছে, দেহের মধ্যেও সেই সমস্ত দ্রব্য মেরু (মেরুদণ্ড) অবলম্বনপূর্বক নিজের নিজের কাজ নির্বাহ করছে। তান্ত্রিকগণ দেহের মধ্যেই সর্বদেবতার ও সর্বলোকের চিন্তা করেছেন। মানবদেহে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে মহাশক্তি এবং মস্তকে সহস্রারপদ্মে পরমশিব বিরাজ করছেন।

> "মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।"[৮]

তাই, তান্ত্রিক সাধক সাধনার বলে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের মধ্যেই শিব-শক্তির মিলন ঘটিয়ে পরমামুক্তি লাভ করেন। তন্ত্রের এই দেহভিত্তিক সাধন-পদ্ধতি ও যৌগিক প্রক্রিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথযোগী, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, সুফী প্রভৃতি প্রায় সর্বধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

তন্ত্রের পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনারও প্রধান কথা। বৌদ্ধতান্ত্রিকরাও দেহকেই সাধনার একমাত্র অবলম্বনরূপে গণ্য করেছে। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রও দেহের মধ্যেই নদ-নদী, তীর্থ প্রভৃতির এবং পরমতত্ত্বের অবস্থান চিন্তা করেছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 'হেবজ্রতন্ত্র' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দেহব্যতীত সাধনার চরম লক্ষ্য মহাসুখোপলব্ধি সম্ভব নয়।[৯] বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায় দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্ব ও সত্যের উপলব্ধি করেছেন। বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধকগণ যে হঠযোগ অবলম্বনে 'কায়সিদ্ধি' বা 'কায়াসাধন' করতেন, সেই হঠযোগ হচ্ছে তন্ত্র-সাধনার অন্তর্গত। তাই, তন্ত্রের দেহবাদী সাধন-পদ্ধতি 'বৌদ্ধগান ও দোহায়' সিদ্ধাচার্যদের কণ্ঠে শতধারে উদ্গীত হয়ে উঠেছে। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ বলছেন,—

> "ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
> পই দেক্‌খই পরিবেসী পুচ্ছই।।"[১০]

"পরমতত্ত্ব ঘরেই আছে, কিন্তু তুমি তার জন্য বাইরে জিজ্ঞাসা করছ। তোমার প্রিয় বা স্বামীকে ভিতরেই দেখছ, অথচ সে কোথায় আছে, তা' প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করছ।" 'দোহাকোষে' বিভিন্ন স্থানে এই দেহ-মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে,—

(১) "অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো।
জো তাহি জানই সো তহি মুক্কো।।"[১১]

—অশরীরী কেউ শরীরে লুকিয়ে আছে, যে তা' জানে, সেই মুক্তি লাভ করে।

(২) "দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ন জানই।"[১২]

—(পণ্ডিতেরা) জানে না যে, দেহেই বুদ্ধ বাস করে।

(৩) "এখুসে সুরসরি জমুনা এখুসে গঙ্গা-সাঅরু।
এখুসে পআগ বণারসি এখুসে চন্দদিবাঅরু।।
খেত্ত পীঠ উপপীঠ এখু মইঁ ভমই পরিট্‌ঠও।
দেহাসরিসঅ তিত্থ মইঁ সুহ অন্ন ন দীট্‌ঠও।।"[১৩]

—"এখানে (এই দেহের মধ্যে) গঙ্গা ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর, এখানেই প্রয়াগ ও বারাণসী, এখানেই চন্দ্র ও সূর্য, এখানেই নানা তীর্থক্ষেত্র, পীঠ ও উপপীঠ, দেহসদৃশ তীর্থ ও সুখভূমি আমি আর কোথাও দেখি না।" 'কুব্জিকাতন্ত্র', 'তোড়লতন্ত্র', 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী', 'শিবসংহিতা', 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রভৃতি বিভিন্নতন্ত্রগ্রন্থে দেহমধ্যে বিভিন্ন তীর্থ ও পীঠাদি অবস্থানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রে এই দেহকেন্দ্রিক সুকঠিন সাধন-প্রক্রিয়াই বিচিত্ররূপে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চর্যাপদেও এই দেহবাদী সাধনার কথা কীর্তিত হয়েছে। চর্যার সিদ্ধাচার্যরা যে মহাসুখের অনুসন্ধান করেছেন, তা' দেহের মধ্যেই লভ্য। মহাসুখের আঙ্গিনা বা স্থান যে দেহরূপ গৃহের নিকটে অর্থাৎ মস্তকস্থ উষ্ণীষকমলে, সেকথা চর্যাকার প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,—'আঙ্গন ঘরপণ সুন তো বিআতী' (চর্যা—২)। কাহ্নপাদ নিজদেহেই করুণা ও শূন্যের মিলন ঘটিয়ে মহাসুখ লাভ করেছেন,—

'নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী।' (চর্যা—১৩)

দেহরূপ নৌকা বেয়ে সমস্তরকম মায়াজালকে ছেদনের কথা বলা হয়েছে নিম্নোক্ত অংশে,—

'পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মায়াজাল।' (চর্যা—১৩)

দারিকপাদ বলছেন,—

'সুণকরুণরি অভিনচারে কাঅবাকচিএ।
বিলসই দারিক গঅণত পরিমকুলেঁ।।' (চর্যা—৩৪)

অর্থাৎ পরিশুদ্ধকায়বাকচিত্তে শূন্য ও করুণার অভিন্নমিলনে সিদ্ধাচার্য দারিকপাদ মহাসুখে নিমগ্ন।

আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, পাণ্ডিত্যাদিরও আবশ্যক নাই। বোধি বা পরমার্থজ্ঞান নিকটেই দেহের মধ্যে আছে। নিজের মনে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারলেই মুক্ত হওয়া যায়। তাই সরহপাদ বলছেন,—

'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহিমা জাহুরে লাঙ্ক।।
হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
আপনে অপা বুঝত নিঅমণ।।' (চর্যা-৩২নং)

দেহরূপ নৌকা বাহিআ ভবসাগর অতিক্রমণের আকুল আহ্বান চর্যাকারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে,—

'কাঅ ণাবড়ি খান্টি মন কেড়ুআল।
সদগুরু বঅনে ধর পতবাল।।
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই।।' (চর্যা-৩৮নং)

কাআরূপ নৌকা, মন বৈঠা, সদগুরু বচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির ক'রে ধররে নৌকা, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না।

এইভাবে দেখা যায় যে, সিদ্ধাচার্যরা দেহকেই প্রধান সাধনপীঠ করেছেন। সিদ্ধাচার্যগণ পরিশুদ্ধ দেহের মধ্যেই তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ করেছেন। চর্যাপদে বর্ণিত সিদ্ধাচার্যদের এই দেহ-কেন্দ্রিক সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত যৌগিক-প্রক্রিয়া বা সাধন-পদ্ধতিই প্রতিফলিত হয়েছে।

অদ্বয় মহাসুখের উপলব্ধিই সহজযানের পরমলক্ষ্য। তাই, চর্যার ধর্মতত্ত্বের প্রধান কথাই হল মহাসুখ-রূপ নির্বাণলাভ। মহাসুখলাভের আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধাচার্যদের বাণীতে বিভিন্ন চর্যায় শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

(১) 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।' (চর্যা-১ নং)

(২) 'বাম দাহিণ চাপী মিলিমিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।' (চর্যা-৮ নং)

(৩) 'ভুসুকু ভণই এই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ।।' (চর্যা-২৭নং)

এই মহাসুখলাভের জন্য চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যরা যে সাধনপথের কথা বলেছেন, তার উপর তন্ত্রোক্ত যোগ-সাধন-পদ্ধতি এবং তান্ত্রিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব রয়েছে।

তন্ত্রসাধনার প্রধান লক্ষ্য,—জীবের শিবত্ব লাভ। জীব অজ্ঞান ও অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই, জীব আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞান। মায়ার প্রভাবে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নার জীব জন্মজন্মান্তর ধ'রে বিষয়ের মোহে আবর্তিত হচ্ছে। অতএব, জীবকে শিবত্ব লাভ করতে হলে ঘৃণা-লজ্জাদি অষ্টপাশ এবং সমস্তরকমের বিষয়-মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে।[১৪] সাধনার বলে পশুভাব থেকে দিব্যভাবে উপনীত হলেই সাধক অখণ্ড আনন্দ ও পরমামুক্তি লাভ করবে।

(১) "আদৌ ভাবং পশোকৃত্বা পশ্চাৎ কুর্মাদাবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমং।
তদপশ্চাদতি সৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলং।।"
—৬ পটল, রুদ্রযামল।

(২) "দিব্যভাবে মহাসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকোত্তমঃ।।"
—১১ পটল, রুদ্রযামল।

কিন্তু, মুক্তি বা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য জীবকে পরমাশক্তি জগজ্জননীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।[১৫] পরমব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় চৈতন্যমাত্র ;পরমাপ্রকৃতি বা আদ্যাশক্তির সহযোগেই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। শক্তি ব্যতীত শিব শবমাত্র।[১৬] শক্তিই তন্ত্রে জগজ্জননী, মহামায়া, মহবিদ্যারূপে স্তুত হয়েছেন। তান্ত্রিক মুক্তিলাভের জন্য এই পরমাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ, ইনিই মানবকে অবিদ্যা বা মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। আবার, এঁর কৃপালাভেই মানুষ অবিদ্যার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞানলাভ করে।[১৭] শিব-শক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধিতেই মানবের মুক্তিলাভ। মানবদেহের মধ্যেই শিব-শক্তির নিবাস। মানবদেহে মেরুদণ্ডের অধোভাগে মূলাধারচক্রে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত ক'রে মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই সাধক আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং অখণ্ড আনন্দের অধিকারী হন।

তন্ত্রের এই সাধন-পদ্ধতি বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি শাখাকে কিরূপে প্রভাবিত করেছিল, তা' আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। চর্যার ধর্মতত্ত্বের মধ্যেও তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তিতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীযোগ, দেহমধ্যে বিভিন্ন চক্র-পরিকল্পনা, সর্বসংস্কারমুক্তি প্রভৃতির ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চর্যাপদে বিভিন্ন স্থানে শূন্যতা ও করুণা, বজ্র ও কমলের মিলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে; যেমন,—

(১) 'তিশরণ নাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী।।' (চর্যা—১৩)

(২) 'সুনকরুণরি অভিনচারে কাঅবাক্‌চিএ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ।।' (চর্যা—৩৪)

(৩) 'কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।
সমতাজোত্রঁ জ্বলিঅ চণ্ডালী।।' (চর্যা—৪৭)

চর্যাপদে বর্ণিত এই শূন্যতা ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায় এবং বজ্র ও কমলের মিলনের মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির ভাবকল্পনাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।[১৮] তান্ত্রিকসাধক যেমন সাধনার বলে শুদ্ধদেহে শিব ও শক্তির মিলন ঘটিয়ে অখণ্ড আনন্দ লাভ করেন, তেমনই চর্যার সিদ্ধাচার্যগণ পরিশুদ্ধকায়বাক্‌চিত্তে শূন্য ও করুণার অভিন্নরূপ মিলনে মহাসুখ-প্রাপ্তির কথা বলেছেন। স্বীয় দেহে প্রজ্ঞা ও উপায়রূপ কমল ও কুলিশের মিলনে যুগলরূপ সহজানন্দ-মহাসুখ লাভের কথা বলা হয়েছে ৩৪ নং চর্যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব-শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ ও সামরস্য এবং সিদ্ধাচার্যদের যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দ এই তত্ত্বের দ্যোতক।[১৯]

চর্যাপদে বর্ণিত নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, মাতঙ্গী প্রভৃতি নানারূপে অভিহিতা দেবীর সঙ্গে তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে।[১৯] তন্ত্রসাধনার মুখ্য কথা কুলকুণ্ডলিনীর সাধন। মহাশক্তি স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ভিন্ন সাধকের মোক্ষলাভ হয় না। এ'সম্পর্কে তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে,—

"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী সা যাবন্নিদ্রাতি হে প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধেত মন্ত্রতন্ত্রার্চণাদিকং।।
জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদাপ্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চনানি চ।।"[২০]

তাই, তান্ত্রিকসাধক সিদ্ধিলাভের জন্য দেহের সর্বনিম্ন চক্র মূলাধারে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করবার সাধনা করেন। তারপর সাধকের সাধনার প্রভাবে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যখন দেহমধ্যস্থ একটির পর একটি চক্রভেদ ক'রে উঠতে থাকেন, তখন সাধক বিচিত্র আনন্দানুভূতির স্পন্দন লাভ করেন এবং মস্তকে সহস্রার কমলে কুলকুণ্ডলিনী পরম শিবের সঙ্গে মিলিত হলে সাধক সমাধিস্থ হন। এই শিব-শক্তির সম্মিলনেই তান্ত্রিক সাধক আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে পরম নির্বাণ লাভ করেন।

চর্যাপদেও আমরা তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ন্যায় নৈরাত্মা, ডোম্বী, মাতঙ্গী প্রভৃতি নামে অভিহিতা একটি শক্তির পরিকল্পনা দেখি। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মতই এই শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুভূতির আরম্ভ এবং মস্তকে উষ্ণীষ কমলে উপস্থিত হলে সহজানন্দ লাভ হয় ;—এই সহজানন্দই হচ্ছে চর্যাপদে বর্ণিত মহাসুখ। যথা,—

(১) সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই। (চর্যা-২৮)

(২) আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।। (চর্যা-১০)

(৩) গঙ্গা জউনা মাঝেরেঁ বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই।। (চর্যা-১৪)

(৪) কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।
সমতাজোত্রঁ জলিঅ চণ্ডালী।। (চর্যা-৪৭)

চর্যাপদে বর্ণিত এই দেবী বা শক্তির সঙ্গে আমরা তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনী শক্তির ঐক্য নির্ধারণ করব।

৪নং চর্যায় গুণ্ডড়ীপাদ বলছেন,—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।।
খেপ হুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ।।

তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ভিন্ন সাধকের মোহ বা অজ্ঞান দূর হয় না। তান্ত্রিক সাধক নিজেকে শিবস্বরূপ জ্ঞান ক'রে মূলাধারস্থিত সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করবার জন্য আকুল হন। কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সাধকের চিত্ত বিষয়ের মোহ থেকে মুক্ত না হলে কুণ্ডলিনীশক্তি কখনই জাগ্রত হন না। ৪নং চর্যায়ও

আমরা এই তন্ত্রোক্ত ভাবনার প্রতিফলন দেখি। নৈরাত্মার সঙ্গলাভে সাধকের উদগ্র বাসনা, তিনি নৈরাত্মা ব্যতীত এক মুহূর্তও জীবনধারণে ইচ্ছুক নন। নৈরাত্মালাভের তীব্র আকুলতায় বোধিচিত্ত মোহলিপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে না এবং বোধিচিত্ত মোহলিপ্ত অবস্থায় থাকলে নৈরাত্মালাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হয় না। তাই, "মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ" (মণিকুল বেয়ে ঊর্দ্ধস্থানে প্রবেশ করে), অর্থাৎ বোধিচিত্ত আনন্দরস অনুভব ক'রে মণিকুল (তন্ত্রের মূলাধার চক্রই মণিকুলরূপে কল্পিত[২১]) থেকে ঊর্দ্ধ দিকে গমন করতে করতে মহাসুখচক্রে অন্তর্হিত হয়। মূলাধারচক্রে কুলকুণ্ডলিনীর সুপ্তাবস্থায় জীবাত্মার মোহমুগ্ধ অবস্থার ন্যায় এখানে বোধিচিত্তের মোহলিপ্ত অবস্থা কল্পিত হয়েছে। তন্ত্রসাধনায় কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হলে যে অমৃতরস ক্ষরিত হয়, তার দ্বারা সাধক আপ্লুত হন। শিবশক্তির এই মিলনই তান্ত্রিক সাধকের একমাত্র কাম্য।[২২] এখানেও চর্যাকার নৈরাত্মার সঙ্গে মিলনে উষ্ণীষকমলস্থিত পরমার্থ-মধুপানের আকাঙ্ক্ষা করছেন ; যথা,—"তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।"

নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গলাভে সাধক কিরূপে সংসারভীতি থেকে রক্ষা পায়, ৬নং চর্যায় সুন্দর ভাবে তা' বর্ণিত হয়েছে।

> হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
> এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো।।
> তরঙ্গেতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
> ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসই।।

অর্থাৎ হরিণী হরিণকে বলছে,—ও হরিণ তুই শোন তো,—এই বন ছেড়ে তুই ভ্রান্ত হ' (বনান্তরে চলে যা)। তরঙ্গে (হরিণের দ্রুতগতিতে) হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলছেন যে,—মূঢ়ের হৃদয়ে (এই তত্ত্ব) প্রবেশ করে না।

এখানে মানবের চঞ্চল চিত্তকে হরিণের সঙ্গে এবং নৈরাত্মাদেবীকে হরিণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মায়া মোহাচ্ছন্ন চঞ্চল চিত্তরূপ হরিণকে যখন মৃত্যুরূপী বা কালরূপী শিকারী বধ করবার জন্য চেষ্টা করেছিল, তখন সাধক নৈরাত্মার আশ্রয়েই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। অবিদ্যা বিমোহিত মানবাত্মা যখন আত্মমুক্তির জন্য নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গ লাভে ব্যাকুল হয়, তখন নৈরাত্মাদেবী তাকে মুক্তির যে পথ নির্দেশ করেন,—তা' হচ্ছে মহাসুখকমলবন—এখানেই মানবাত্মার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পরমামুক্তি। কুণ্ডলিনীশক্তি যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন,[২৩] নৈরাত্মাদেবীকেও তেমনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না। তন্ত্রোক্ত সাধনায় মুমুক্ষু জীবাত্মার কুলকুণ্ডলিনী শক্তির আশ্রয়ে সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য-সংযোগে মুক্তিলাভের বিষয়ই এখানে নৈরাত্মাদেবীর নির্দেশের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

"এ বনচ্ছাড়ী হোহু ভান্তো"—এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে এই যে, শারীরিক বা পার্থিব সর্বপ্রকার মোহ পরিত্যাগ ক'রে মহাসুখকমলবনে বিচরণ কর। তন্ত্রোক্ত সহস্রারপদ্মই হচ্ছে মহাসুখকমলবন।[২৪] তন্ত্রের শিব-শক্তিযোগের বিষয়টি কাহ্নপাদের একটি পদে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ;যথা,—

কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা ।
সহজ নলিনীবনে পইসি নিবিতা ।।
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ।। (চর্যা-৯)

এখানে কাহ্নপাদের আসবমত্ত হয়ে বিলাস এবং সহজ নলিনীবনে প্রবেশের দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক তাৎপর্যই পরিস্ফুট। তন্ত্রসাধক মূলাধার থেকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ক'রে সহস্রার মহাপদ্মে আনয়ন করলে শিব-শক্তিসামরস্যে যে অমৃতরস ক্ষরিত হয়, তার দ্বারা সাধক আপ্লুত হয়ে যান। তন্ত্রে পঞ্চ-মকার-তত্ত্বে এই অমৃতরসকেই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অর্থে মদ্য বলা হচ্ছে,—

(১) 'সোমধারা ক্ষরেদ্ যস্তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ো যস্তাং স এব মদ্যসাধকঃ।।'
—'আগমসার'।[২৫]

[হে বরাননে। ব্রহ্মরন্ধ্রেঅর্থাৎ সহস্রার থেকে যে অমৃতধারাক্ষরণ হয়, তা' পান ক'রে যে ব্যক্তি আনন্দিত হন, তাঁকেই মদ্য-সাধক বলা যায়।]

(২) 'পরমে কুণ্ডলীযোগাৎ সম্ভবেদমৃতঞ্চ যৎ।
তৎপান নিরতো যোগী কথিতা মদ্য সাধকঃ।।[২৬]

[শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলকর্ণিকা মধ্যে যে পরমশিব আছেন, তাঁর সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি সংযুক্ত হলে যে কুলামৃত স্রাবিত হয়, তার নাম মদ্য, যোগীব্যক্তি তা-ই পান ক'রে থাকেন।]

কাহ্নপাদের চর্যার উদ্ধৃতাংশের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। হস্তিনীর সঙ্গহেতু যেমন হস্তী মদস্রাবী হয়, তেমনই নৈরাত্মার সান্নিধ্যে তিনি তথতামদ বর্ষণ করছেন। তিনি আসবমত্ত হয়ে বিলাস করেন,—এই আসব প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক মদ্য এবং সহজ নলিনী বনে প্রবেশ ক'রে নিবৃত্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে মস্তকস্থিত সহস্রার মহাপদ্মে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি সমাযোগে নির্বিকল্পত্ব-লাভই সূচিত হচ্ছে।

তান্ত্রিক সাধনায় দেহমধ্যে চক্র-কল্পনার এবং কুণ্ডলিনী-শক্তির আশ্রয়ে সিদ্ধিলাভের কথা কাহ্নপাদের নিম্নোক্তচর্যায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।
আলো ডোম্বি তোত্র সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।" (চর্যা-১০)

তন্ত্রশাস্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়েছে এবং দেহমধ্যস্থিত ষট্‌চক্রভেদ ক'রে মহাশক্তি স্বরূপিণী এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তির আশ্রয়েই তান্ত্রিক সাধক সংসারের সর্ববন্ধনাতীত হয়ে অখণ্ড আনন্দ বা নির্বাণ লাভ করেন। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কৃপালাভ করতে হলে সাধককে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে সাধনা করতে হয়, কেবল পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা এটা সম্ভব নয়। কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপা নৈরাত্মাদেবীই এখানে ডোম্বী নামে অভিহিতা হয়েছেন ;—কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নন। ইনি ইন্দ্রিয়ের অস্পৃশ্যা বলেই ডোম্বী।[২৭] ইনি অতীন্দ্রিয় বলেই দেহরূপ নগরের বাইরে এই ডোম্বীর কুঁড়েঘর। 'ব্রাহ্মণ নাড়িয়ার' দল এঁকে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য ও শুষ্ক আচারের দ্বারা ইনি লভ্য নন। এইজন্যই চর্যাকার বলছেন যে, তিনি ঘৃণা-লজ্জাদি বর্জন ক'রে অর্থাৎ সর্বআচার নির্মুক্ত হয়ে নৈরাত্মাকে লাভের জন্য কাপালিক হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করছেন যে, চৌষট্টি পাপড়ীযুক্ত একটি পদ্মের উপরে তিনি ডোম্বী বা নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে নৃত্য করছেন। দেহমধ্যে চৌষট্টি দলযুক্ত এই পদ্মটি 'নির্মাণচক্র' নামে অভিহিত। হিন্দুতন্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্র তিনটি মিলিয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রথম চক্র বা কায় 'নির্মাণচক্র' বা 'নির্মাণকায়' নামে অভিহিত হয়েছে।[২৮] হিন্দুতন্ত্রের মণিপুর চক্রের ন্যায় নির্মাণচক্রের স্থানও নাভিতে।

তন্ত্রশাস্ত্রে কুলকুণ্ডলিনী যোগক্রিয়ায় দেখা যায় যে, কুণ্ডলিনী জাগরণের সময় মণিপুর চক্রে অগ্নিমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। চর্যাপদেও দেখা যায় যে, নৈরাত্মাদেবী নাভিদেশে নির্মাণচক্রে (হিন্দুতন্ত্রের মণিপুরচক্রে) প্রথম জাগ্রত হলে সহসা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁর প্রচণ্ড দাহন—এজন্যই এই দেবীকে বলা হয়েছে 'চণ্ডালী'।[২৯]

"কমল - কুলিশ - মাঝে ভইঅ মিঅলী।
সমতা জোএঁ জ্বলিঅ চণ্ডালী।।" (চর্যা-৪৭)

কুণ্ডলিনী শক্তি যেমন দেহমধ্যস্থ প্রত্যেকটি চক্রের সমস্ত তত্ত্ব, বীজ ও শক্তিকে গ্রাস ক'রে উর্ধ্বগমন করেন, এই চণ্ডালীও তেমনই নির্মাণকায়ে প্রজ্বলিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করেন। 'হেবজ্রতন্ত্রে' বলা হয়েছে যে,—

"চণ্ডালী জ্বলিত নাভৌ দহতি পঞ্চতথাগতান্।
দহতি চ লোচনাদীনি দগ্ধে হুংস্রবতে শশী।।"[৩০]

অর্থাৎ চণ্ডালী নাভি-প্রদেশে প্রজ্বলিত হয়ে পঞ্চস্কন্ধের অধিপতি পঞ্চতথাগতকে এবং চক্রস্থ শক্তিলোচনাকে দগ্ধ করেন। যখন সমস্ত দগ্ধ হয়ে যায়, তখন বোধিচিত্তরূপী চন্দ্র 'হুং'-কারাত্মক বজ্রজ্ঞান বর্ষণ করেন।

তন্ত্রে পরমাপ্রকৃতি মহাশক্তিকে বন্ধন ও মোক্ষ উভয়েরই কারণ বলা হয়েছে। মহাশক্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে জীবের মুক্তি ও বন্ধনের হেতু।[৩১] এ'সম্পর্কে চণ্ডীতে বলা হয়েছে ;—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।"
—'মার্কণ্ডেয়চণ্ডী'—১।৫২।

এই মহাদেবী বা মহাশক্তিই জীবদেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অধিষ্ঠান ক'রে একদিকে যেমন জীবকে অবিদ্যা বা মায়ার বন্ধনে রেখেছেন, অপরদিকে তেমনই তিনি আবার মহাবিদ্যা ও নির্বাণকারিণী।

চর্যাপদেও আমরা নৈরাত্মাদেবী বা ডোম্বীর মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত এই শক্তিতত্ত্বেরই প্রতিফলন দেখি। কাহ্নপাদ বলছেন,—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী।।
তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ।।
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজনলোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই।। (চর্যা-১৮)

কাহ্নুপাদ সহজানন্দরূপ মহাসুখে উপনীত হয়ে নৈরাত্মাদেবীর যে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তা-ই এখানে বলা হয়েছে। এখানে নৈরাত্মাদেবীকে 'ডোম্বী' আখ্যায় অভিহিত ক'রে তাঁর দ্বিবিধরূপের কথা বলা হয়েছে। একদিকে ডোম্বী অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা

অবিদ্যারূপে বাহ্যজগতের রূপাদি বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া করেন এবং অপরদিকে পরিশুদ্ধাবধূতিকরূপে ডোম্বী বা নৈরাত্মাদেবী কাপালিকদের অর্থাৎ সর্বভাবসমতাযুক্ত-মহাসুখলীন ব্যক্তিদের অন্তরে বাস করেন। দুষ্টা স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনি এই দুইরূপে বদ্ধ ও মুক্ত দুই রকম ব্যক্তিদের নিয়ে ক্রীড়া করেন। আবার, পরিশুদ্ধাবধূতিকারূপে ইনি সাধককে মুক্তি দান করেন। তাই, সংসারবদ্ধ ব্যক্তিগণ এঁকে কটূক্তি প্রয়োগ করলেও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা এঁকে পরিত্যাগ করেন না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা বা ডোম্বীর সঙ্গলাভেই মহাসুখ লাভ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন একই মহাশক্তিকে বিদ্যা ও অবিদ্যা, বন্ধন ও মুক্তির হেতুভূতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, চর্যাপদেও তেমনই নৈরাত্মদেবীর পরিশুদ্ধাবধূতিকা ও অপরিশুদ্ধাবধূতিকা—এই দুইরূপ বা ভাবের কথা বলা হয়েছে।

নৈরাত্মাদেবীর দ্বিবিধরূপের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে পরবর্তী পদে (১১ নং চর্যা) কাহ্নুপাদ বিবাহের রূপকছলে বর্ণনা করেছেন যে, কিরূপে তিনি অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীর প্রভাব অতিক্রম ক'রে পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। অবিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধাবধূতিকা-রূপিণী ডোম্বী বা নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গলাভে জ্ঞানের উদয় হয়। তাই কাহ্নুপাদ বলছেন,—

ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণই ন ছাড়অ সহজ উন্মত্ত।। (চর্যা-১৯)

এই নৈরাত্মাদেবীকে 'মাতঙ্গী' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা,—

গঙ্গা জাউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই।। (চর্যা-১৪)

তন্ত্রশাস্ত্রে ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা বা পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনা নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩২] এখানে গঙ্গা ও যমুনার দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী এবং মধ্যবর্তী পথ অবধূতী-মার্গ অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। অবধূতীমার্গের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে 'অবধূতী', 'ডোম্বী', 'নৈরাত্মা', 'মাতঙ্গী' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়েছে। অবধূতীমার্গই মহাসুখ-সঙ্গমে যাওয়ার প্রধান পথ। তন্ত্রোক্ত যোগসাধনার ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী সুষুম্নাবর্ত্মে কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের কথাই এখানে পরিস্ফুট। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে গমন ক'রে সহস্রারে উপনীত হয়ে যেমন সাধককে পরমার্থসিদ্ধি দান করেন, তেমনই 'মাতঙ্গী' বা নৈরাত্মাদেবী (কুলকুণ্ডলিনীশক্তির নামান্তর) অবধূতীমার্গ বেয়ে মস্তকস্থ মহাসুখ-কলমবনে গমন ক'রে যোগীকে সংসার-সাগর থেকে উত্তীর্ণ

করেন। এখানে নৈরাত্মাদেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি লক্ষণীয়। তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা হচ্ছেন মাতঙ্গী।

২৮ নং চর্যায় নৈরাত্মাদেবীকে 'শবরী' নামে এবং সাধককে 'শবর'-রূপে অভিহিত করা হয়েছে। যথা,—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।।

—এই পদটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পদে সাধকের দেহকে সুমেরু পর্বতের এবং মস্তককে তার শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩৩] শবরের অর্থাৎ সাধকের মস্তকস্থিত মহাসুখচক্রে শবরের গৃহিণী অর্থাৎ শবরী বাস করেন। তন্ত্রোক্ত সহস্রারপদ্মই এখানে মহাসুখচক্র রূপে বর্ণিত এবং তান্ত্রিকসাধক যেমন স্বয়ং শিবস্বরূপ হয়ে দেহমধ্যে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির মিলন ঘটিয়ে পরমানন্দ লাভ করেন, তেমনই শবর শবরীরূপিণী নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসুখ লাভ করেন। তন্ত্র-সাধনার কুলকুণ্ডলিনীযোগ ও শিব-শক্তিতত্ত্বই সিদ্ধাচার্যদের সাধনায় নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তন্ত্রের নাড়ীচক্র এবং যোগতত্ত্বের কথাও চর্যাপদ বর্ণিত হয়েছে। নাড়ীশক্তি অর্থাৎ বত্রিশটি নাড়ীর মধ্যে প্রধান নাড়ীকে অবলম্বন ক'রে কাহ্নপাদ যে বিশেষ যোগাচারে প্রবেশ করেছেন, তা' নিম্নোক্ত পদে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে।।
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ-নঅরী বিহরই একাকারে।। (চর্যা-১১)

সিদ্ধাচার্যদের সাধনায় ললনা ও রসনার মধ্যবর্তী অবধূতীই হচ্ছে প্রধান নাড়ী।[৩৪] এই অবধূতী প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্না নাড়ী। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মূলাধারচক্রে সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে উর্দ্ধে উত্থিত ক'রে সহস্রারে বিলীন করার ন্যায় অবধূতীকে (অবধূতী মার্গের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি ডোম্বী, নৈরাত্মা, অবধূতী

প্রভৃতি নামে অভিহিত) মণিকুল (তন্ত্রোক্ত মূলাধার চক্র) থেকে উত্থিত ক'রে উষ্ণীষকমলে লীন করার কথা বর্ণিত হয়েছে কাহ্নপাদের উক্ত চর্যাগীতিতে (১১নং চর্যা)।

১৩ নং চর্যার 'মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ' বাক্যের 'মাঝ বেণী' অর্থে ললনা ও রসনার (তন্ত্রশাস্ত্রের ইড়া ও পিঙ্গলার) মধ্যবর্তী অবধূতী নাড়ী অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত সুষুম্না নাড়ীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত দেহস্থ নাড়ীতত্ত্ব ও চক্রভেদ চর্যার ধর্মতত্ত্বেরও বিষয়বস্তু। বস্তুতঃ, চর্যার সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনা তান্ত্রিক যোগসাধনারই পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর উক্তি প্রণিধানযোগ্য,—"চর্যাগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, ইহার বহু পূর্বেই এদেশে তন্ত্র ও যোগের প্রথা প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। এইরূপে যে শিক্ষা এখানে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল, বৌদ্ধসহজিয়ামতের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া তাহাই এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইজন্যই ইড়াপিঙ্গলার পরিবর্তে ললনা-রসনা প্রভৃতি নামকরণ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাচীন মতবাদেরই বিশিষ্ট অভিব্যক্তিমাত্র।"[৩৫]

এইরূপে বিভিন্ন আলোচনার দ্বারা দেখা যায় যে, চর্যাপদে বর্ণিত চণ্ডালী বা ডোমনী, নৈরাত্মাদেবী, করুণা ও শূন্যতাযোগে মহাসুখলাভ প্রভৃতিতে তন্ত্র-সাধনার অঙ্গীভূত দেহতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ ও কুলকুণ্ডলিনীযোগের প্রভাব সমুজ্জ্বল।

চর্যাপদ-সাহিত্যের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ঃ

চর্যাপদ-সাহিত্যের সামগ্রিক পরিমণ্ডলেও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। চর্যার সিদ্ধাচার্যদের ভাবনা ও সাধনার লক্ষ্য তন্ত্রোক্ত সাধনতত্ত্বেরই প্রতিবিম্বন। তন্ত্র-সাধনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মোহাচ্ছন্ন জীবের সর্ববিধ বিষয়-বাসনার ক্ষয় এবং অবিদ্যার বিনাশ সাধন ক'রে জীবকে শিবত্বে বা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্যই তন্ত্রে মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্বক আত্মাতে যোজনা করতে বলা হয়েছে।[৩৬] তন্ত্রের অন্তর্যাগ বা মানসপূজার তাৎপর্য হচ্ছে সর্ববিধ মায়া-মোহ ত্যাগ ও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন ক'রে শিব-শক্তি মিলনানন্দে আপ্লুত হওয়া। তান্ত্রিক সাধক অবিদ্যানাশেই মোক্ষ লাভ করেন। মহাসুখলাভের জন্য চর্যাকারগণও বিষয়ের মোহত্যাগ, সকল বাসনার নিবৃত্তি ও অবিদ্যা-নাশের কথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন। ১নং চর্যায় লুইপাদ বলছেন,—

কাআ তরবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।।

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।

এর মর্মার্থ হচ্ছে,—যে চঞ্চলচিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল, সেই চঞ্চল চিত্তকে জয় করতে পারলেই মহাসুখ লাভ হয়। বিষয়ের উপলব্ধি থেকে মুক্ত হলেই মহাসুখ লাভ হয়। বিষয়ের সঙ্গে মনের যোগসাধন করে ইন্দ্রিয়গণ। কাজেই মনের জন্যই বিষয়ের অনুভূতি হয়। সুতরাং মনের লয় হলেই বিষয়েরও লোপ হবে।

৩১নং চর্যাতেও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে,—

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো নঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা।।

অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে পবনের ন্যায় চঞ্চল ইন্দ্রিয় এবং মনের কার্যলোপ পায় ব'লে চিত্ত কোথায় বিলীন হয়ে যায়, তা' বলা যায় না। বিষয়জ্ঞান দূরীভূত হ'লে দুঃখের কারণও বিনষ্ট হয় এবং পরিণামে মহাসুখের উৎপত্তি হয়,—এ'কথাই এই চর্যায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এখানে মহাসুখের স্বরূপে নির্বাণাবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।

৮নং চর্যায় কম্বলাম্বরপাদ বলছেন,—

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।

অর্থাৎ বামদক্ষিণ বা গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ আভাস দুইটি ছেড়ে মধ্যবর্তী বিরমানন্দ বা নির্বাণপথের সঙ্গে যুক্ত থেকে অগ্রসর হ'লে মহাসুখ সঙ্গমে পৌছান যায়। এই চর্যায় আভাস-দোষরূপ খুঁটিগুলিকে উৎপাটিত ক'রে অবিদ্যাসূত্র-রূপ কাছি খুলে ফেলতে বলা হয়েছে এবং গুরুর প্রসাদে চিত্তকে পরিপূর্ণ ক'রে মহাসুখের উদ্দেশ্যে যাত্রার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সর্ববিধ বিষয়াসক্তি-ত্যাগ এবং চিত্তস্থৈর্যই যে মহাসুখলাভের প্রধান উপায়, তা' সরহপাদের ভাষায় সুন্দর কাব্যরূপ লাভ করেছে; যথা,—

কাঅ নাবড়ি খান্টি মণ কেডুআল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল।।
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই।। (চর্যা-৩৮)

অর্থাৎ কায়ারূপ নৌকা, মন বৈঠা ; সদগুরুবচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির ক'রে ধর রে নৌকা, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না।

তন্ত্রশাস্ত্রেও পরমার্থসিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই বিষয়সমূহে বিচরণ করছে। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গণের বলপূর্বক আকর্ষণকে তন্ত্রের যোগসাধনায় প্রত্যাহার বলা হয়েছে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ষড়ঙ্গযোগ মূলতঃ হিন্দুতন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। তান্ত্রিক যোগের প্রধান কথাই হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে শিব-শক্তির মিলন-সাধন দ্বারা পরমানন্দ-লাভ। চর্যার সিদ্ধাচার্যগণও শূন্যতা-করুণার মিলন-সাধনে মহাসুখলাভের জন্য সমস্তরকম চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভুসুকুপাদের একটি চর্যায় এই কথাটি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে ;—

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা।।
মাররে জৌইআ, মুসা-পবনা।
জেন তুটঅ অবনা-গবনা। (চর্যা-২১নং)

চিত্ত-চাঞ্চল্য বিদূরীত হলেই যে ভববন্ধনের লোপ হয়, সেকথাই এখানে বলা হয়েছে। চঞ্চলচিত্তকে চঞ্চলমুষিকের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয়েছে যে, রাত্রিকালে মুষিক যেমন ইতঃস্তত বিচরণ ক'রে মিষ্টদ্রব্য আহার ক'রে বিনষ্ট করে, তেমনই চঞ্চলচিত্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিষয়ের মধ্যে বিচরণ ক'রে মহাসুখামৃত বিনষ্ট করে। বাসনা-চঞ্চল চিত্তের জন্যই মানুষকে বার বার সংসার-চক্রে যাতায়াত করতে হয়। এজন্যই সংসার-বন্ধন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যোগীর পক্ষে সদা চঞ্চল চিত্তরূপ মুষিককে বধ করা উচিত। তাই ভুসুকুপাদ বলছেন যে,—

জবেঁ মুসাএর আচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বন্ধন ফিটঅ।। (চর্যা-২১নং)

অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হলেই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত যোগসাধনার বিষয়-বাসনার ক্ষয় এবং ইন্দ্রিয়াদি দমনের কথা কাহ্নপাদের উক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল বাহা।।
বরগুরু বঅণ কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুন ন উইজঅ।। (চর্যা-৪৫)

এখানে মনকে তরু, পঞ্চেন্দ্রিয়কে তার শাখা, বাসনাসমূহকে তার পত্র ও ফলরূপে তুলনা করা হয়েছে। সদগুরুর বচনরূপ কুঠারে মন-তরুকে এমনভাবে ছেদন করতে হবে যেন পুনরায় না জন্মায়।

এই চিত্ত স্থৈর্য বা আত্ম-সমাধির জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ বা প্রাণায়াম অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। প্রাণায়ামের রেচক, পুরক ও কুম্ভকের বিষয় চর্যাগীতিতেও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। নীচে কয়েকটি পদের অংশ উদ্ধৃত হল।

১নং চর্যায় লুইপাদ বলছেন,—

ভণই লুই আম্‌হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ[৩৭] বেণি পিণ্ডি বইঠা।।

[বলে লুই আমি (শূন্যতাকে) ধ্যানে দেখলাম, পূরক-রেচকরূপ দুই পিঁড়িতে উপবিষ্ট।]

কুক্কুরীপাদের একটি পদে উক্ত হয়েছে,—

রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই। (চর্যা-২ নং)
[গাছের তেতুঁল কুম্ভীরে খায়।]

গাছের তেঁতুল অর্থাৎ শরীরের তেতুঁলের ন্যায় বাঁকা মন। কুমীর অর্থাৎ কুম্ভক সমাধি। অতএব, এর তাৎপর্য এই যে, কুম্ভক দ্বারা মনের লয় হয়।

৪নং চর্যায় গুণ্ডরীপাদ বলছেন,—

সাসু ঘরে খালি কোঞ্চা তাল।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল।।

এর মর্মার্থ হচ্ছে,—শ্বাসের ঘর রুদ্ধ ক'রে অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা রেচক-পূরক দুই খণ্ডন কর। এখানে 'চান্দ-সুজ' বা চন্দ্র-সূর্য অর্থে প্রাণায়ামের রেচক ও পূরক।[৩৮] তন্ত্রেও রেচক-পূরককে চন্দ্র-সূর্য বলা হয়েছে। প্রাণায়ামের রেচক ও পূরক যে দুই নাড়ীর দ্বারা সংসাধিত হয়, সেই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দুইটিকে চন্দ্র-সূর্যরূপিণী বলা হয়েছে; যথা— "ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী", এবং "দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুং রূপা সূর্যবিগ্রহা।"[৩৯] প্রাণায়াম-সাধনা চর্যার সিদ্ধাচার্যদের সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রে মুক্তিলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য সর্বপ্রথম চিত্তকে সর্বমোহ ও মায়ামুক্ত করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রসাধনার মূল বক্তব্য হচ্ছে,—পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। তন্ত্রোক্ত সাধনা-সিদ্ধির পথে সাধককে অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হতে হয়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি,—এই আটটি পাশ বা বন্ধন থেকে

মুক্ত হলে মানুষ শিবত্ব লাভ করে বা আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে 'কুলার্ণবতন্ত্রে'র (১৩।৯০) উক্তিটি উল্লেখযোগ্য ;—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।।"

চর্যাপদেও বিভিন্ন স্থানে পরমজ্ঞান ও মুক্তির জন্য মায়া-মোহের বিনাশ ও সর্বসংস্কার-মুক্তির কথা বলা হয়েছে।[৪০] চর্যাকার আর্যদেব বলছেন যে,—

ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর।।
আজদেঁবে সঅল বিহরিউ।
ভয় ঘিণ দূর নিবারিউ।। (চর্যা-৩১)

অর্থাৎ ভয়ঘৃণাদি সমস্ত লোকাচার আর্যদেব পরিত্যাগ করেছেন এবং গুরোপদিষ্ট পথে দেখতে পাচ্ছেন যে, সমস্ত ভাবগুলি অস্তিত্ববিহীন। ভয়-ঘৃণাদি সমস্ত বিদূরীত হওয়ায় তিনি সংসারের সকল দোষকে বিফল করেছেন অর্থাৎ সর্ববন্ধনহীন হয়ে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।

মহাসুখলাভের জন্য চর্যাপদে সর্বআচার ও সংস্কারমুক্তির যে জয়গান করা হয়েছে, তাতেও তন্ত্রের সর্বশেষ কথাই ধ্বনিত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মুক্তির বিষয়ে আত্মজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নয়। বিভিন্ন পূজার্চনা, অনুষ্ঠান ও সাধন-পদ্ধতি সমস্ত এই জ্ঞানোদয়ের জন্য, জ্ঞানোদয় না হলে এই সকল সাধনার দ্বারা স্বর্গাদি সুখভোগ হতে পারে ; কিন্তু মোক্ষরূপ অখণ্ড শান্তিলাভ হয় না। এ সম্পর্কে 'মহানির্বাণতন্ত্রে' (১৪।১১১, ১১৫, ১১৯) বলা হয়েছে,—

"কুর্বাণঃ সততং কর্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি।।

* * *

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ।।

* * *

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্বাদি-মূর্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষংন যান্তি তে।।"

অর্থাৎ যে পর্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্যন্ত জীব শত শত কষ্ট স্বীকারপূর্বক নিয়ত কর্মানুষ্ঠান ক'রেও মুক্তিলাভ করতে পারে না। জপ করলে মুক্তি হয় না, হোম করলে মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস করলেও মুক্তি হয় না। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান জন্মালেই দেহী মুক্ত হয়। যারা মৃত্তিকা-নির্মিত, প্রস্তর-নির্মিত, ধাতু-নির্মিত বা কাষ্ঠাদি নির্মিত মূর্তিকে ঈশ্বরবোধে তপস্যাদি করে, তারা কেবল বৃথা কষ্ট পায়। চর্যাপদেও এই তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। দারিকপাদ বলছেন,—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবাখানে।
অপইঠানমহাসুহলীলেঁদুলক্‌খ পরম নিবাণে।। (চর্যা-৩৪ নং)

অর্থাৎ মন্ত্র, তন্ত্র ও ধ্যানব্যাখ্যানের দ্বারা মহাসুখ লাভ করা যায় না এবং মহাসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে পরম নির্বাণ লাভ করা যায় না।

কর্মবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি না পেলে যে মুক্তি সম্ভব নয়, সরহপাদের কণ্ঠে সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে,—

যে সচরাচর তিসঅ ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি।। (চর্যা-২২ নং)

অর্থাৎ যাগযজ্ঞমন্ত্রাদির দ্বারা যারা স্বর্গে গমন করে, তারা অজরামর হতে পারে না, কারণ ভোগাবসানে তাদেরকে পুনরায় সংসারে আসতে হয়।

শুভ বা অশুভ সমস্তপ্রকার কর্মই বন্ধনের কারণ। এ' সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।।
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ।।"

—'মহানির্বাণতন্ত্র' (১৪।১০৯-১১০)।

অর্থাৎ শুভ বা অশুভ কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত শতকল্পেও মানুষের মোক্ষলাভ হয় না। যেমন লোকে লৌহময় শৃঙ্খলই হোক অথবা স্বর্ণময় শৃঙ্খলই হোক উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বদ্ধ হয়, সেইরকম জীবগণ শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম দ্বারাই বদ্ধ হয়ে থাকে।

তন্ত্রের এই বাণী চর্যাপদে অপূর্ব বাঙ্‌ময় রূপলাভ করেছে,—

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সহজানন্দ লাভ হলে সাধকের নিকট আত্মপর ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাব বা দৃশ্যাদির আদৌ উৎপত্তি হয় নি—এই বোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে জন্ম-মৃত্যুর কল্পনাও থাকে না। এই পৃথিবীতে কিছু আসেও না, যায়ও না, ভাবাভাব কিছুই নাই।

পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জগতের উৎপত্তি-ধ্বংসের অন্তর্নিহিত মহাসত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ক'রে জন্ম-মৃত্যুতে নির্বিকার থাকেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, এই পৃথিবীতে কিছু আসেও না এবং এখান থেকে কিছু যায়ও না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ভববিকল্প ছিন্ন ক'রে এক অদ্বয় মহাসত্যে উপনীত হন। তাই কাহ্নুপাদ বলছেন,—

জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা।। (চর্যা-৭)

কাহ্নপাদ অন্যত্র বলছেন,—

ভব জাই ন আবই এথু কোই। (চর্যা-৪২)

ভবে কিছু আসেও না এবং এখানে থেকে কিছু চলেও যায় না।

কুক্কুরীপাদের একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে যে,—

ভণথি কুক্কুরী পা এ ভব থিরা।
জো এথু বুঝই সো এথু বীরা।। (চর্যা-২০)

অর্থাৎ এই ভব স্থির, এখানে কিছু আসেও না এবং এখান থেকে কিছু যায়ও না। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই 'বীর'। এখান 'বীর' শব্দটি লক্ষণীয়। তান্ত্রিক সাধনায় তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে ; যথা—পশু, বীর ও দিব্য।[৪৩] এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকই পশুতুল্য, কিন্তু জ্ঞানোদয় হলেই 'বীর' পদবাচ্য হয় ; যথা,—

"সর্বে চ পশবঃ সন্তি তলবদ্ ভূতলে নরা।
তেষাং জ্ঞান প্রকাশায় বীরভাব প্রকাশিতঃ।।"[৪৪]

এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকই পশুতুল্য, তাদের যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখনই তাদেরকে 'বীর' বলা যায়। বীরভাবের তান্ত্রিক সাধককে জিতেন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী ও নির্বিকার হয়ে সাধন-পথে অগ্রসর হতে হয়। সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকাই তান্ত্রিক বীরসাধকের প্রধানভাব। জগতের উৎপত্তি-বিনাশ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয় বলেই 'বীর' সাধক সর্বক্ষেত্রেই নির্বিকার থাকেন। কুক্কুরীপাদের উদ্ধৃত পদেও

এইরূপ নির্বিকার চিত্তাবস্থাসম্পন্ন সাধককেই 'বীর' বলা হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্র অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। চর্যার সিদ্ধাচার্যগণও অদ্বৈতবাদী ছিলেন।[৪৫] চর্যাপদে তাই অদ্বৈতজ্ঞানের কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে ; যেমন,—

(১) অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ। (চর্যা-৫)
অর্থাৎ অদ্বয় কুঠার দ্বারা নির্বাণকে দৃঢ় কর।

(২) অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ। (চর্যা-৪৯)

অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান দ্বারা ক্লেশ ধ্বংস হয়। অদ্বৈতজ্ঞানকে আশ্রয় করেই সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়ে নির্বাণ লাভ হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, অদ্বৈতজ্ঞানই মানবের নির্বাণলাভের একমাত্র উপায়। তন্ত্রের ন্যায় চর্যার ধর্মতত্ত্বেরও সারকথা হচ্ছে অদ্বৈতজ্ঞান। এজন্যই বিভিন্ন চর্যায় বলা হয়েছে যে, অদ্বৈতজ্ঞানভিন্ন মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভ করা যায় না।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' উক্ত হয়েছে যে,—'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং"[৪৬] অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহেই বর্তমান রয়েছে। তান্ত্রিক সাধক দেহমধ্যস্থ ষট্চক্রভেদ ক'রে শিব-শক্তির মিলনে মোক্ষমূল আনন্দ লাভ করেন। চর্যার সিদ্ধাচার্যগণও অনুরূপভাবে দেহমধ্যে শূন্যতা ও করুণার মিলনে মহাসুখ বা সহজানন্দ লাভ করার কথা বিভিন্ন চর্যায় প্রকাশ করেছেন।

পরিশেষে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, আত্মজ্ঞান-লাভ বা আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়াই চর্যাগীতির ধর্মতত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। এই আত্মস্বরূপত্ব লাভের জন্য চর্যাপদে তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়া এবং তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণার কথাই নানাভাবে ও নানাসুরে উদ্গীত হয়েছে।

পাদটীকা

১. P.C. Bagchi, 'Studies in the Tantras', Calcutta University, 1952, Pages 4ff and 102.
২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ: ২০৮।
৩ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৩ ; পৃ: ৫৪-৫৬।
৪. 'ভৈরবডামরতন্ত্র', পূর্বভাগ।
৫. 'কুলার্ণবতন্ত্র', ১২।৪৯।

৬. 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ৬।৪০।

৭. 'তোড়লতন্ত্র', 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'কুব্জিকাতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী 'তান্ত্রিকগুরু', সারস্বতমঠ, আসাম, ১৩২৩, পৃ: ১৫৩।

৯. 'হেবজ্রতন্ত্র', বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, পাণ্ডুলিপি নং ১১৩১৭, পৃ: ৩৫। ক।

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ: ১০৪।

১১. হরপ্রসাদশাস্ত্রী সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ১১৪।

১২. ঐ, ঐ, পৃ: ১০৭।

১৩. ঐ, ঐ, পৃ: ১০০।

১৪. 'কুলার্নবতন্ত্র', প্রথম ও নবম উল্লাস।

১৫. 'নির্বাণতন্ত্র', দশম পটল।

১৬. 'কুব্জিকাতন্ত্র', প্রথম পটল।

১৭. 'মহানির্বাণতন্ত্র', চতুর্থ উল্লাস।

১৮. গোপীনাথ কবিরাজ, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম', উত্তরা (মাসিক) কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল।

১৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৬৭ ;পৃ: ১৩১, ১৩৮-১৩৯।

২০. 'গৌতমীয়তন্ত্র', চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

২১. মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, 'চর্যাপদ'-টীকা, পৃ: ২৩।

২২. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ষষ্ঠ পটল ;'মাতৃকাভেদতন্ত্র', ৩য় ও ১৪শ পটল।

২৩. 'তন্ত্রসার', পৃ: ১৫৬-১৫৭।

২৪. মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা, পৃ: ৪।

২৫. নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, 'সাধনকল্পলতিকা', মধ্যভাগ, কলকাতা, ১৩২১, পৃ. ৮৪।

২৬. নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮৫।

২৭. 'অস্পৃশ্যযোগত্বাৎ ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা।'—মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', টীকা, পৃ: ৫২।

২৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৪৯।

২৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৩৯।

৩০. 'হেবজ্রতন্ত্র', পুঁথি—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, পাণ্ডুলিপি, নং ১১৩১৭—পৃ: ৪ (ক)।

৩১. 'মহানির্বাণতন্ত্র', চতুর্থ উল্লাস।

৩২. 'ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।

তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী।।'

—'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র', শ্লোক সংখ্যা ১১।

৩৩. 'যোগীন্দ্রস্য কায়কঙ্কালদণ্ড সমুন্নতং সুমেরুশিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে'। মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত 'প্রাগুক্ত', টীকা। পৃ: ১৩৮।

৩৪. 'দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা-শক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানাবধূতিকা বিরমানন্দরূপা।'—মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', টীকা, পৃ: ৫৭।

৩৫. মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা-৪।

৩৬. 'ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলং।

বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারো বিধীয়তে।।'

—'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।

৩৭. ধমণ চমণ—প্রাণায়ামের পুরক ও রেচক। দ্রষ্টব্য ঃ—Dr. Muhammad Shahidullah—'Buddhist Mystic Songs', University of Karachi, 1960 ; Page 3 (Note).

৩৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৮।

৩৯. গৌতমীয়তন্ত্র, ৩৪ অধ্যায়।

৪০. ৮নং, ১১নং, ১৫নং, ২৩নং, ৪১নং, ৪৫নং, ৪৬নং চর্যাপদ দ্রষ্টব্য।

৪১. মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১৩৬।

৪২. মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১২৭।

৪৩. রুদ্রযামলতন্ত্র, ৬ পটল।

৪৪. রুদ্রযামলতন্ত্র, ১৫৩ পটল।

৪৫. মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ভূমিকা ....

৪৬. তন্ত্রসার, পৃ: ১০৯০।

চতুর্থ অধ্যায়

নাথসাহিত্য ও তন্ত্র

নাথসাহিত্যের পরিচয় ঃ

নাথধর্ম একসময় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। নাথসম্প্রদায়ের যোগীরা ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিচরণ করতেন এবং এঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মহিমা উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। নাথযোগীদের ধারা ভারতের কানফাটা যোগীদের মধ্যে ও বিভিন্ন অবধূতদের বেশভূষায় ও সাধনায় আজও বিদ্যমান রয়েছে। এই নাথযোগী সম্প্রদায় এবং নাথধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে নাথ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। গোপীচাঁদের গান গেয়ে ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই যোগী সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষার্থী হয়ে পরিভ্রমণ করেন। নাথধর্মাবলম্বীদের সাধনতত্ত্বকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এক বিপুল সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন প্রণালী এবং গুরু-পরম্পরার কাহিনী সম্পর্কে সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বহু পুস্তক রয়েছে।

নাথধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশেই নাথযোগীদের কর্মক্ষেত্র সবিশেষ বিস্তৃতি লাভ করেছিল। নাথধর্মের আদি প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে।[১] গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপা ছিলেন বাংলার রাজা গোপীচাঁদের গুরু। গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা। ময়নামতী, গোপীচাঁদ, গোরক্ষনাথ, মীননাথ সম্পর্কে মর্মস্পর্শী নাথগীতিকাগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গীত হয়। এই নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্যদের কথা বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের সঙ্গে যুক্ত, যদিও নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির রচনাকাল অনেক পরবর্তীকালের। নাথসাহিত্যে বর্ণিত বিষয় ও কাহিনী বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ থেকেই বাঙ্গালীর নিকট সবিশেষ পরিচিত ছিল।

বাংলা সাহিত্যে নাথ সাহিত্যের ধারাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়;— প্রথম ভাগ হচ্ছে মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনী এবং দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে রাজা গোপীচন্দ্র ও রাজমাতা ময়নামতীর আখ্যান। নাথ সাহিত্যের এই দুটি ধারা বা

শাখার পরিচয় কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। নাথসাহিত্যের প্রথম ভাগের কাহিনীতে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক মোহগ্রস্ত গুরু মীননাথের উদ্ধার বা আত্মচৈতন্য-লাভ বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী সাধারণভাবে 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত। নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয়ভাগের কাহিনীর মূল বিষয় হচ্ছে গোরক্ষনাথের শিষ্যা রাণী ময়নামতীর একান্ত প্রচেষ্টায় তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্রের জালন্ধরী পাদ বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব অবলম্বনপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। এই কাহিনী 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র কাহিনী ব্যতীত নাথসাহিত্যের আর একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তা' হচ্ছে নাথধর্ম ও দর্শনবিষয়ক ছড়া। নাথধর্মের ও যোগমার্গের তত্ত্ব, উপদেশ ও দর্শন-সংবলিত বিভিন্ন পদ ও ছড়া পাওয়া যায়।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়' গ্রন্থের পরিশিষ্টে নাথধর্ম ও দর্শনবিষয়ক কিছু কিছু ছড়া ও কবিতার সংগ্রহ আছে। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের সংকলনে চারিটি পুঁথি বা সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়;যথা—'যোগীর গান', 'যুগী কাচ', 'গোর্খ-সংহিতা' ও 'যোগ-চিন্তামণি'। এইগুলিতে নাথধর্মের ও নাথযোগের কায়া-সাধন, বিন্দুধারণ, উল্টাসাধন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

'গোরক্ষবিজয়'-কাহিনীর প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং মৈথিলী ও বজ্রবুলিতে রচিত কিছু পদ এতে রয়েছে।[২]

বাংলা ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে 'গোরক্ষ বিজয়' বা মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নি। তবে এই কাহিনী বহুপূর্ব হতেই বাংলার জনসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের 'অনিলপুরাণে' মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্যামদাস সেন,[৩] শেখ ফয়জুল্লাহ[৪] ও ভীমসেন রায় বা ভীমদাস[৫]—এই তিনজন কবি 'গোরক্ষবিজয়ে'র কবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাংলাদেশে গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কাহিনীটি সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং আজও যুগীসম্প্রদায়ের ভিখারীরা নাথধর্মতত্ত্বের এই আখ্যানটি গান গেয়ে থাকেন। কাব্যাকারে এই কাহিনীর 'মীনচেতন' এবং 'গোরক্ষবিজয়'—এই দুইটি নামই সার্থক। কারণ, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক যোগভ্রষ্ট-আত্মবিস্মৃত গুরু মীননাথের আত্মচৈতন্যলাভ এই কাহিনীর মূল বর্ণনীয় বিষয় হলেও এর মধ্য দিয়ে শিষ্যের জয় অর্থাৎ গোরক্ষনাথের অসাধারণ যোগশক্তির মহিমা ও গৌরবই বিঘোষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় নাথসাহিত্যের ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী-সংবলিত রচনার

নিদর্শন সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া না গেলেও এই কাহিনীটি ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই যে বাংলা ভাষায় গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী 'পদুমাবতে' গোপীচন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনীর সর্বপ্রাচীন বাংলাগ্রন্থ হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীতে নেপালে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক'।[৭] বাংলায় প্রাপ্ত ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের সর্বপ্রাচীন রচনা হচ্ছে কবি দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'[৮] (শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত— ১৩০৮ সাল)। এতে কাহিনীর প্রাচীনত্ব রক্ষিত হয়েছে এবং ধর্মপূজার সঙ্গে যোগী-সিদ্ধদের সাধনার সম্পর্ক দেখান হয়েছে। ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' (নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২১ সাল) এবং সুকুর মামুদের ' গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' (মুন্‌সী গোলাম রসুল খোন্দকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯ সাল) হচ্ছে গোপীচন্দ্র ময়নামতীর আখ্যানের দুইটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯২৪) 'গোপীচন্দ্রের গানে' ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের পুঁথি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

নাথ সাহিত্যের এই ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী একসময় সমগ্র বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং এটি সামান্য পরিবর্তন সহ ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করেছে।

প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদিত 'হাড়মালা'[৯] নামক নাথসম্প্রদায়ের গূঢ় সাধনতত্ত্ব সম্পর্কিত পুস্তকে নাথধর্মতত্ত্বের পরিচয় আছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের "Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature" গ্রন্থের নাথধর্ম আলোচনার পরিশিষ্টে ৪২৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ আছে।

শিলঙের রাজমোহন নাথ মহাশয় এই পুঁথিটির সর্বপ্রথম সন্ধান দেন। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সংগৃহীত 'হাড়মালা'র একটি পুঁথি সম্ভবতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। শিলচরে (আসাম) নর্মাল স্কুলে এর একটা পুঁথি পাওয়া যায়। প্রফুল্লচরণ মহাশয়ের পুঁথিটি ময়মনসিংহ জিলার যশোদল গ্রাম থেকে সংগৃহীত। 'হাড়মালা' গ্রন্থের এই পুঁথিগুলির মধ্যে ভাষাগত সামান্য পার্থক্য ব্যতীত বিশেষ মৌলিক পার্থক্য নাই। সব কয়টি পুঁথিই দ্বিজ শত্রুঘন বা শত্রুগণ (শত্রুঘ্ন) নামক কবির ভণিতাযুক্ত।[১০] 'হাড়মালা' গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ও তত্ত্বকথা প্রাচীনত্বেরই পরিচয়বাহী, কিন্তু ভাষা ও রচনাশৈলীর বিচারে এটি অর্বাচীন কালের।[১১]

গৌরীকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাদেব কর্তৃক অমরত্ব লাভের উপায়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণন, সৃষ্টিতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, নাড়ী ও বায়ুতত্ত্ব, জীবাত্মা, মন প্রভৃতির কার্য, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, চন্দ্রসূর্য মিলন বা শিবশক্তিতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান,

হংসতত্ত্ব, ওঁ-কারতত্ত্ব, নাদ-বিন্দুতত্ত্ব, নাথ-নিরঞ্জনের স্বরূপ প্রভৃতি 'হাড়মালা' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে নাথধর্মসাধনার একটা সামগ্রিক রূপ বর্ণিত হয়েছে।

নাথ সাহিত্যে বর্ণিত ধর্মমত

নাথধর্মতত্ত্ব ও সাধনার মূর্ত প্রতিচ্ছবি হচ্ছে নাথসাহিত্য। নাথধর্মকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যেমন বিরাট সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই বাংলা সাহিত্যেও নাথধর্ম ও দর্শনাশ্রয়ী বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে। বস্তুতঃ, নাথধর্ম ও সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলার এক গভীর সংযোগ স্থাপন করেছে। মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষে নাথধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। তন্ত্র ও হঠযোগের সাধন প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে নাথধর্ম একসময় একটা বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ধর্মরূপে ভারতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় নাথধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' (১ম স্কন্ধ, ৮ম ৯ম অধ্যায়), 'আগম-সংহিতা', 'বৃদ্ধশাতাতপ-সংহিতা', 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়', 'তন্ত্রালোক' প্রভৃতি গ্রন্থে নাথধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদের সমসাময়িককালে নাথধর্ম বাংলায় বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে নাথধর্মের বিকাশের শ্রেষ্ঠযুগ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিপর্যয় ঘটে এবং সর্বশেষে যুগী বা নাথ-উপাধিযুক্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ধর্মের শেষ চিহ্ন বর্তমান রয়েছে।

নাথ সম্প্রাদয়ের আদিগুরু বা আদিনাথ হচ্ছেন শিব। মৎস্যেন্দ্রনাথকে নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা হয়। নাথধর্মাবলম্বীদের একটা বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, এই ধর্ম অনাদিকাল থেকে জগতে বিরাজিত। আদিনাথ বা শিব থেকে নাথধর্মের উদ্ভব এবং কালক্রমে এর প্রভাব ক্ষীণ হলে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ কর্তৃক এই ধর্মের মহিমা পুনরায় প্রচারিত হয়। এইজন্যই নাথধর্মের ইতিহাসে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের স্থান সুউচ্চে।

নাথধর্মে গুরু গোরক্ষনাথের সমধিক প্রাধান্য ও গুরুত্ব থাকার জন্যই নাথধর্মাবলম্বীরা গোরক্ষপন্থী নামেও পরিচিত। গোরক্ষনাথের নেতৃত্বেই নাথধর্ম একসময় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল[১২] এবং গোরক্ষনাথের অলৌকিক ক্ষমতার জন্যই গোরক্ষনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প-কাহিনী প্রচলিত হয়েছে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায়ের গ্রন্থে গোরক্ষনাথের সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে।

নাথধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মত পার্থক্য রয়েছে। নাথসিদ্ধদেরকে অনেকেই 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসী' রূপে চিহ্নিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,[১৩] ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী,[১৪] ডঃ সুশীলকুমার দে[১৫] প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে নাধধর্ম সহজিয়া বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের মতবাদ ও ধর্মসাধনা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, "নাথমহান্তদের ধর্ম বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং নাথগীতিকাগুলিতেও হাড়িপার উপদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে।"[১৬] ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অভিমত,— "নাথপন্থা যে বৌদ্ধ মন্ত্রযান হইতে উদ্ভুত বা প্রভাবান্বিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১৭] কিন্তু ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই সমস্ত অভিমত স্বীকার করেন নি। নাথধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এইরূপ— "But judging from the literary records and the legends and traditions still prevalent among the yogins of the Nath order it appears that the Nāth cult has grown with a general air of Saivism"[১৮] ডঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁর 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শণ ও সাধনপ্রণালী' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ, আচার-ব্যবহার, নাথসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা, প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না। এ'প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখযোগ্য;—"নাথদের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ', তাঁহাদের তীর্থ শৈবতীর্থ, তাঁহারা শিবের ন্যায় কুণ্ডলধারী, তাঁহাদের কণ্ঠে যোনিলিঙ্গের প্রতীক ধারণবিধি, কোটেশ্বর তীর্থ হইতেও তাঁহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসেন এবং নিজেদেরকে শৈব বলিয়া পরিচয় দেন।[১৯]........

"বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত নাথপন্থের অধিক যোগাযোগ আছে, একথা বলা সঙ্গত নহে।..........নাথমতে শিবশক্তির সামরস্য দ্বারা এবং বৌদ্ধসহজিয়ামতে শূন্যতা-করুণার মিলনের দ্বারা চিত্তের সমতা লাভই উদ্দেশ্য। তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চমবেদ, তন্ত্রের আগম শ্রবণ করিয়া মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগধর্ম শিক্ষা ও প্রচার করেন, মৎস্যেন্দ্রনাথ নিজেকে কৌল বলিয়াছেন।..........মৎস্যেন্দ্র-রচিত কৌলগ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্র নাই। মৎস্যেন্দ্র মৎস্য ধরিতেন, সম্ভবতঃ গোরক্ষ পশুহত্যা করিতেন, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা প্রাণী হত্যাকারী হইয়া বৌদ্ধ হইতে পারেন না। গোরক্ষ পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ডঃ মোহন সিং তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।.......বৌদ্ধ সহজিয়া দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপনীত হইবার সাধনা করেন। নাথযোগীরা বলেন, 'দ্বৈতবাদ্বৈতরূপং দ্বয়ং উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা'। এই তত্ত্বাতীত অবস্থা দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে, ইহা দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ অবস্থা, এককথায় 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব' অবস্থা, ইহাই নাথমার্গের পরমপদ। নাথগুরুকে 'নাদকলাত্মনে' বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে, বৌদ্ধসহজিয়া গুরুর 'যুগনদ্ধ' রূপ।"[২০] ...."হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের কোন কোন বিষয়ের ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত যুক্তমার্গ বিশেষ।"[২১]

নাথধর্ম সাধনার দ্বাদশ মুদ্রান্তর্গত বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি নাম সহজযানকে স্মরণ করিয়ে দিলেও নাথধর্মাবলম্বীরা যে বৌদ্ধ ছিলেন বা বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ থেকে নাথধর্মের উৎপত্তি,—এ'কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার সঙ্গে নাথসিদ্ধাদের সাধন-পদ্ধতির কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের কারণ হচ্ছে,—উভয় ধর্মেই তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। তন্ত্রের বিশেষ সাধন-পদ্ধতি বা যৌগিক প্রক্রিয়া বৌদ্ধসহজিয়া ও নাথধর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তবে বৌদ্ধসহজিয়াদের সঙ্গে নাথ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণ নাথসিদ্ধাচার্যদের ন্যায় বিন্দু-স্থৈর্য-সাধনাকে ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ মনে করলেও যৌনমিলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু নাথসিদ্ধাগণ রমণী-সহযোগে সাধনার বিরোধী।[২২] বিন্দুসিদ্ধি উভয়ধর্মের লক্ষ্য হলেও সাধন পদ্ধতি পৃথক;—"এক সম্প্রদায় চঞ্চলতার কারণকে বর্তমান রাখিয়াই তাহার মধ্য হইতে অচঞ্চল অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে—অপর সম্প্রদায় সেই কারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছে।"[২৩]

বস্তুতঃ, নাথধর্ম তন্ত্র ও যোগতত্ত্বের মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র ধর্মরূপে ভারতের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। নাথপন্থীরা বিশিষ্ট যোগমার্গী সম্প্রদায় এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। নাথধর্ম-চেতনা সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমতটি এখানে স্মর্তব্য, —"The Nath cult seems to represent a particular phase of the siddha cult of India. This Siddha Cult of India is a very old religious cult of India its main emphasis on a psychochemical process of yoga, known as the Kaya-Sadhana or the culture of the body with view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life."[২৪] প্রাচীনকালে নাথধর্মীরা 'কৌল' নামেই পরিচিত ছিলেন। এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষার পরে 'নাথ' পদবী যোগ করা হয় বলে এঁরা 'নাথযোগী সম্প্রদায়' রূপে পরিচিত।[২৫] মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, জালন্ধরী পাদ বা হাড়িপা প্রভৃতি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ নাথসিদ্ধাচার্য।

নাথযোগীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবন্মুক্তির সাধনা। দেহের বিনষ্টি বা মৃত্যুর

পরে যে মোক্ষলাভ, তা' নাথযোগীদের কাম্য ছিল না। অশুদ্ধ বা অপরিপক্ক দেহকে যোগের মাধ্যমে পরিপক্ক করে মুক্তাবস্থায় বিচরণ ছিল নাথযোগীদের চরম লক্ষ্য। এই কারণেই তাঁরা তন্ত্র ও হঠযোগের সাহায্যে কায়াসাধনার রীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে আমরা এই জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করি এবং কায়াসাধনার ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি রমণী মোহগ্রস্ত, সাধন-ভ্রষ্ট গুরু মীননাথের আত্মচৈতন্য ঘটিয়ে তাঁকে যোগমার্গে নিয়ে আসেন। 'গোপীচন্দ্রের গানে'ও দেখা যায় যে, রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচাঁদকে এই জীবন্মুক্তি লাভের জন্যই যোগধর্মে দীক্ষিত করেন।

যোগ সাধনার দ্বারা অপরিশুদ্ধ বা অপক্ক দেহকে পক্ক অর্থাৎ সিদ্ধ বা দিব্যদেহে পরিণত করে শিবত্ব বা অমরত্ব লাভই ছিল নাথধর্মাদর্শের প্রধান উদ্দেশ্য।[২৬] নাথমতে কায়াশুদ্ধি না হলে সমস্ত সাধন-ভজন বৃথা। মানুষের দেহ ও মন বিভিন্ন কামনা বাসনার দ্বারা অপরিশুদ্ধ। তাই, সাধনার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কায় ও মনের শুদ্ধি। তন্ত্রশাস্ত্র ও হঠযোগের বিশেষ সাধন পদ্ধতির মাধ্যমেই নাথযোগীগণ এই অশুদ্ধ-স্থূলদেহের পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ ও অমর দেহ লাভ করতেন। এই সিদ্ধদেহ বা যোগাগ্নির দ্বারা পরিশুদ্ধ দেহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধিহীন এবং সূক্ষ্ম ও আনন্দময়। এই রকম সিদ্ধদেহাবলম্বী যোগী ত্রিলোকে বিচরণ ও সিদ্ধলোকে প্রয়াণ করতে পারেন। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় এইরকম শুদ্ধদেহকে 'সূক্ষ্ম', 'লিঙ্গ', 'মহাকারণ', 'নির্মাণচিত্ত' বা 'নির্মাণকায়', 'হংসদেহ', 'প্রণবতনু', 'রসময়ীতনু', 'ভাবতনু', 'শাক্তদেহ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। এই সিদ্ধদেহের দ্বারা অণিমা, লঘিমা, প্রাকাম্য প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিলাভ অর্থাৎ দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, মনের ন্যায় গতিতে যথেচ্ছগমন, ইচ্ছানুরূপ রূপগ্রহণ, পরকায়-প্রবেশ, পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি যোগবিভূতি লাভ হয়। নাথ সাহিত্যের 'গোরক্ষবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি গ্রন্থে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি নাথসিদ্ধাদের এরকম অতিলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সিদ্ধদেহ লাভের জন্যই নাথধর্মমতে 'পবনবিজয়', 'বিন্দুধারণ,' 'উল্টাসাধন'-প্রণালী, 'কুলকুণ্ডলিণীর জাগরণ' প্রভৃতি সাধন-রীতি অবলম্বিত হয়েছে।

মানবদেহের মূল উপাদান হচ্ছে বায়ু ও রস। নাথযোগীরা তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে প্রাণায়াম বা বায়ু সাধনের মাধ্যমে দেহের ক্ষয় নিবারণ করতেন। নাথধর্মের মূল আদর্শ হচ্ছে দেহস্থিত 'মহারসের সংরক্ষণ' বা 'বিন্দুধারণ'। বিন্দু ধারণই জীবন এবং বিন্দুপাত মৃত্যু। বিভিন্ন কারণে মানবদেহের এই বিন্দু (পুরুষের শুক্র ও নারীর রজঃ) ক্ষয় হচ্ছে। প্রাণায়াম, বিভিন্ন মুদ্রাসাধন, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি সাধন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে নাথযোগীরা

বিন্দুকে ঊর্ধ্বমুখী করেন এবং দেহে ধারণ করেন এবং এরই ফলে তাঁরা সিদ্ধদেহ লাভ করেন। বস্তুতঃ, সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্তি এবং দিব্যদেহে পরামুক্তি লাভই নাথধর্মের মূলতত্ত্ব।

নাথধর্মের রূপ-প্রকৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব

নাথধর্মের রূপ-প্রকৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। তন্ত্র ও হঠযোগের সাধন-পদ্ধতি অবলম্বনেই যে নাথধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, তা' বিভিন্ন পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। ডঃ কল্যাণী মল্লিক নাথগণকে 'শৈব' রূপে অভিহিত করে নাথধর্মকে তন্ত্র ও যোগতত্ত্বের মিশ্রণ বলেছেন।[২৭] ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বলেছেন যে, "........হিন্দুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি প্রভাব নাথযোগীদের হঠযোগের মধ্যে আছে স্বীকার করিতে হয়।"[২৮] বস্তুতঃ, নাথধর্মে হঠযোগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' মূলতঃ তন্ত্র সাধনারই অঙ্গ। কারণ, "যাঁহারা হঠযোগের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, হঠযোগের মূলকথাই চন্দ্র ও সূর্যকে একতাবস্থাপন্ন করা। তন্ত্রের সাঙ্কেতিক ভাষায় 'হ'-কার ও 'ঠ'-কার চন্দ্র ও সূর্যের বাচক। সুতরাং 'হ'-কার ও 'ঠ'-কারের সংযোগ বলিতে চন্দ্র-সূর্যের একীকরণ বুঝিতে হইবে। পরিভাষার ভেদে ইহাই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর অথবা অপান ও প্রাণবায়ুর সমীকরণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।"[২৯] হঠযোগদর্শন তন্ত্রের শিব-শক্তিতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নাথসিদ্ধাদের 'কৌল' নামে পরিচিতির[৩০] দ্বারা তন্ত্রের সঙ্গে নাথধর্মের সংযোগ সূচিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সাধককে পশু, বীর ও দিব্য—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে[৩১] এবং দিব্যসাধকই 'কৌল' নামে পরিচিত। কৌলের নিকট ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য কিছুই নাই—সমস্ত কিছুতেই তাঁর সাম্যাবস্থা। বিষদ্বারা বিষক্ষয়ের ন্যায় যে পথ দুর্গম ও পিচ্ছিল, সেই পথ অবলম্বন করে শিবত্ব-প্রাপ্তিই কৌলের লক্ষ্য। 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়'[৩৩] নামক পুঁথির ষোড়শ পটল থেকে জানা যায় যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ 'সিদ্ধ' বা 'সিদ্ধামৃত' কৌলান্তর্গতি যোগিনী কৌল ছিলেন। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি অন্যান্য নাথসিদ্ধাগণও যে কৌলমতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ'বিষয়ে সংশয় নাই।[৩৪] পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত সাধককে তন্ত্রশাস্ত্রে 'কৌল' বলা হয়েছে। 'নিত্যাতন্ত্রে' তৃতীয় পটলে বলা হয়েছে যে,—

> "কর্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
> শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।।
> ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ।।"

পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে-অধিষ্ঠিত কৌলের কাছে কোন ভেদাভেদ নাই, তিনি সমস্ত

নিয়ম ও বন্ধনের ঊর্ধ্বে এবং সর্বভূতে নিজ আত্মাকে এবং নিজ আত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করেন।[৩৫] তন্ত্রের কৌলাচারের এই দিব্যভাবই নাথযোগীদের লক্ষ্য ছিল বলে নাথদেরকে কৌলরূপে অভিহিত করা হয়।

শিবকে নাথযোগীরা ভৈরব, নন্দভৈরব, কালভৈরব প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ও রূপে অর্চনা করেন। ভৈরবমূর্তি তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম উপাস্য দেবতা এবং শৈব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায় কর্তৃকই ইনি পূজিত হন। শাক্তদের একান্নপীঠের অন্যতম মহীপাঠ হিংলাজ নাথযোগীদেরও উপাস্য। তান্ত্রিকসাধকদের পীঠস্থান কামাখ্যা নাথসম্প্রদায়ের মহাপীঠ স্থান। নাথসম্প্রদায়ের অন্তর্গত কানফাটা যোগীগণ অম্বা ও জগদম্বার পূজা করেন। কানফাটাদের মধ্যে যোনি ও লিঙ্গপূজা এবং শ্রীচক্রপূজা প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত আচার ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান। নাথ ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে পশুবলির প্রচলনও দেখা যায়।[৩৬] অতএব, তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে নাথধর্মের একটা ঘনিষ্ট সংযোগ রয়েছে। অবশ্য নাথপন্থীরা শক্তির উপাসক হলেও তন্ত্রোক্ত 'পঞ্চ-মকার'-সাধনের ইঙ্গিত নাথধর্মে নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্বই নাথধর্মের মূলভিত্তি। তন্ত্রমতে শক্তি ও ব্রহ্মের সম্পর্ক অবিনাভাব অর্থাৎ শক্তি বিরহিত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিরহিত শক্তি থাকতে পারেন না। সকল কারণের কারণ পরমব্রহ্ম বা পরমশিব কেবল নিমিত্তমাত্র। পরমব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্বও নাই, কিন্তু চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহের ন্যায় মহাশক্তি বা পরমাপ্রকৃতি পরমব্রহ্মের সত্ত্বামাত্রেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। পরমব্রহ্মের এই মহাশক্তিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে,— "তুমিই রজোগুণ দ্বারা সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী, সত্ত্বগুণ দ্বারা সকলের পালন কর্ত্রী এবং তমোগুণ দ্বারা সকলের সংহারকর্ত্রী।"[৩৭] বস্তুতঃ, শক্তি ব্যতীত শিব শবমাত্র। শিবশক্তি সহযোগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। এই বিষয় 'কুব্জিকাতন্ত্রে'[৩৮] একটি সুন্দর উক্তি আছে,—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টি ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ।।
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ।।
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়।।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্বকার্যাক্ষমী ধ্রুবম্।"

—'কুব্জিকাতন্ত্র', ১/২৫-২৯।

তন্ত্রের এই শিবশক্তিতত্ত্ব নাথধর্মে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিবশক্তির সম্পর্ক বিষয়ে নাথগণ তন্ত্রের অনুরূপ কথাই বলেছেন—

"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।"[৩৯]

শক্তিহীন শিব এবং শিবহীন শক্তি কল্পনা করা যায় না। শিব ও শক্তি অভিন্ন, একই অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব দৃষ্টিভেদে শিব বা শক্তি আখ্যায় অভিহিত। শক্তি সহযোগেই শিব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেছেন। তাই তন্ত্রের মতই নাথধর্মেরও সিদ্ধান্ত,—"শক্তেঃ প্রসর-সঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিঃ সংহৃতী।"[৪০] অর্থাৎ শক্তির প্রসার বা বিকাশরূপ ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি এবং সংকোচনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সংহার বা ধ্বংস।

গোরক্ষনাথকৃত 'সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি' নামক একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে আমরা নাথধর্মের উপর তন্ত্রের প্রভাবের প্রমাণ পাই। কারণ, তন্ত্রের ন্যায়ই নাথধর্মেও যে অদ্বৈতবাদ এবং শক্তির বিকাশ ও সংকোচনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের তত্ত্বটি স্বীকৃত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

তন্ত্রের গুরুবাদ, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, দেহমধ্যে শিব-শক্তির মিলনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ, শক্তিপূজা, তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে দেবতাদের সহায়তায় সিদ্ধিলাভ[৪১] প্রভৃতি নাথধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ। তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি জটিল ও দুরধিগম্য বলেই তন্ত্রসাধনায় গুরুই একমাত্র অবলম্বনীয়। তন্ত্র গুরুমুখী বিদ্যা। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এক সাঙ্কেতিকতা ও রহস্যময়তা। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা এই শাস্ত্রের রহস্যোদঘাটন বা নিজের চেষ্টায় তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।[৪১] গুরুকৃপা বা গুরুবলই তন্ত্র সাধনার পথে একমাত্র পাথেয়। এজন্যই তন্ত্রে গুরুর মাহাত্ম্য সর্বাধিক। ভারতের সমস্ত ধর্মেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও তন্ত্রে গুরুর স্থান এক স্বতন্ত্র মহিমায় বিভূষিত। কারণ, তন্ত্র ক্রিয়ামূলক শাস্ত্র। তন্ত্র-সাধনায় যে নিগূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও যৌগিক প্রক্রিয়া রয়েছে, তাতে গুরুর উপদেশ ও সাহচর্য অপরিহার্য। 'যোগিনীতন্ত্রে' (১/২৩) উক্ত হয়েছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলই গুরু, গুরুই শিব এবং গুরুই পরমব্রহ্ম;যথা,—

"গুরুমূলমিদংশাস্ত্রং গুরুমূলমিদং জগৎ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব শিবঃ স্বয়ং।"

'কুলার্ণবতন্ত্রে' বলা হয়েছে যে,—

(১) "ধ্যানমূলং গুরোমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোপদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা।।"[৪২]

(২) "মনুষ্যাচর্মনাবদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
সচ্ছিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্যটতি ক্ষিতৌ।।"[৪৩]

তন্ত্রে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও পরমব্রহ্মরূপে স্তুতি করা হয়েছে। ইষ্টদেবতা এবং গুরু অভিন্ন, গুরুরূপেই ইষ্ট কৃপা করেন।

তন্ত্রের অনুরূপভাবে নাথধর্মেও গুরু স্তুত হয়েছেন। নাথধর্মেও গুরুই সমস্ত সাধনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলরূপে স্বীকৃত। নাথধর্মে গুরুর মাহাত্ম্য অপরিসীম,—
"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ।'[৪৪]

গুরুই নাথধর্মে একমাত্র পথপ্রদর্শক, গুরুর কৃপা ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি-অর্জন সম্ভব নয়। তন্ত্রের গুহ্য সাধনপদ্ধতি ও জটিল যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহ নাথধর্মে গৃহীত হয়েছিল বলেই নাথধর্মে তন্ত্রোক্ত গুরুবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তন্ত্রের ন্যায় নাথধর্মেও গুরু ও শিব অভিন্ন;—

"নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ।।"[৪৫]

নাথসিদ্ধাদের ধর্মগ্রন্থাদিতে গুরুর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য তন্ত্রানুমোদিত পথেই কীর্তিত হয়েছে। নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ ও কাব্যগুলিতেও এই তন্ত্রোক্ত গুরুতত্ত্ব কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা' আমাদের পরবর্তী আলোচনায় পরিস্ফুট হবে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চর্যাপদের আলোচনার প্রসঙ্গে তন্ত্রের 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' বা 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তন্ত্রসাধনার মূল ভিত্তিই হচ্ছে মানবদেহ। তন্ত্র-সাধক দেহে মধ্যেই শিব-শক্তির মিলন ঘটিয়ে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। তন্ত্রে দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে[৪৬] অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবদেহেই আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী, নদ-নদী-সমুদ্র, পর্বত, গ্রহ-নক্ষত্র, রবি-শশী, চতুর্দশভুবন, সমস্ত পীঠস্থান ও তীর্থ প্রভৃতিব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই রয়েছে।[৪৭] এ'বিষয়ে 'তোড়লতন্ত্রে' (৭/৩১-৩৪) বলা হয়েছে যে,—

"মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং প্রিয়ে।
পূর্ণগিরিং তথা ভাগে উড্ডীয়ানং তদূর্ধ্বকে।।
বারাণসী ভ্রূবোর্মধ্যে জ্বলন্তী লোচনত্রয়ে।
মায়াবতী মুখবৃত্তে কণ্ঠে চাষ্টপুরী তথা।।
নাভিমূলে মহেশানি! অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে।।

মূলাধারাৎ শতং চৈব অতলং পরিকীর্তিতম্।
সুতলঞ্চ বর্ষশতং তলাতলং শতং প্রিয়ে।"

তন্ত্রোক্ত সাধনার অন্তঃস্নান, অন্তঃসন্ধ্যা, মানসপূজা ও অন্তর্যাগের পদ্ধতি আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তান্ত্রিক সাধক দেহমধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ এবং সর্বদেবদেবীর অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। তন্ত্রের ভূতশুদ্ধি-প্রকরণ এই দেহভিত্তিক সাধন-পদ্ধতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নাথধর্মের সাধন-পদ্ধতিরও একমাত্র অবলম্বন মানবদেহ। তন্ত্রের ন্যায় নাথধর্মও দেহ বা পিণ্ডের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য কল্পনা করে পথ-নির্দেশ করেছে। নাথধর্মের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আমরা তন্ত্রের উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনি,—

"ব্রহ্মাণ্ডবর্তি যৎ কিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্বথা।
ইতি নিশ্চয়ে এবাত্র পিণ্ডসংবিভিরুচ্যতে।।[৪৮]

নাথধর্মের 'গোরক্ষসংহিতা', 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', 'গোরক্ষ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের ন্যায় দেহের মধ্যেই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, নদ-নদী-সাগর, বিভিন্ন দেবদেবী প্রভৃতির কল্পনা করা হয়েছে। মানবদেহের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীই তন্ত্র-সাধনার মূল অবলম্বন;নাথধর্মেরও তাই, এবং এই তিনটি নাড়ী সম্পর্কে তান্ত্রিক চিন্তাধারা নাথধর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে' (১১ ও ১২নং শ্লোক) উক্ত হয়েছে,—

"ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী।।
ত্রিবেণী সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত সর্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।"

'গোরক্ষসংহিতা'য় অনুরূপ কথারই প্রতিধ্বনি;—
"গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্ত সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাংগতিম্।।
ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যে সরস্বতী প্রোক্তা তাসাংসঙ্গোঽতি দুর্লভা।"[৪৯]

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেহমধ্যে নাড়ী, চক্র-পদ্ম, কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব এবং পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উপলব্ধিকে অবলম্বন করেই নাথধর্মের যোগসাধনার পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের 'ভূতশুদ্ধি'ই (দেহশোধন) নাথধর্মের কায়াসাধনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।[৫০]

কায়াসিদ্ধি বা জরামৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ-লাভ-নাথধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ। আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ অখণ্ড আধ্যাত্মিক জ্ঞানধারণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলেই সাধক ও যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেহশুদ্ধি বা কায়াসিদ্ধির প্রথা বিদ্যমান। ভারতের হঠযোগী সম্প্রদায়, বজ্রযান, সহজযান, বৈষ্ণবসহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই কারণেই বিবিধ গুহ্য সাধনার প্রক্রিয়া বর্তমান ছিল। নাথধর্মেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যোগের দ্বারা মানুষের অপক্কদেহকে পক্ক করা বা সাধনার দ্বারা স্থূলদেহের দোষসমূহের দূরীকরণ। নাথধর্মের এই সিদ্ধদেহ-লাভের যৌগিক প্রক্রিয়া মূলতঃ তন্ত্রাশ্রয়ী। কারণ, তন্ত্রের দেহমধ্যে শিব-শক্তির মিলনই নাথদের কায়াসাধন। নাথসিদ্ধাচার্যরা দেহমধ্যে শিব-শক্তির মিলনজনিত আনন্দধারায় আপ্লুত হয়েই সিদ্ধদেহ লাভ করতেন।[৫১] তান্ত্রিক সাধনার শিব-শক্তির সামরস্যতত্ত্বই নাথসিদ্ধাদের চন্দ্র-সূর্য-মিলনে সমরস-সাধন ও আস্বাদনের মধ্য দিয়ে প্রকটিত।[৫২] পূর্বে বলেছি যে, বিন্দু ধারণ নাথসিদ্ধাদের কায়াসাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল। নাথযোগীরা প্রাণায়ামাদি সাধনার প্রভাব বিন্দুকে ঊর্ধ্বমুখী করে দেহে ধারণ করে রাখতেন। নাথসিদ্ধাগণ স্বীয় দেহের রসকে সহস্রারস্থিত অমৃতের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেহের ক্ষয় রোধ করেন এবং মিলিত অমৃতপ্রবাহ দ্বারা দেহ ও মন অভিসিঞ্চিত ক'রে অক্ষয় সিদ্ধদেহ লাভ করেন। নাথসিদ্ধাদের এই সাধনা প্রধানতঃ তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। তন্ত্রোক্ত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়, দেহমধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা—এই ষট্‌চক্রের ভেদ এবং মূলাধারস্থিত প্রষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগত করে সহস্রার পদ্মস্থিত পরমশিবের সঙ্গে মিলনকে কেন্দ্র করেই নাথধর্মের যোগসাধনার মূলতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। নাথধর্মতত্ত্বে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই মুখ্য বিষয়। নাথধর্মে এই কুণ্ডলিণী 'পিণ্ডসংসিদ্ধিরূপিনী', পুরুষের নিবৃত্তিরূপিনী এবং শক্তিরূপা। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি মানুষের দেহরক্ষায় সিদ্ধিদাত্রী এবং পুরুষের নিবৃত্তিমার্গের সহায়স্বরূপিনী। নবচক্র-সাধনে[৫৩] নাথগণ কুণ্ডলিনীকে একমাত্র সহায় বলে জানেন। নাথধর্মে বলা হয়েছে যে, কুণ্ডলিনীর জাগরণে সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নির দ্বারা পক্ক হয়।[৫৪] নাথধর্মের 'উল্টাসাধন', 'মহাজ্ঞান'-লাভ, 'খেচরী', মুদ্রা-সাধন, 'যোনিমুদ্রাসাধন' প্রভৃতির উপর তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ'প্রসঙ্গে নাথধর্মে অনুশীলিত যোনিমুদ্রা-সাধন সম্পর্কে আলোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, তন্ত্রের সঙ্গে নাথধর্মের যোগাযোগ কত গভীর। নাথধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গোরক্ষসংহিতা'য় যোনিমুদ্রা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যে,—

"সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণশ্চক্ষুর্ণাসামুখম্।
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভ্যশ্চ সাধয়েৎ।।
কাকীতিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ।
ষট্‌চক্রাণি ক্রমাৎ ধ্যাত্বা হুঁহংসমনুনা সুধীঃ।।
চৈতন্যমানয়েৎ দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী।
জীবেন সহিতাংশক্তিং সমুত্থাপ্য করাম্বুজে।।
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরং শিবেন সঙ্গমং।
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখম্।।
শিবশক্তি সমাযোগাদেকাংন্তং ভূবিভাবয়েৎ।
আনন্দশ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ।।
যোনিমুদ্রা পরাগোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
সকৃত্তু লাভ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থ স এব হি।।"

— 'গোরক্ষসংহিতা', ৮৯-৯৪।

উপরি-উদ্ধৃত অংশের যোনিমুদ্রার বর্ণনার মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক তত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই যোনিমুদ্রা-সাধনে ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং শিব-শক্তি সম্মিলনের দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভই নাথযোগীদের লক্ষ্য। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এই মুদ্রাসাধনে সাধক নিজেকে শক্তিময় ভাবনা করবেন ('শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা.........')। এই বিষয় নাথধর্মাবলম্বীদের অনুসৃত গ্রন্থ 'ঘেরণ্ডসংহিতা'য় অধিকতর স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে,—

"যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গার রসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মানি।।
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতিবাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে।।"

-- 'ঘেরণ্ডসংহিতা', ৭/১৩

এই যে নিজেকে শক্তিস্বরূপ জ্ঞান ক'রে দেহমধ্যে শিব-শক্তির মিলনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়া, এটা প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক সাধন রীতিরই প্রতিফলন। কারণ, কৌলতান্ত্রিক নিজেকে শক্তিময় এবং সমগ্র জগতকেই শক্তিময় জ্ঞান করে।[৫৪] কৌলতান্ত্রিকদের দিব্যভাব নাথধর্মে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছিল এবং তন্ত্রোক্ত যোগ-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই নাথধর্ম-তত্ত্ব বিকশিত হয়েছিল। নাথধর্মাবলম্বীদের মধ্যে

সুপ্রচলিত 'শিবসংহিতা', 'শিবপুরাণ', 'শিবরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থরাজির মধ্যে 'শিবসংহিতা' একটি তান্ত্রিক গ্রন্থ। নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র', 'তারাসূক্ত', 'সাবরতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের প্রচলন দৃষ্ট হয়।

এইভাবে বিভিন্ন আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাথধর্মে তন্ত্র ও তান্ত্রিকসাধন-পদ্ধতির প্রভাব সুপরিস্ফুট। নাথসাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই তন্ত্র-প্রভাবের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

নাথসাহিত্য তন্ত্রোক্ত বিশেষ সাধনপদ্ধতিরই লৌকিক ভাষ্যরূপ

বাংলার নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির মধ্যে নাথধর্ম ও সম্প্রদায়ের যে বিচিত্র আখ্যানগুলি বর্ণিত হয়েছে, তা' যেন তন্ত্রোক্ত বিশেষ সাধন পদ্ধতিরই লৌকিক ভাষ্যরূপ। নাথকাব্যগুলি তান্ত্রিক ও যৌগিকশক্তির মহিমা-বর্ণনাতেই পঞ্চমুখ। নাথযোগীদের জীবনকথা এবং নাথধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে বাংলায় নাথসাহিত্যের যে পরিধিটি রচিত হয়েছিল, তাতে তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলন স্বচ্ছরূপ লাভ করেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে তান্ত্রিকসাধনার যে বিচিত্র ধারা-প্রবাহ বহমান, নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি সেই তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির সুস্পষ্ট আলেখ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিকসাধনার যে বিবিধ পদ্ধতি ও ক্রম বিবৃত হয়েছে, তারই কতকগুলি বিশিষ্ট দিক বাংলার নাথসাহিত্যে ব্যক্ত হয়েছে। বাংলার নাথসাহিত্যে নাথধর্মের কায়াসাধনাদির তত্ত্ব ও প্রক্রিয়ার যে বিচিত্র বর্ণনা রয়েছে, তার অনেকস্থলই তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত অংশের অনুরূপ। তন্ত্রের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, শিবশক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার নাথসাহিত্যে। বাংলার নাথসাহিত্যে নাথধর্মতত্ত্বের ও নাথসম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির যে বিচিত্র রূপালেখ্যটি ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত যৌগিক প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট দিকগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বিভিন্ন ধর্মসম্পরদায়ের কথাই প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় উদ্গীত হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায়ই তন্ত্রোক্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নাথধর্মও যে তন্ত্র-ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা' আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এই নাথধর্ম ও নাথযোগীদের কাহিনীকে অবলম্বন করে বাংলায় নাথসাহিত্যের যে বিচিত্র ধারা গড়ে উঠেছিল, তাতে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও তন্ত্রোক্ত বিশেষ সাধনাপদ্ধতি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'গোপীচন্দ্রের গান', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'গোরক্ষবিজয়', 'হাড়মালা' প্রভৃতি নাথগীতিকাগুলির কাহিনী-বিশ্লেষণ ও তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি—

বাংলার নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'গোপীচন্দ্রের গান', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'গোরক্ষবিজয়', 'মীনচেতন', 'ময়নামতীর গান', 'হাড়মালা', 'নিগমসপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির কাহিনী ও বিষয়বস্তু আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত যৌগিক প্রক্রিয়া ও তান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক কত গভীর। তন্ত্রের গুরুবাদ, নাড়ীতত্ত্ব, দেহমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা, ষট্‌চক্রসাধন, শিব-শক্তিতত্ত্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে নাথসাহিত্যের উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে।

প্রথমে 'গোপীচন্দ্রের গান' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে'র কথাই ধরা যাক্। নাথধর্মে তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তন্ত্রোক্ত গুরুবাদের যে কথা বলা হয়েছে, সেই গুরুবাদ 'গোপীচন্দ্রের গান', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' প্রভৃতির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। রাজা গোপীচন্দ্রের অমরত্ব লাভের উপায়-সম্পর্কে গোরক্ষনাথ রাণী ময়নামতীকে বলছেন,—

"এতেক বলিয়া নাথ ময়নাক বুঝায়।
গুরু না ভজিলে বাছা নাহিক উপায়।।
তোমার বালকের পরমায়ু আঠার বৎসর।
সেবিলে গুরুর চরণ হইবে অমর।।"[৫৫]

পিতৃশোকতুর পুত্র গোপীচন্দ্রকে রাণী ময়নামতী বলছেন,—

"মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাহাকে লইবে যমরাজে।।
গুরুর চরণে যার মন নাহি বান্ধে।
অবশ্য পড়িবেন সেই যমরাজের ফান্দে।।
গুরু সেব নাম জপ বাড়িবে পরমাই।
গুরুর মতন সার ধন পৃথিবীতে নাই।।
গুরু আদ্য গুরুসাধ্য গুরু করতার।
গুরু না ভজিলে বাছা সকলি অন্ধকার।।
গুরুর চরণে যার না হইল মন।
নিশ্চয় জানিত তার বিধি বিড়ম্বন।
ময়না বলেন শুন বাছা গোপীচন্দ্র।
গুরু ভজিলে বাছা অমর হয় স্কন্ধ।।"[৫৬]

হাড়িপার ক্রোধশান্তির জন্য ময়নামতীর সকাতর আবেদন,—

"শিশুর তরে রক্ষা কর জলন্ধর।
গুরু ইন্দ্র, গুরু চন্দ্র, গুরু সর্বসার।

গুরু বিনে সেবকের নাহিক নিস্তার।
তুমি গুরু পরমব্রহ্ম ত্রিভুবনের সার।।"[৫৭]

গোপীচন্দ্রের প্রতি রাণী ময়নামতীর উক্তি—
"সর্বদেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।
গুরুভজ নাম জপ মায়াজাল ছাড়।।"[৫৮]

বেশ্যাগৃহে নির্যাতিত রাজা গোপীচন্দ্রের আক্ষেপোক্তি,—
"আহা গুরু পরমব্রহ্ম সংসারের সার।
নটিনীর ঘর হইতে করহ উদ্ধার"।[৫৯]

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' বর্ণিত গুরুর এই অপার মহিমা কীর্তন তন্ত্রশাস্ত্রের পূর্বোক্ত গুরুমাহাত্ম্য বিষয়ক বচন এবং নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়;—

(১) "গুরুরেব শিবঃ সাক্ষাৎ গুরুঃ সর্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্বং গুরুময়ং জগৎ।।"[৬০]

(২) "গুরুর্গুরোতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে।।"[৬১]

নাথসাহিত্যে বর্ণিত গুরুমহাত্ম্যের সঙ্গে তন্ত্র-বর্ণিত গুরু-মাহাত্ম্যের সবিশেষ ঐক্য লক্ষিত হয়। তন্ত্রের সূক্ষ্ম জটিল যৌগিক প্রক্রিয়া নাথধর্মে অনুসৃত হয়েছিল বলেই নাথসাহিত্যে গুরু সম্পর্কে তন্ত্রোক্ত ধারণার প্রতিবিম্বন দেখা যায়। অন্যান্য শাস্ত্রেও গুরুর মহিমা ঘোষিত হয়েছে; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে সাধনার প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বিষয়ে গুরুর প্রয়োজনীয়তার প্রতি যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, অন্যান্য শাস্ত্রে সেরকম দেখা যায় না।

'গোপীচন্দ্রের গানে' বিভিন্ন স্থানে আমরা তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাই। মাণিকচন্দ্র রাজার বিবাহ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,—

"ময়নাক বিবাহ করি রাজার না পুরিল আশ।
তারপর দেবপুরের পাঁচকন্যা বিভা করি পুরি গেল মনের হাবিলাস।।
আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
দেবপুরের পাঁচকন্যা ডাকিনী ময়না কোন্দল লাগিল।।"[৬২]

এখানে মাণিকচন্দ্ররাজার 'পাঁচকন্যা' বিবাহ বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এর মধ্যে আমরা

তান্ত্রিক ভাবনার পরিচয় পাই। তান্ত্রিক সাধনায় 'শক্তি' বা নারীসহযোগে সাধনা বিশেষ ফলপ্রদ।[৬৩] পঞ্চ বা পাঁচসংখ্যার বিশেষ ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলে তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চসংখ্যক উপকরণের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চকন্যা'র উল্লেখ তন্ত্র-প্রভাবের ফলরূপে অনুমান করা যায়। এখানেও তারই প্রভাবে 'দেবপুরের পাঁচকন্যা'র কথা এসেছে বলে অনুমিত হয়।[৬৪]

'গোপীচন্দ্রের গানে' ময়নামতীকে 'ডাকিনী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'ডাকিনী' শব্দের মধ্যেই ময়নামতীর তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তন্ত্রের বামাচার সাধনায় সিদ্ধ 'বীর' সাধকদের প্রধান বীরেশ্বর এবং বীরেশ্বরের প্রধানের নাম 'ডাক' এবং যেসকল স্ত্রীলোক বামাচারী সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করেন, তাদেরকে 'ডাকিনী' বলা হয়।[৬৫]

'গোপীচন্দ্রের গানে' আমরা দেখতে পাই যে, মাণিকচন্দ্র রাজার রাজ্যে এক দক্ষিণদেশী বাঙ্গালের দেওয়ানগিরির আমলে অরাজকতার ফলে দুই রায়ত মহৎ (মোড়ল) -এর পরামর্শে মহাদেবের কাছে পাঁঠা, খাঁচা ভরে হাঁস-কবুতর, ধূপ-সিন্দুর নিয়ে শরণ নিলে মহাদেব বললেন,—

"মহাদেব বলেন শুন রাইয়তগণ।
পারনি গঙ্গার লাগি চল হাঁটিয়া।।
হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া।
কালো ধবল পাঠা দেও বলিছেদ করিয়া।।
হাস কৈতর গুণা দেন জল উৎসর্গিয়া।
ধূপ সিন্দুর গুণা দেন ঘাটত ধরেয়া।।
একটা বিন্নার থোপ আনেন উগরিয়া।
লাংটি চিপি শাপ দেন মঙ্গলবার দিনা।।"[৬৬]

এখানে কাল-সাদা পাঁঠার বলিদান, হাঁস-কবিতরের উৎসর্গ এবং মঙ্গলবার দিন রাজাকে অভিশাপ দান তন্ত্র-প্রভাব সূচিত করে।[৬৭]

রাণী ময়নামতী যে বিভিন্ন সিদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন, তা' তাঁর চরিত্র আলোচনা করলেই বুঝা যায়। ময়নামতীর এই সিদ্ধিগুলির মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক যোগশক্তিই যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। কারণ, যে 'কায়সিদ্ধি' ও 'মহাজ্ঞান'-প্রভাবে নাথযোগীরা বিচিত্র অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতেন, তা' মূলতঃ তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি ও যোগক্রিয়ারই অন্তর্গত।

গোদা-যমের নিকট যখন রাণী ময়নামতীর স্বামীর প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন

নিষ্ফল হল এবং গোদা যম ময়নাপ্রদত্ত পাঁচশত টাকা পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করল, তখন,—

"থর থর করি ময়না কাঁপিয়া উঠিল।
ক্রুদ্ধমান হইয়া ময়না ক্রোধে জ্বলি গেল।।
মহামন্ত্র গিয়ান লইল হৃদয়ে জপিয়া।
চণ্ডী কালী রূপ হৈল কায়া বদলিয়া।।
তৈল পাটের খাঁড়া নিল হস্তে করিয়া।
মার মার করি যমক নিগায় পিট্টিয়া।
প্রাণের ভয়ে যম বেটা যায়তো পলাইয়া।
একস্থান ময়নাতে ডাকিনী ময়না আইল ফিরিয়া।"[৬৮]

এখানে ময়নামতীর খড়্গ হস্তে চণ্ডকালীর রূপ-ধারণের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক ভাবমণ্ডল বা পরিবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গোদা যমকে ধরবার জন্য ময়নামতীর কায়াপরিবর্তনের বর্ণনা বিশেষ আকর্ষণীয়;যথা,—

(১) "মহামন্ত্র গিয়ান লৈল বুড়ি ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া।।"

(২) "মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
চ্যাঙ্গাবোড়া সাপ হৈল বুড়ি ময়না কায়া বদলিয়া।।"

(৩) "মহামন্ত্র গিয়ান নিলি বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
লক্ষ গণ্ডা বার বিলাই হৈল কায়া বদলিয়া।।"[৬৯]

এইরূপে গোদাযমকে ধরবার জন্য রাণী ময়নামতীর পুনঃ পুনঃ সর্প, বিড়াল, বাজপাখী, ঘুঘুপাখী, মাছি প্রভৃতি বিভিন্ন রূপধারণ তাঁর কায়াসিদ্ধির পরিচায়ক। রাজা মাণিকচন্দ্রের শবদাহে অগ্নির মধ্যে ময়নামতীর স্থিরভাবে উপবেশন তাঁর অপর সিদ্ধি।

রাণী ময়নামতীকে আমরা পুনঃ পুনঃ 'মহামন্ত্র' স্মরণ করে অসাধ্য সাধন করতে দেখি। এই মহামন্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিশেষ। নাথ সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'গোরক্ষসংহিতা', 'মহামন্ত্র' সম্পর্কে উক্ত হয়েছে,—

"হংকারেণ বহির্যাতি সকারোণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস হংসেতি মন্ত্রো'য়ং জীবো জপতি সর্বদা।।"

—'গোরক্ষসংহিতা', ১।৩৬।

এই 'হংস' মন্ত্রকেই 'মহামন্ত্র' বা 'অজপা' গায়ত্রী বলা হয়। গুরু উপদেশে এই

মন্ত্রই 'সোঽহং' মন্ত্রে পরিণত হয়। 'হংস' মন্ত্র বা 'অজপা' গায়ত্রী' কুণ্ডলিনী শক্তি থেকেই সমুদ্ভূত হয়েছে, এ'সম্পর্কে 'গোরক্ষসংহিতা'য় (১।৪০) বলা হয়েছে যে,—

"কুণ্ডলিন্যা সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ।।"

'হংস-মন্ত্রের জপ ও সাধন তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতির এক প্রধান অঙ্গ৭০ এবং 'হংস' মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শিবশক্তি-তত্ত্বই দ্যোতিত হচ্ছে। এ'বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য;—

"হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃতাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্তু সঃ। অজপা কথিতা তাভ্যাংজীবো যামুপতিষ্ঠাতি। পুরুষং ত্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতির্নিত্যমাত্মনঃ। যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোহমিদং ভবেৎ। সকারার্ণং হকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃপরং। সন্ধিং কুর্যাৎ পূর্বরূপং তদাসৌপ্রণবো ভবেৎ।"[৭১]

অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির বাচক হংসের 'হং' বর্ণটি পুরুষ এবং 'সঃ' বর্ণটি প্রকৃতি। এই হংসের নামই অজপা; জীব সর্বদা এর উপাসনা করে। যেসময় প্রকৃতি পুরুষকে আপনার আশ্রয় মনে করে একীভাবাপন্ন হন, তখন ঐ 'হংস' 'সোঽহং' রূপে পরিণত হয়। পরে মূর্তিস্বরূপ স-কার ও হ্-কার লোপ ক'রে পূর্বরূপ সন্ধি করলে 'ওঁ' এই পদ হয়।

'হংস' মন্ত্র বা অজপা-মন্ত্র সম্পর্কে তন্ত্রে আরও বলা হয়েছে যে,—"অজপাধারণং দেবি কথয়ামি তবানঘে। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পরং ব্রহ্মৈব দেশিকঃ। হংস পদং পরেগাণি প্রত্যহং ন জপেন্নরঃ। মোহবন্ধংন জহাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে। শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে যদা। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসতয়া তদা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ। উচ্ছ্বাসে চৈব নিঃশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং। তস্মাৎ প্রাণস্তু হংসাত্মা আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ।".......“হংসেতি প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ প্রকৃতের্গুণঃ। হংকারেণ বহির্যাতি সকারেন বিশেৎ পুনঃ। হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা। ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ। অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।"[৭২]

এই 'অজপা' মন্ত্রসাধন মূলাধারাদি ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত। অজপামন্ত্র-প্রভাবে সাধক শিবশক্তি-তত্ত্বোপলব্ধি ক'রে আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। অজপা-মন্ত্রসাধন, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি হচ্ছে নাথযোগীদের কায়াসিদ্ধি ও অমরত্বলাভের প্রধান উপায়। রাণী ময়নামতীর 'মহামন্ত্র'-স্মরণ এবং কায়াপরিবর্তনাদির সাধনা তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' এই অজপা-মন্ত্র ও 'নিজনাম' জপের মাহাত্ম্য বিভিন্ন স্থানে কীর্তিত হয়েছে। মানিকচন্দ্র রাজার চিতাপার্শ্বে ময়নামতী 'নিজনাম'-জপের ফলে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা করেন,—

"জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ব্রহ্মহুতাশন।
নিজনাম জপে ময়না করিয়া আসন।।
* * *
সাত দিন রাত্র যদি হুতাশন জ্বলে।
কি করিতে পারে ময়না নিজনামের বলে।।"[৭৩]

ময়নামতী হাড়িপার নিকট পুত্র গোপীচাঁদকে সমর্পণ করলে হাড়িপা গোপীচাঁদকে 'নিজনাম' দান করে বললেন,—

"এই নাম জপিয় বাছা সরোবর কূলে।
শুখ্না পুষ্করিনী ভরিব নামের বলে।।
শুখনা পুষ্করিনী যদি জলেতে ভরিবে।
নিশ্চয় জানিও তবে অমর হইবে।।

* * *
এই নিজনাম জাপিলে বাছা হইবে অমর।
চতুর্দশ ভুবন এই নামে হবে পার।।"[৭৪]

এরপর গুরু হাড়িপা শিষ্য গোপীচাঁদকে বললেন যে, এই 'নিজনাম' জপের ফলেই রামচন্দ্র রাবণ-বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন, মহাদেব 'নিজনামে'র প্রভাবে দশভুজা দুর্গাকে পত্নীরূপে লাভ করেন এবং শনির দৃষ্টির ফলে পুত্র গণেশের মস্তকহীন দেহে গজমুণ্ড সংযোজিত করেন, ভগবান কৃষ্ণ 'নিজনাম' জপ ক'রে কংস বধ করেন, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ এই নাম-প্রভাবেই পরমপদ লাভ করেন এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথসিদ্ধাগণ এই নাম-জপ বা অজপা-জপসাধনের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করেন।

"অবধূত গোরক্ষযতি তার স্থানে ময়নামতী
নিজনামে হইল অমর।
মীন্নাথ কানুফা আদি নিজনামে যোগ সাধি,
অমর হইল জলন্ধর।।"[৭৫]

রাণী ময়নামতীকে গুরু গোরক্ষনাথ এই অজপা-মন্ত্রদানে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন।

রাণী ময়নামতী মাণিকচন্দ্র রাজাকে অজপা-মন্ত্রদানেই অমর করতে চেয়েছিলেন।

"হের আইস মাণিকচান্দ প্রভুগদাধর।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান রাখ ধড়ের ভিতর।।
কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর[৭৬]।
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর।।"

—'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'।[৭৭]

ময়নামতী তাই পুত্র গোপীচাঁদকে এই 'অজপা'-মন্ত্রসাধনের জন্য একান্ত অনুরোধ করছেন।

"বাছিয়া খরিদ কর অজপা নামের ধ্বনি।
মুখে জপ নিজ নাম দুই কর্ণে শুনি।।"

—'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'[৭৮]

অবশেষে গুরু হাড়িপা শিষ্য গোপীচাঁদকে এই 'অজপা' মন্ত্র দান[৭৯] করলেন;—

"নিজ নাম ব্রহ্মজ্ঞান সর্বনামের সার।
যে নামে আইল চারিযুগের বিচার।।
এক নাম তিন নাম নাহিক দোসর।
শুনাইল সেই নাম গুরু জলন্ধর।।"

—'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'।[৮০]

উপরি-উক্ত এই 'অজপা' মন্ত্র ('হংস'-মন্ত্র) সাধন যে তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির অঙ্গবিশেষ, তা' পূর্বেই আলোচনা করেছি। কুণ্ডলিনীশক্তি থেকে উদ্ভূত শিবশক্তিময় এই অজপা-মন্ত্র সাধনে তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্‌চক্রজ্ঞান অপরিহার্য।[৮১] 'হংস'-ই জীবের জীবাত্মা। মূলাধার পদ্ম থেকে 'হংসঃ' শব্দ উত্থিত হয়ে অনাহতপদ্মে ধ্বনিত হয়। 'অজপা' রূপ 'হংসঃ' মন্ত্র জীবমাত্রেই দিবারাত্র আপনা-আপনি জপ করে। কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকালে 'হংস'-এই উচ্চারণ হয়। শ্বাস বহির্গমনকালে 'হং'-কার (শিবস্বরূপ) এবং শ্বাসগ্রহণ সময়ে 'সঃ'-কার (শক্তি স্বরূপ) উচ্চারিত হয়। অজপামন্ত্র অর্থাৎ 'হংস' মন্ত্র জপের দ্বারাই সাধক শিবশক্তিতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন এবং এই মন্ত্র জপ করতে করতেই সাধকের 'সোঽহং' (আমিই ব্রহ্ম), এই জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। 'হংস' মন্ত্র থেকেই পরমব্রহ্মের একাক্ষর 'ওঁ'-এর তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থের উপরি-উদ্ধৃত অংশসমূহে এই 'হংসঃ' এবং 'ওঁ' মন্ত্রের সাধনার কথাই বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী পরমব্রহ্মের এই একাক্ষরী 'ওঁ-মন্ত্রকে লক্ষ্য ক'রেই বলা হয়েছে যে,— "এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।" 'ওঁ'-মন্ত্রের প্রতিবর্ণের মধ্যেই শক্তিতত্ত্ব বিরাজিত।

পুত্র গোপীচাঁদকে সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য ময়নামতী কলিকালে ঘোর পাপের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' তন্ত্র-বর্ণিত কলিকালের অবস্থাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

"কলিকাল মন্দকাল কলঙ্কী অবতার।
শিষ্য তুলি দিবে গুরুর রঙ্গে ভার।।
নাংটি পিন্ধা হবে গুরু ধুতি পিন্ধা শিস।
লাজে প্রণাম না করিবে দেখে চতুরদিস।।

*   *   *

কলিকাল মন্দকাল কলির সাত ভাও।
যোয়ান বেটায় না পোষে বৃদ্ধ বাপ-মাও।।
অকুগুল নারী হইয়া পুরুষ বাছিবে।
বয়সের কুহতে ছাইলা পিতাকে ঢেকাইবে।।"[৮২]

'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'তে কলিকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,—

"কলির প্রবেশ হইলে ধর্ম হইব নাশ।
বিধর্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ।।
রাজা হইয়া রাজ্যের না করিব বিচার।
শাস্ত্রনীতি না মানি করিব অনাচার।।
পুত্র সবে না করিব পিতার পালন।
স্বামী ভক্ত না হৈব নারী সবের মন।।
ধনলোভে-কেহ কাকে প্রাণে যে মারিব।
সভাতে বসিয়া কেহ মিথ্যা সাক্ষী দিব।।
মদমত্ত হইয়া কেহ হরিব গুরু নারী।
কনিষ্ঠে হিংসিব জ্যেষ্ঠ ধর্মভয় ছাড়ি।।
হিংসানিন্দা করিবেক নিত্য যে বিবাদ।
কেহ কাকে বলিবেক বাদ পরিবাদ।।
স্তিরি সবে বধিবেক স্বামী আপনার।
মহা মহা সতী সব হৈব মিথ্যাকার।।"[৮৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে কালিযুগের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে;যথা,—

"আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্বধর্মবিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম প্রবর্তকে।।

উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরাঃ নিষ্ঠুরা দুর্মুখাঃ শঠাঃ।।

* * *

নীচ সংসর্গ-নিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহ-পরিবাদপরা খলাঃ।।

* * *

ধর্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্।।"

* * *

যদাস্ত্রিয়োঽতিদুর্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।।
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।।

* * *

ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্ম্যা যদা ধনকণেঽয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।।"[৮৪]

বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে এইভাবে পাপপূর্ণ কলিকালের বিবিধ দুষ্কর্ম, অন্যায় ও অনাচার বর্ণিত হয়েছে এবং এই কলিকলুষিত মানুষের মুক্তি ও পরিত্রাণের একমাত্র হেতুস্বরূপ তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'গোপীচন্দ্রের গানে' রাণী ময়নামতী রাজা গোপীচন্দ্রকেও কালিকালের ভয়ঙ্কর অবস্থা বর্ণনা করে এর থেকে পরিত্রাণের জন্য যে যোগপথ নির্দেশ করেছেন, তা' তন্ত্রোক্ত যোগমার্গবিশেষ।

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে যোগসাধনার প্রেরণা দান ক'রে বলছেন যে, 'নিরঞ্জনের ঘাটে' অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারে উপনীত হয়ে ত্রিবেণী তীর্থস্থানে রসধারায় আপ্লুত হলে জীবাত্মার অমরত্ব লাভ ঘটে এবং 'অজপা' নামের ধ্বনিতে চিত্তবিলীন হলেই ব্রহ্মলাভ হয়। কায়াসাধনের দ্বারাই এটা লাভ করা যায় এবং বায়ুই কায়াসাধনার মূল অবলম্বন।

"শুন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।

* * *

পবনের গুণ টানে নৌকায় এত জোর।[৮৫]

পাঁচ পণ্ডিত[৮৬] লয়া মনুরা চলে বায়ে।
সাধন কর বাছা হৃদয় সবায়ে।।
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবে পরিচয়।
কাণ্ডারী[৮৭] থাকিতে কেনে যাও অন্য ঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা[৮৮] নিরঞ্জন জিটে।।
নিরাঞ্জনের ঘাট বাছা অমূল্য কাণ্ডারী।
সেই ঘাটে নাই বাছা যমের অধিকারী।।

*　　*　　*

দেহের মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিবেণীর ঘাট।
বিকি কিনি কর বাছা শ্রীবলার হাট।।
বাছিয়া খরিদ কর অজপা নামের ধ্বনি।
মুখে জপ নিজ নাম দুই কর্ণে শুনি।।”[৮৯]

এখানে তান্ত্রিক যোগসাধনার কথাই পরিস্ফুট হয়েছে। ষট্চক্রভেদের দ্বারা 'নিরঞ্জনের ঘাটে' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মানবদেহেই সর্বতীর্থের অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক দেহের মধ্যেই ত্রিবেণী স্নান সম্পন্ন করেন। 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে' (শ্লোকসংখ্যা ১১-১২) উক্ত হয়েছে যে,—

“ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী।।
ত্রিবেণী সঙ্গমোযত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত সর্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।”

মানবদেহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীকে যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীরূপে আখ্যাত করা হয়েছে। আজ্ঞাচক্রে নদীস্বরূপিনী এই তিনটি নাড়ী মিলিত থেকে পরে পরস্পর পৃথক প্রবাহিত হয়ে পুনর্বার মূলাধার চক্রে সংযুক্ত হয়েছে। এইজন্য আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী এবং মূলাধারচক্রকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা হয়। তান্ত্রিক সাধকের মানসস্নান এই ত্রিবেণী তীর্থেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। মূলাধারচক্রস্থ তীর্থস্নান সম্পর্কে 'রুদ্রযামলতন্ত্রে' বলা হয়েছে যে,—

"মহিস্থতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে।
তত্র শ্রী ত্রিবেণী তীর্থং স মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ।।"[৯০]

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, তন্ত্রশাস্ত্রে দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে অভিহিত করা হয়েছে। মানবদেহকে অবলম্বন করেই তন্ত্রের সমস্তরকম সাধন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশে তান্ত্রিকসাধক স্বীয়দেহেই সর্বতীর্থের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন। দেহেই আরাধ্য দেবতা বিরাজিত। তন্ত্রের এই দেহতত্ত্ব নাথধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল। 'গোপীচন্দ্রের গানে' হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে রাজা গোপীচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে রাণী ময়নামতীর কয়েকটি উত্তর এ'প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল।

"হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বারাণসী।
মুখ হলো তোর জপ তপ মস্তকে তুলসী।।

* * *

তৃষা লাগিলে জল আসে শূন্য হইতে।
তৃষা লাগিলে জল তোর খায় হুতাশনে।।
মিরডারা তোর বঁড়শীর ছিপ পবন হইল তোর সুতা।
মূলকণ্ঠ তোর বঁড়শীর পোট দুই আক্ষি ফুলতা।।"[৯১]

রাণী ময়নামতীর এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে যে, মানবহৃদয়ের মধ্যেই (অর্থাৎ মানবদেহের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী তিনটিকে আশ্রয় করে) গয়া, গঙ্গা ও বারাণসী বিরাজিত; মুখ হচ্ছে ইষ্টমন্ত্র-সাধনের প্রধান অবলম্বন এবং মস্তকে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) 'তুলসী'র (উপাস্য দেবতার) অধিষ্ঠান। তন্ত্রশাস্ত্রে দেহের মধ্যেই যাবতীয় তীর্থাদির এবং আরাধ্যদেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয় 'শিবসংহিতা' নামক তন্ত্রগ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য;—

"ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ।।"

* * *

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্লভা।।"[৯২]

তৃষ্ণা লাগলে জলশূন্য থেকে আসে এবং তৃষ্ণা লাগলে জল অগ্নিতে খায়। অর্থাৎ অমৃত সহস্রাররূপ শূন্য থেকে ক্ষরিত হয় এবং দেহমধ্যস্থ কালাগ্নি তা' শোষণ

ক'রে মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচাঁদকে বলছেন যে, "মিরডারা (মেরুদণ্ড) তোর বড়শির ছিপ, পবন হল তোর সুতা, মূলকণ্ঠ তোর বড়সির পোট, দুই আক্ষি (চক্ষু) তোর ফুলতা (ফাতনা)।" এখানে "বড়সি" শব্দে মানবদেহের সুষুম্না নাড়ী, 'সুতা' অর্থে বায়ু এবং 'বড়সির পোট' বা গ্রন্থী অর্থে মূলাধার চক্র বা পদ্ম উপলক্ষিত হচ্ছে। নাথযোগীদের সাধনার লক্ষ্যই হচ্ছে দেহের রসকে মস্তকস্থিত সহস্রারে অবস্থিত অমৃতের সঙ্গে যুক্ত করা এবং মিলিত অমৃত প্রবাহে দেহ ও মন অভিসিঞ্চনের দ্বারা অমর সিদ্ধদেহ লাভ করা।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে সহস্রারে শিবশীর্ষে অবস্থিত চন্দ্র থেকে বিগলিত সুধাধারা ইড়া-সুষুম্না নাড়ীপথে মূলাধারে এলে মূলাধারে সূর্যস্বরূপিনী কুণ্ডলিনীশক্তি সেই অমৃতকে গ্রাস করেন এবং এরই ফলে জীবের জন্মমৃত্যু সংঘটিত হয়।[৯৪] নাথযোগীদের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নাবর্ত্মে বায়ু-সাধন বা প্রাণায়াম-প্রভাবে শুক্র বা মহারস ঊর্ধ্বে নীত ক'রে অক্ষয় সিদ্ধদেহ লাভ করা। এই সাধনার প্রধান অবলম্বন কুণ্ডলিনী শক্তি ; কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে শিবের সঙ্গে সংযুক্ত করলেই অমৃতপ্রবাহ অক্ষয় হয়ে দিব্যশরীরের প্রাপ্তি ঘটে। রাণী ময়নামতী গোপীচাঁদকে এই তান্ত্রিক যোগসাধনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। 'গোরক্ষবিজয়' ও 'হাড়মালা' গ্রন্থের আলোচনায় এই বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে।

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' গুরু হাড়িপা রাজা গোপীচন্দ্রকে যে যোগসাধনা শিক্ষা দিয়েছেন, তা' মূলতঃ তন্ত্রের যৌগিক প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত।

"মেরুদণ্ড স্থির করিয়া করিল আসন।
যোগ আসন সাধে হইল মহাজন।।
যোগভেদ দিল গুরু শরীর বিচার।
স্তুতিমনা ভেদ দিয়া কয়া কর্ণসার।।
শব্দচক্রেতে দিল শবদ উয়ার।
চৌদ্দভুবন ভেদ দিল খিড়কীর দ্বার।।

* * *

নিজনাম সাধিল রাজা গুরুর সাক্ষাতে।
আরোগ্য হইল রাজা মরণের হাতে।।
নিকট আছিল যত মরণের ভয়।
মৃত্যুপথ দূরে গেল হইল অক্ষয়।।

স্বর্গমর্ত্য পাতাল ভেদ দিল করতার।
সুকুর মামুদে গায় যুগের বিচার।।
এইরূপে যোগসাধি হৈল তত্ত্বসার।
শরীরের ভেদ গুরুকে লাগিল পুছিবার।।"[৯৫]

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' হাড়িপা ও গোপীচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে বিন্দু, মন, পবন, চন্দ্র-সূর্যতত্ত্ব, চৌদ্দভুবনভেদ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।[৯৬]

রাজা গোপীচন্দ্র গুরু হাড়িপাকে প্রশ্ন করছেন,—

"বুঝগুরু তত্ত্বসার সদা ধ্যান করিবার
নিজ আত্মা চিনিতে পারি।

* * *

কোথা বিন্দু কোথা মন কোথা বৈসে পবন,
কোথা থাকে আইন গাইন।।
শিব শক্তি বলি কাকে কোনখানে ক্ষমা থাকে,
কাকে বলি ত্রিবেণীর ঘাট।

* * *

গুরু কোথা নিরঞ্জন কোন স্থানেতে আসন,
কোন দেব বৈসে কোন আকারে।।
কোথা বৈসেন শ্রীহরি কোথা আছে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মলোক সব বৈসে কাত।
কোথা বৈসে মুণিগন কোথা বসে নারায়ণ,
কোন স্থানে বৈসে জগন্নাথ।"[৯৭]

এর উত্তরে গুরু হাড়িপা বলছেন,—

"দেহের মধ্যে নিরাঞ্জন ভুলে ফিরে অকারণ,
সকল দেবতা বসে শরীর ভিতরে।
উত্তম আত্মা মহাদে চিনিতে না পারেকে,
ভিন্ন দেব পূজেত বর্বরে।।

দ্বিতীয়েতে বসে হরি উপরেতে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মালোক সব বৈসে তাথ।
উদয়পুরে মুণিগণ তাথে বৈসে নারায়ণ,
শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ।।

* * *

কটিতটে বসুমতী জিহ্বায় বৈসে সরস্বতী,
তোমার গোফা মনুরায়ের ঘর।।"[৯৮]

উপরি-উক্ত অংশে দেহকেন্দ্রিক তান্ত্রিক যোগের তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে। দেহের মধ্যেই চতুর্দশ ভুবন, সর্বদেবদেবী, সর্বতীর্থ, শিব-শক্তি প্রভৃতির অধিষ্ঠান।
তন্ত্র-সাধক ষট্‌চক্র সাধনায় স্বীয়দেহে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। হাড়িপার নির্দেশে গোপীচন্দ্রের যোগসাধনায় এই তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়াই উদ্ভাসিত হয়ে ডঠেছে।

নাথসাহিত্যে আমরা পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ পাই। যে কায়াসাধনার উপর ভিত্তি করে নাথধর্ম গড়ে উঠেছিল, সেই কায়াসিদ্ধির মূল লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভই যে অমরত্ব-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তা' 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে' প্রথমেই বলা হয়েছে,—

"ব্রহ্মজ্ঞান সাধপুত্র যোগী হইবার।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহিক মরণ।।"[৯৯]

ময়নামতীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে গোরক্ষনাথ ময়নামতীকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেছিলেন।

"ময়নামতীরে গোর্খনাথ ব্রহ্মজ্ঞান কয়।

* * *

তবে জ্ঞান কহি দিল ব্রহ্মজ্ঞান বুলি।"[১০০]

গোপীচন্দ্রের রাণীদের ষড়যন্ত্রকে রাণী ময়নামতী এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবেই ব্যর্থ করেন। রাণীদের প্রদত্ত বিষভক্ষণ করে ময়নামতী ব্রহ্মজ্ঞানের-দ্বারা সেই বিষক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেন।

"একেত ময়নামতী ব্রহ্মজ্ঞান জানে।
শ্বাস ধরি পড়ি রৈল সবে মিলি টানে।।

ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা নাহি জান তুমি।
পঞ্চতোলা বিষ খাই জারণ কৈল আমি।।"[১০১]

হাড়িপার নিকট গোপীচন্দ্রের উক্তি ঃ—

"রাজায় বোলে শুন গোঁসাই মোর নিবেদন।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিবারে লয় মোর মন।।
* * *
ব্রহ্মজ্ঞান কহি দেও জীবন উপায়।।"[১০২]

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' দেখি যে, হাড়িপা গোপীচন্দ্রের রাণীদের বিষপ্রদান প্রভৃতি সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করেন এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে।

'হু হু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
শিবনামে ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন ছুটিল।।
* * *
বিষপান করি যার না হইল মরণ।
না জানি মনুষ্যরূপে আছে কোন জন।।
* * *
ব্রহ্মজ্ঞান নিজনাম জপে যেই জন।
গরল অমৃত তারে একুই সমান।।"[১০৩]

সুলোচনী নামে এক বারবণিতার গৃহে রাজা গোপীচন্দ্র যখন শাস্তিভোগ করেছিলেন, সেই সময় বারবণিতার জন্য একদিন জল আনয়নের সময় পথে এক ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যার কথা শুনে রাজা অভিভূত হয়ে পড়েন।

"আর দিন গেল রাজা জল আনিতে।
দৈবযোগে দেখা হৈল ব্রহ্মজ্ঞানীর সাথে।।
ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছে যোগের কাহিনী।
জল আনা বিস্মরিল ব্রহ্মজ্ঞান শুনি।।
জ্ঞান কৈয়া ব্রহ্মজ্ঞানী যায় রাজপথে।
ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া রাজা বিরাগী হৈল চিত্তে।।"[১০৪]

অবশেষে গুরু হাড়িপা রাজা গোপীচন্দ্রকে এই ব্রহ্মজ্ঞান দানে জীবন্মুক্ত করলেন;—

"নিজনাম ব্রহ্মজ্ঞান সর্বনামের সার।
যে নামে হৈল চারিযুগের বিচার।।
এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়।
সেই অজপা নাম গুরুদেব কয়।।
এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।
শুনাইল সেই নাম গুরু জলন্ধর।।"[১০৫]

এইভাবে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়াই নাথধর্ম-সাধনার সারকথা। এই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য নাথযোগীগণ 'অজপামন্ত্র' জপ, ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতি যে সাধন-ক্রমের কথা বলেছেন, তা' সমস্তই তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। নাথধর্মের কায়াসাধনার মধ্যে যেমন তান্ত্রিক যোগসাধনার বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলি অনুসৃত হয়েছে, তেমনই তন্ত্রশাস্ত্রের সর্বশেষ কথা ব্রহ্মজ্ঞানলাভই নাথধর্ম-সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য। নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থেও ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে।

গোরক্ষ-বিজয়

আমরা এবার নাথসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণা ও সাধন-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দান করব।

তন্ত্রশাস্ত্রে শিব প্রধান এবং শিবই সকলের গুরু।[১০৬] এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে।

"একথা শুন সবে শুনহ তুরিত।
সভানের গুরু শিব হইল পৃথিবীতে।।
আদ্যে গুরু শিব হইল পৃথিবীতে।
আদ্যে গুরু মহাদেব পিছে আর সব।
সাধন্তে সকলসিদ্ধা তরিবারে ভব।।।"[১০৭]

তন্ত্রশাস্ত্রে বকুল বৃক্ষের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।[১০৮] কৌলতান্ত্রিকদের নিকট বকুলগাছের মাহাত্ম্য অসীম। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে গোরক্ষনাথের বকুলগাছের প্রতি আকর্ষণ বহুস্থানে দেখা যায়।

(১) "মীননাথ পড়িলেক কদলীর ভুলে।
গোর্খনাথ বসি আছে **বকুলের তলে**।।[১০৯]

(২) "কন্যা ঘরে এড়ি তবে গোর্খ চলি গেল,
বিজয়নগর ছাড়ি **বকুলেত** আইল।
বকুলের তলে নাথ আসন করিল,
হেনকালে কানফা যাএ যতিএ দেখিল।।"[১১০]

আমরা নাথধর্মের আলোচনায় দেখেছি যে, নাথগণ 'কৌল' ছিলেন। গোরক্ষনাথও মহাসিদ্ধ কৌল ছিলেন। সেজন্যই সম্ভবতঃ বকুল বৃক্ষ তাঁর নিকট পরমপ্রিয়।

কদলী রাজ্যের রাজসভায় গুরু মীননাথকে দর্শন করে গোরক্ষনাথের প্রণামটি সবিশেষ লক্ষণীয়।

"গুরুকে দেখিয়া গোর্খে মাগে মনস্কাম।
আগু বাহি করিলেক এ পঞ্চ প্রণাম।।"[১১১]

মনে হয়, 'পঞ্চ প্রণাম' অর্থে এখানে তন্ত্রোক্ত পঞ্চাঙ্গ প্রণামের[১১২] কথাই বলা হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যার অন্যতম মহাবিদ্যা হচ্ছেন কালী। নাথধর্মে যে শক্তিপূজার প্রচলন ছিল, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। 'গোরক্ষবিজয়ে'ও আমরা দেবী পার্বতীর কালীরূপে পূজিত হওয়ার কথা পাই।

"তবে সতী যতিনাথে নিভৃতে কহিল,
বৎসরেতে একবার পূজিতে বলিল।
সেই সে গোর্খে তবে নিবদ্ধ করিল,
কালি বলি এক মূর্তি রাঢ়াত রাখিল"।[১১৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে জীবকে শিব বলা হয়েছে এবং জীবের শিবত্ব-প্রাপ্তির জন্য বহুবিধ সাধন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও জীবের সঙ্গে শিবের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর মধ্যে পাচ্ছি। মীননাথ কদলীরাজ্যে নিজের রমণী-মুগ্ধতার পশ্চাতে মহাদেবের পত্নী-গ্রহণরূপ বিষয়ের যুক্তি দেখিয়ে গোরক্ষনাথকে বলছেন,—

"মোর গুরু মহাদেব পরমমোহন,
গঙ্গা গৌরী দুই নারী করিছে গ্রহণ।

আর দুই নারী তান হইয়া দিগম্বরী,
হেনরূপে থাকে সব কুতূহল করি।
ভুলে আছে গৃহবাস আহ্মি কি বা হই,
শিবে আমি একৈ গতি শুন গোরখাই।"[১১৪]

এর উত্তরে গোরক্ষনাথ বলছেন,—

"গুরু ভাবি চায়মন মনে করি সঞ্চরণ
তোমা গুরু মহাদেব হয়ে,
এক ভোগী নহে হর সর্বভোগী নিরন্তর
ভাঙ্গ ধুতুরা যেন খায়ে।
নারী লয়া করে কেলি তত্ত্বেতে না রহে ভুলি
বিস্মরণ নাহিক তাহার,
এক মূর্তি না হয়ে শিব সর্বমূর্তি হয়ে জীব
সর্বভোগে না করে আহার।[১১৫]

এরপর গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে 'চারিচন্দ্র' সাধনের কথা স্মরণ করিয়া দিলেন,—

"গুরু চারিচন্দ্র হয়ে শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ,
আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র উন্মত্ত গরলচন্দ্র
এই চারি শরীর ব্যাকান,
আদি চন্দ্র করি স্থিত, নিজচন্দ্র সহিত
উন্মত্ত করিয়া সন্ধান,
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া আপনাকে ভার দিয়া
গরলচন্দ্র সব করে পান।
চারিচন্দ্র সম্বরিয়া ভবসিন্ধু তর গিয়া
তবে সে সকল রক্ষা পায়ে,
হেন কর্ম না করিলা সব তুমি বিস্মরিলা
কহ গুরু কেমত উপায়।"[১১৬]

এখানে 'আদি' বা 'আদ্য চন্দ্র' অর্থে মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থত চন্দ্র, নিজচন্দ্র অর্থে 'রস' (তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী), 'উন্মত্তচন্দ্র' অর্থে মন, বায়ু এবং 'গরলচন্দ্র'

অর্থে অমৃত উপলক্ষিত হচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুকে দেহে আবদ্ধ করতে হবে এবং 'নিজচন্দ্র'কে (রসকে) ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করে মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মমূলের যোনিস্থিত চন্দ্রের [১১৭] সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং মস্তকস্থ সহস্রার পদ্ম-সংশ্লিষ্ট 'গরলচন্দ্র' বা অমৃত পান করতে হবে। 'গরলচন্দ্র' বা অমৃত দ্বারা দেহ ও মনকে সঞ্জীবিত করে সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্ত হওয়াই নাথযোগীদের কাম্য। তাই গুরু মীননাথের প্রতি গোরক্ষনাথের একান্ত অনুরোধ,—

"মন পবন স্থির কর খেমাইরে কর রাজা।
চারি চন্দ্র ভেদি গুরু সকল কর তাজা।।"[১১৮]

এই 'চন্দ্রসাধন' সম্পর্কে 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

"আকাশের অরুন্ধতি অভয়ারে জানি।
আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানি।"[১১৯]

এখানে 'আকাশের অরুন্ধতি' অর্থে সহস্রার পদ্মস্থিত 'ওঁ' মন্ত্র, 'হস্তী' অর্থে যোগী, 'পাতাল' (পাতালে—পাতাল হইতে) অর্থে মূলাধার সন্নিহিত রসাধার বা শুক্রাধার নির্দেশিত হচ্ছে। হস্তীর শুণ্ডদ্বারা জল-উত্তোলনের ন্যায় যোগী সুষুম্নাবর্ত্মে মূলাধার সন্নিহিত রসাধার থেকে প্রাণায়ামের প্রভাবে রসকে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে সহস্রার পদ্মমূলে অমৃতাধার পূর্ণ করবেন এবং ঐ অমৃতে দেহ ও মন আপ্লুত করে সিদ্ধদেহের অধিকারী হবেন। যোগী মনকে সহস্রার পদ্মে 'ওঁ'-কারে যুক্ত রাখবেন। দেহের সারাংশ রস বা বীর্যকে অক্ষয় করে রক্ষা করা এবং তার দ্বারা সিদ্ধদেহ অর্জন করে অমরত্ব প্রপ্তিই হচ্ছে এই 'চারিচন্দ্র'-সাধনার মূল লক্ষ্য। নাথযোগীদের এই 'চন্দ্রসাধন' তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ প্রক্রিয়া, কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থান এবং শিবশক্তি তত্ত্বের অঙ্গীভূত। নাথসাহিত্যের 'হাড়মালা' নামক গ্রন্থের আলোচনায় এই বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে গোরক্ষনাথ যে উল্টাযোগের উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে তান্ত্রিক যোগক্রিয়ায় পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ নারী-মোহগ্রস্ত মীননাথকে পুনঃ পুনঃ উল্টাযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,—

(১) "উলটি যোগ ধর আপনাকে স্থির কর
নিজ মন্ত্র করহ স্মরণ,
উলটি ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা,
খালে জল ভরিতে বারণ।"[১২০]

(২) "যদি বা সাধিবা গুরু কায়া উলটি ধর যোগ।"[১২১]

নাথযোগীদের এই উল্টাযোগের লক্ষ্যই হচ্ছে দেহের মহারস বা শুক্রক্ষয়কে রোধ করে সিদ্ধদেহ লাভ। উল্টাসাধনে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী তিনটিকে নিজের বশে এনে মহারস বা শুক্রকে উর্ধ্বে উন্নীত করে রক্ষিত করা। তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদ এবং কুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধ্বে উত্থান এই উল্টাযোগ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত। এই যোগ বা সাধনার দ্বারা যোগী আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং সংসারের গতি থেকে এটা বিপরীত মার্গ, এইজন্যই একে উল্টাযোগ বলা হয়।[১২২] মানবদেহে মূলাধার পদ্মে মহাশক্তি বিরাজমানা এবং মস্তকে সহস্রার পদ্মে শিবের অধিষ্ঠান। ষট্‌চক্র বা নবচক্রভেদের দ্বারা শিবশক্তির মিলন সাধনেই যোগী মুক্তিলাভ করেন। এই তত্ত্বই গোরক্ষনাথ আত্মবিস্মৃত গুরু মীননাথের চৈতন্য-উদ্বোধনের জন্য শুনিয়েছেন,—

"শরীর সংযোগে বায়ু কমল শোধন,
ষট্‌চক্র ভেদ গুরু খেলয় গগন।
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা,
বেঙ্কানালে সাধ গুরু না করিহ হেলা।

* * *

বোঝ বোঝ গুরুজ্ঞান তত্ত্ব বোঝ সন্ধি,
রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী।
মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,
হে তত্ত্ব কঁহিয়াছে আপনে গোসঞি।
মন পবন সহিতে এক করি জোড়,
ক্রমে ক্রমে টানি আন মনের ভাণ্ডার।
উলটি ফুটউক ফুল পুন কর ধ্যান,
বুঝ বুঝ আরে বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান।
চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক ধুয়া,
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া।"[১২৩]

উপরি-উদ্ধৃত অংশে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদের কথা বলা হয়েছে। 'কমলশোধন' বা কমল-সাধন ষট্‌চক্র-সাধনেরই নামান্তর। 'বেঙ্কানাল' বা 'বঙ্কনাল' পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্ধ্বে উঠিয়ে এবং রবিশশীকে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে রুদ্ধ করে সহস্রার পদ্মে ধ্যান নিমগ্ন হওয়ার জন্য গোরক্ষনাথ মীননাথকে অনুরোধ করছেন। জীবদেহে ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়ে রসে পরিণত হয় এবং বায়ু ও অগ্নির সাহায্যে এই রস জারিত হয়ে মস্তকে সহস্রার পদ্মের নিম্নভাগে ত্রিকোণাকার যোনিতে অমৃতরূপে সঞ্চিত হয়।[১২৪] সহস্রার থেকে

এই অমৃত ক্ষরিত হয় এবং সূর্যস্বরূপা কুণ্ডলিনী তা' গ্রাস করেন বলেই জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। সুতরাং কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে উত্থিত করলেই অমৃত-প্রবাহ অক্ষয় হয় এবং সেই অমৃত-প্রবাহের রক্ষণের ফলে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই গোরক্ষনাথ বলছেন,—"মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা" অর্থাৎ চন্দ্র বা বীর্য রক্ষিত হয়ে দেহ ভগ্ন হবে না (না টুটিবে কলা)। নাথমতে এই উল্টাসাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে বায়ু সাধনা। উল্টাসাধনে বায়ুর সঙ্গে মন ঊর্ধ্বে সুষুম্নাপথে প্রবেশ করে পরমানন্দের অধিকারী হয়। এইজন্য নাথযোগীরা প্রাণায়াম অভ্যাস করতেন। প্রাণায়ামের প্রভাবে বায়ু ও মনকে একীভূত ক'রে তার সাহায্যে কুণ্ডলিনীর জাগরণে নাথযোগী বাঞ্ছিত অমরত্বের সন্ধান লাভ করেন। উপরি-উদ্ধৃত অংশে গোরক্ষনাথ এই সাধনারই ইঙ্গিত দান করেছেন। কুণ্ডলিনী শক্তি অগ্নিস্বরূপিণী; মূলাধার পদ্মে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে অনল জ্বলে ওঠার ন্যায় অনুভূতি হয়।[১২৫]

কুণ্ডলিনী শক্তির এই জাগরণকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে,—'আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া'। বস্তুতঃ 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে বর্ণিত নাথযোগীদের 'উল্টাযোগ' এবং 'চন্দ্র' বা অমৃতসাধনের দ্বারা অমৃতরক্ষণ ও অমৃত-আস্বাদনে দেহমনের বিলুপ্তি সম্পাদনপূর্বক সিদ্ধদেহ ও অমরত্ব লাভ তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। তন্ত্রমার্গের ভূতশুদ্ধির তত্ত্বই নাথধর্মতত্ত্বের উল্টাসাধনের মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হচ্ছে।

মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত, তিনি সূর্যস্বরূপিনী এবং জীবের কামনা-বাসনার মূল কারণ। তন্ত্রমতে কামরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তিকে মূলাধার থেকে সহস্রার পদ্মে উঠিয়ে শিবের সঙ্গে যুক্ত করলে দিব্য শরীর লাভ হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না।[১২৬] এই তত্ত্বই 'গোরক্ষবিজয়ে' সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গোরক্ষনাথের উক্তিতে,—

> "অধ্যে ঊর্ধ্বে গুরুদেব তুলি ধর কাম।
> শরীর সুন্দর হইব চিকন হইব চাম।।"[১২৭]

কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থানে অমৃতপানের দ্বারা সিদ্ধদেহ-লাভের কথা গোরক্ষনাথের নিম্নোক্ত উক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে,—

> "মুখখানি আল গুরু জিহ্বা খানি ফাল,
> অমর পাটনে জোর গুরুকের হাল।
> উঞ্চ নীঞ্চ ভূমিখানি হংসী তাত হএ,
> যদি হইবা গৃহবাসী সে ভূমি চাষএ।"[১২৮]

গোরক্ষনাথ এখানে 'খেচরী'-মুদ্রা সাধনের দ্বারা অমৃত-পানের ইঙ্গিত দান

করেছেন। এই 'খেচরী'-মুদ্রা তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। 'খেচরী' মুদ্রা-সাধনে সাধক জিহ্বাকে উল্টাইয়া সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজনপূর্বক অমৃত-আস্বাদনে সিদ্ধদেহ লাভ করেন।[১২৯] কুণ্ডলিনী শক্তিই এই মুদ্রা-সাধনে প্রধান অবলম্বন; খেচরী মুদ্রা-সাধনে সাধক কুণ্ডলিনীশক্তিকে বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়ে উত্থিত করে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করেন এবং সহস্রারক্ষরিত অমৃতপানে অক্ষয় সিদ্ধদেহ লাভ করেন।

'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে গোরক্ষনাথ মীননাথকে কায়াসাধনার যে উপদেশ দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে তন্ত্রের 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বটি' পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তান্ত্রিক সাধক যেমন দেহের মধ্যেই সর্বতীর্থ ও সর্বদেবদেবীর অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন, গোরক্ষনাথও তেমনই বলেছেন যে,—

"দেহমধ্যে বারাণসী আর নাই তিথ।"[১৩০]

তন্ত্রশাস্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানকে বারাণসীরূপে যে নির্দেশ করা হয়েছে, সেবিষয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথের আত্ম-চৈতন্য সম্পাদনের জন্য যোগসাধনায় রাত্রির চারি-প্রহরে চৈতন্যের কাজ, বার, মাস প্রভৃতি যে-সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, তা' তন্ত্রোক্ত তত্ত্বেরই পরিচয়বাহী।

"প্রথম প্রহর রাত্রি গুরু আলসিত বড়,
যাহার কারণে নিদ্রা হইয়া যায় দড়।
ইঙ্গিলা-পিঙ্গিলা দুই উজানেতে বাইয়া,
সানন্দে শুনল ধ্বনি চৈতন্য পাইয়া।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কালনিদ্রা ঘোর,
উজানে রসের মাপি যোজ নিরন্তর।
উজান ভাঙ্গিয়া কর আমনেতে মন,
তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি নিদ্রা ঘোর,
তখনে বুঝিতে পারে জ্ঞানের প্রসর।
যেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চএ,
সদ্‌গুরু ভজিলে (গুরু) আত্তমা পরিচএ।
চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিশি অবশেষ,

কর্ম চিন্ত গুরু জাগ হইয়া বিশেষ।
ভেদিয়া দশমী দ্বার খাল জোর ঘর।"[১৩১]

উপরি-উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, রাত্রির প্রথম প্রহরে হৃদয়স্থিত 'অজপা'-ধ্বনিতে ('হংস') চিত্তকে নিবিষ্ট করতে হবে এবং দ্বিতীয় প্রহরে 'আমনেতে' (আ-মন) অর্থাৎ শূন্য-ধ্যানে মগ্ন হতে হবে। দ্বিতীয় প্রহরে নিদ্রা ও আলস্যের ফল সাধনালব্ধ পবনকে হরণ করতে চায় বলেই এই সময় বায়ু-সাধন উচিত নয়। যাতে চৈতন্য ভঙ্গ না হয় এবং 'অজপা'-ধ্বনি থেকে মনের বিচ্যুতি না ঘটে, সেইদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তৃতীয় প্রহরে আত্মসাক্ষাৎকার। এই সময় গভীর নিদ্রাস্বরূপ কাল যোগীকে যাতে বশীভূত করতে না পারে, সেজন্য ব্রহ্মধ্যানে চৈতন্যকে জাগ্রত রাখা কর্তব্য। চতুর্থ প্রহরে বায়ু-সাধনার দ্বারা 'দশমী' দ্বার ভেদ করে অধঃস্থিত রসকে ঊর্ধ্বে 'ত্রিবেণী' (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন স্থান) পর্যন্ত উঠিয়ে অমৃতভাণ্ড পূর্ণ করতে হবে এবং ঐ অমৃত দ্বারা দেহ ও মন আপ্লুত করে অক্ষয় দেহের অধিকারী হতে হবে।

বায়ু-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবহমান বায়ুর গতির শক্তি অনুযায়ী যোগ-সাধনের ইঙ্গিত ও এবং তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কিয়দংশ ডদ্ধৃত হল,—

"শুক্রবারে বহে বারি সুষমনা জান,
গঙ্গা যমুনা দুই ধরয়ে উজান।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর চূড়া,
মধ্য কমল মধ্যে কী হয়ে চোরা।"[১৩২]

অর্থাৎ শুক্রবারে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি সহজসাধ্য হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার মিলনস্থান মূলাধার ও আজ্ঞাপদ্ম;বায়ু ও মনকে কুম্ভক সহযোগে মূলাধার পদ্মে আবদ্ধ করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তন্ত্রে ইড়া নাড়ীকে চন্দ্রস্বরূপ এবং পিঙ্গলা নাড়ীকে সূর্যস্বরূপ বলা হয়েছে। বার প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে।

"পূর্বেত উলএ ভানু পশ্চিমে জ্বলে বাতি।"[১৩৩]

অর্থাৎ দেহের দক্ষিণভাগস্থ পিঙ্গলা নাড়ী সূর্যস্বরূপ এবং বামভাগস্থ ইড়া নাড়ী চন্দ্রস্বরূপ।

"রবিবারে বয়ে বায়ু লইয়া আদ্যমুল,
অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল।

অগ্নিএ পানিএ যদি (না) রাখ গাভুরালি,
নিবি যাইব অগ্নি সব রইআ যাইব ছালি।
সোমবারে বয়ে বায়ু সহজ সঙ্গীত,
শ্রীগোলা নগরে বাদ্য বাজে সুললিত।
ঝনকে ঝনকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি,
ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাচয়ে নাচনী।"[১৩৪]

এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, রবিবারে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুর কাজ প্রবল হয়;এটা উপলব্ধি করে সম্মিলিত বায়ু-প্রবাহকে ঊর্ধ্বে চালিত করে অগ্নিকে সঞ্জীবিত রাখতে হবে। মণিপুরচক্রে অর্থাৎ নাভিপদ্মে রস ও অগ্নির প্রভাব সমপরিমাণ;কিন্তু অগ্নিকেই প্রবল রাখা বিধেয়। 'আদ্যমূল' এর অর্থ রস;রসকে নিয়ে বায়ু ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হলে অগ্নির প্রাধান্য লক্ষণীয়। কিন্তু, যোগাগ্নির সাম্যের জন্য রসের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য;— এটি যোগসাধনার তৃতীয় অবস্থা। যোগসাধনার চতুর্থ অবস্থায় হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে 'হংস' ধ্বনি হয়। সুষুম্নাবর্ত্মে বায়ু অনাহত পদ্মে উত্থিত হলে ঐ ধ্বনি 'সোঽহং'-এ পরিণত হয়। এইভাবে যোগসাধনার প্রসঙ্গে বারতত্ত্বের মধ্য দিয়ে গোরক্ষনাথ মীননাথকে সর্বশেষে বুঝালেন যে, কিভাবে জীবাত্মা 'সোঽহং'-এর পরিবর্তে 'ওঁ'-ধ্বনিতে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে।

তৎপর গোরক্ষনাথ গুরুকে বারমাসের যে সাধনতত্ত্ব বর্ণনা করলেন, তার মধ্য দিয়েও তান্ত্রিক যোগসাধনার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে;যেমন,—

"জ্যৈষ্ঠ মাসেত গুরু ভানু ঘরশান।
সুরমা সাপিনী তোলে কৈলাশ সমান।
অধে ঊর্ধ্বে তুলি ধর কাম মহাবলী।"[১৩৫]

এখানে 'সুরমা সাপিনী' বা 'কাম মহাবলী' অর্থে কুণ্ডলিনী শক্তি, তিনি সূর্যস্বরূপিনী এবং জীবের কামনা-বাসনার হেতু স্বরূপা। নাথধর্ম্মমতে কুণ্ডলিনী শক্তি রসস্বরূপিনী। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে অধঃ থেকে ঊর্ধ্বে অর্থাৎ মূলাধার থেকে সহস্রার পদ্মে উত্থিত করার কথাই উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে, গোরক্ষনাথ বারতত্ত্ব ও মাসতত্ত্বের মধ্য দিয়ে মীননাথকে যোগসাধনার যে ইঙ্গিত দান করেছেন, তার মধ্য দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের ষট্চক্র-সাধন ও কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বই দ্যোতিত হচ্ছে। বস্তুতঃ গোরক্ষনাথ মীননাথকে যে যোগতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন, তা' মূলতঃ তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়া। স্বদেহে শিবশক্তির মিলন-সাধনই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে

গোরক্ষনাথের উপদিষ্ট কায়াসাধনার মধ্যে তন্ত্রের শিবশক্তি-তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। শিবশক্তির মিলন-সাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই হচ্ছে তন্ত্র-সাধনার মূল লক্ষ্য। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে বর্ণিত যোগতত্ত্বেও এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

"উলটি ফুটউক ফুল পুনি কর ধ্যান।
বুঝ বুঝ আরে বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান।।'[১৩৬]

গোরক্ষনাথ কর্তৃক মীননাথের মোহমুক্তির পর মীননাথের যোগসাধনায় ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"মাআ ছাড়ি মীননাথ বসিলেন ধ্যানে,
গুরুর বচনে সব সোহারিয়া মনে।
ব্রহ্মজ্ঞানে যোগপূর্ণ শরীর সকল,
ক্রমে ক্রমে আপনা সব উদ্ধারিল।"[১৩৭]

'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনাতেও তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্বের প্রভাব লক্ষণীয়। এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে যে,—

"প্রথমে আছিলা প্রভু না চিনি আপনা,
যে জন আছিলা সঙ্গে সে কৈল চেতনা।
চৈতন্য পাই দেখে আপনা আকার,
আকার দেখিয়া তান জন্মিল বিকার।
পৃথিবী স্থাপিত যদি কৈলা মন,
শক্তিবিনে কিরূপেতে করিব সৃজন।
* * *
একা কোন জন হএ থাকে মোর পাশ,
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ।"[১৩৮]

উপরি-উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির আদিতে প্রভু স্বয়ং নিজেকে না দেখে অবস্থান করছিলেন;এটা তাঁর তুরীয় বা বিশ্বাতীত অবস্থা। প্রভুর এই অবস্থা তন্ত্র-বর্ণিত ব্রহ্মের সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন অবস্থা অর্থাৎ এই সময় ব্রহ্মের মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণক্ষোভ থাকে না।[১৩৯] সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মযুক্ত মূল প্রকৃতিতে কোন গুণক্ষোভ থাকে না।[১৪০] উদ্ধৃত অংশেও বলা হয়েছে যে, প্রভুর মধ্যে যে জন বা যে শক্তি ছিলেন, তাঁর

দ্বারাই প্রভুর মধ্যে সৃষ্টির বাসনা সঞ্চারিত হল। এরপর প্রভু শক্তিকে ধরে বিদীর্ণ করলেন এবং তাঁর থেকে আকাশ, ক্ষিতি প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হল এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গোরক্ষ, মৎস্যেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও সিদ্ধযোগী, মন্ত্র, দেবতাদের বাসস্থান, পাতাল প্রভৃতির সৃষ্টি হল। নাথ সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে এই তান্ত্রিক সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, শক্তির মধ্যে শিব এবং শিবের মধ্যে শক্তি সর্বদা বিলীন হয়ে থাকেন এবং শিব-শক্তি সহযোগেই সৃষ্টিলীলা সংঘটিত হচ্ছে ("শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা;" 'নির্বাণতন্ত্র', ৪/২৫-২৬)। শক্তিই সৃষ্টিকর্ত্রী;কারণ শক্তির মধ্যে শিব যোগমগ্ন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপে বিরাজিত। তন্ত্রশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমব্রহ্ম বা শিবের সঙ্গে পরমাপ্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই এবং ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই;কিন্তু উভয়ে একীভূত থাকায় কর্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রয়েছে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব না থাকে, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম বা চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি থেকে প্রথমে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম বা চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি থেকে প্রথমে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হয়। আদ্যাশক্তি মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। অনন্তর আদ্যাশক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের আশ্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শক্তি সহযোগেই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করছেন। মহত্তত্ত্ব থেকে পরমাণু পর্যন্ত সমুদায় চরাচর জগৎ, সর্বদেবদেবী প্রভৃতি পরমাপ্রকৃতি বা শক্তি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁর দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। তন্ত্রের এই সৃষ্টি রহস্যই 'গোরক্ষবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'হাড়মালা', 'গোরক্ষসংহিতা' প্রভৃতি নাথসাহিত্য ও নাথধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে।

'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'ও এই তন্ত্রোক্ত সৃষ্টি রহস্যের আভাস পাওয়া যায়।[১৪২] বিশেষতঃ, সৃষ্টি-লীলায় তন্ত্রবর্ণিত শিবশক্তি তত্ত্বটি 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' একটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে অনাদ্যের ঘর্ম হতে দেবী জন্মগ্রহণ করলেন এবং চণ্ডিকা হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম হল।[১৪৩] তারপর অনাদ্য বা নিরঞ্জন দেবী চণ্ডিকার বিবাহ কার সঙ্গে দিবেন, তা' চিন্তা করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষা করবার মানসে শবরূপে জলে ভাসতে ভাসতে একে একে ধ্যানস্থ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট গেলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মৃতরূপী নিরঞ্জনকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করলেন। তারপর তিনি শিবের নিকট গেলে শিব চিন্তা করলেন যে,—

"যারে আমি পূজা পূজি মৃতরূপে সেই বুঝি,
পুষ্প দিল মৃতের চরণে।।
মৃত পূজা পূজে ভোলা, নিরঞ্জন গেল গল্যা,
শিব চন্দন বলে মাখে গায়।
বুঝিয়া শিবের মন, মৃতরূপে নিরঞ্জন,
নিজরূপে দিল পরিচয়।।"[১৪৪]

শিবের এই মৃতরূপী নিরঞ্জনের পূজার মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত শবরূপী শিবের তত্ত্বটিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শবরূপ মহাদেবই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যস্বরূপ পরমব্রহ্ম। তাঁকে আশ্রয় করে ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশীলা ("শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং")[১৪৫]।

যা'হোক মহেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে নিরঞ্জন চণ্ডিকার সঙ্গে মহেশ্বরের বিবাহ দিলেন। কিন্তু এতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ,—

"শিব কৈলে অবিচার পৃথিবীতে কুলাঙ্গার
শিব জননী বিভা করে।"[১৪৬]

চণ্ডিকার সঙ্গে শিবের এই বিবাহের মধ্য দিয়ে তন্ত্রের শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্বই পরিস্ফু ট হয়ে উঠেছে। পরমব্রহ্ম এবং পরমাপ্রকৃতির সহযোগে সৃষ্টিকার্যের জন্য সগুণব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়। শিব মূলতঃ নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ। মহাশক্তির গুণক্ষোভে তিনি সগুণ হন এবং সৃষ্টিকর্মের জন্যই তিনি মহাশক্তিস্বরূপিনী চণ্ডিকার সঙ্গে মিলিত হন।[১৪৭] 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' শিবের সঙ্গে চণ্ডিকার বিবাহের আখ্যানটি 'নির্বাণতন্ত্রে'র প্রথম পটলে বর্ণিত শিবের সঙ্গে কালিকার বিবাহের আখ্যান এবং শিব-শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ নাথসাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির সৃষ্টি-বিবরণে তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। শক্তি বা প্রকৃতিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ,—এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নাথ সাহিত্যের সৃষ্টি বর্ণনাংশে নানারূপে ও ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার জাতীয় জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যে শাক্ত বা তান্ত্রিক সংস্কার মজ্জাগত হয়ে গিয়াছিল, তারই ফলে বাংলার নাথসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণার ছায়াপাত ঘটেছে।

হাড়মালা

আমরা নাথ সাহিত্যের আলোচনায় 'হাড়মালা' গ্রন্থটির উল্লেখ করেছি। নাথধর্মের সাধন-পন্থা ও সাধনতত্ত্ব-বিচারের ক্ষেত্রে 'হাড়মালা' গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। নাথধর্মতত্ত্বের এক পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থটিতে। তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে নাথধর্মের যোগ যে কত গভীর, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হচ্ছে এই গ্রন্থটি।

'গোপীচন্দ্রের গান', 'গোরক্ষবিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই নাথধর্ম-সাধনার চরম লক্ষ্য। শিবশক্তি-তত্ত্বোপলব্ধির মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের তন্ত্র-নির্দেশিত পথই নাথ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছে। 'হাড়মালা' গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহাদেব গৌরীকে অমরত্ব-লাভের উপায় স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দেশ করে বলছেন,—

"শিব বলেন দেবী আমি সাধিতে পারি খগ।[১৪৮]
ব্রহ্মস্থান চিনিলে না থাকে মৃত্যুযোগ।।

*　　*　　*

শিব বলে শুন দেবী কহি যত যোগ।
ব্রহ্মজ্ঞান ভাবিলে না থাকে মৃত্যুরোগ।।"

— হাড়মালা'।[১৪৯]

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেই মৃত্যুকে জয় করা যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞানেই জীবের পরমমুক্তি। উদ্ধৃতাংশে 'ব্রহ্মস্থান' অর্থে মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্ম লক্ষিত হচ্ছে, যেখানে শিবশক্তি পরমানন্দে বিহার করেন। তন্ত্র-সাধক ও যোগী সহস্রার পদ্মেই শিবশক্তির মিলন ঘটিয়ে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

'হাড়মালা' গ্রন্থে নাথগণের আদিদেবতা বা আদ্যপ্রভুর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্ম লক্ষণের ঐক্য রয়েছে। এই গ্রন্থোক্ত নিরঞ্জনের কল্পনায় পরমব্রহ্মের স্বরূপই অভিব্যক্ত হয়েছে।[১৫০]

'হাড়মালা' গ্রন্থে বর্ণিত সাধনতত্ত্বের মূল কথাই হচ্ছে শিবশক্তি-তত্ত্বোপলব্ধির সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন এবং 'ওঁ'-কার তত্ত্বে জ্ঞানলাভ। ওঁ-কার-সাধনে ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে 'হাড়মালা' গ্রন্থের সর্বশেষ কথা। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(১) "ধ্যানের বিবরণ দেবী কহিল তুমারে।
সমাধির যোগ শুন কহিয়ে স্বরূপে।।
মেরুদণ্ড দৃঢ় করি বসিয়া সিদ্ধাসন।
প্রণব জপিয়া নাসা করিবা ধারণ।।
নাসাগ্রে ধ্যান করি রহিবা সাবধানে।
প্রণমিবা নিরঞ্জন করিবা ধেয়ানে।।

* * *

অ উ ম ওংকার অক্ষর বলি তারে।
কণ্ঠ ওষ্ঠ নাসিকা ওংকার তাহারে।।
অনাসাদ্য রূপ সেই ভয় বিবর্জিত।
এহিমতে অক্ষয়ের নাম কহিমা নিশ্চিত।"

— 'হাড়মালা' [১৫১]

(২) "অনাহত শবদ[১৫২] করয়ে সেহি ধ্বনি।
সেহি শব্দের মধ্যে জ্যোতির্ময় আপনি ।।
জ্যোতির্ময় মধ্যে সকল জানিও দেবী মন।
মন ভরে হয় পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন ।।
সেই মন যদি খণ্ডায়ে আপদে।
তবে মন নিবিষ্ট হয নিরঞ্জন পদে ।।"

— 'হাড়মালা' [১৫৩]

যোগ সাধনার দ্বারা সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির অবস্থাই নাথগণের সমাধির দ্বারা নাথনিরঞ্জনত্ব-লাভের মধ্য দিয়ে প্রকটিত।

"সমাধি হইলে যে রূপ লয় মন।
তাহারে জানিও দেবী নাথ নিরঞ্জন।।
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে সৃজন যাহার।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবয়ে যাহারে।
যার যেই কর্ম হয় তিন প্রকারে।।"

—'হাড়মালা'।[১৫৪]

এই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত 'হাড়মালা' গ্রন্থে হর-গৌরীর কথোপকথনের মাধ্যমে

যে সাধন-পন্থা অভিব্যক্ত হয়েছে, তার মূলভিত্তি হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্র। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ তন্ত্রগুলিতে যেমন শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মাধ্যমে তান্ত্রিক সাধনার বহুবিধ পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই 'হাড়মালা' গ্রন্থটিতেও হর-গৌরীর প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নাথধর্মের যে সাধন-পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত তত্ত্ব ও তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'হাড়মালা' গ্রন্থে শিবশক্তি-সহযোগে সৃষ্টিতত্ত্বের যে উল্লেখ করা হয়েছে,[১৫৫] তা' তন্ত্রানুগ ভাবনারই প্রতিবিম্বনমাত্র। 'গোরক্ষবিজয়'-এর আলোচনা প্রসঙ্গেই এই বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'হাড়মালা' গ্রন্থে পঞ্চভূতের উৎপত্তি-লয়, পঞ্চতত্ত্ব এবং পঞ্চীকরণ দ্বারা জীবদেহের গঠনতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তন্ত্র-প্রভাব অনস্বীকার্য। পঞ্চভূতাত্মক এই বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে 'জ্ঞানসঙ্কলিনী' তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে,—

"আকাশাৎ জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।।
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে।।
পঞ্চতত্ত্বাৎভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং।।[১৫৭]

তন্ত্রশাস্ত্রের এই উক্তি 'হাড়মালা' গ্রন্থে অনুরূপভাবেই ধ্বনিত হয়েছে;যথা,—

"আকাশে জন্মিল বায়ু, বায়ু হতে রবি।
রবিতে জন্মিল আপ, আপেতে পৃথিবী।।
পৃথিবী মিশায় জল, রবি শেষে।
রবি নিবাইয়া বায়ু, রহিব আকাশে।।
পঞ্চতত্ত্বে হয় সৃষ্টি পাচে হয় নীর।
পঞ্চেতে অস্তক হয় নিরঞ্জন স্থির।।"[১৫৮]

এরপর ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের বিভিন্ন গুণের দ্বারা জীবের দেহ ও ভাবসমূহ কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে, তার যে বর্ণনা 'হাড়মালা' গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে, তা' তন্ত্রশাস্ত্রেরই অনুরণনমাত্র।

"অস্থি চর্ম মাংস রোম পঞ্চজন।
পৃথিবী হইল পঞ্চশরীর কারণ।।

মল মুত্র-শুক্র রজঃ মজ্জা কহি আর।
আভেতে[১৫৯] হইল পঞ্চ শরীর সঞ্চার।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ক্লান্তি আলস্য অন্তর।
তেজে পঞ্চধরি বইসে শরীর ভিতর।।
ধারণ চালন সঙ্কোচ ক্ষেপণ প্রসারণ।
বায়ু পঞ্চধরি বইসে শরীর কারণ।।
ভয় মোহ ক্রোধ লজ্জা পৈশুন্য অন্তর।
আকাশে হইল পঞ্চশরীর ভিতর।।"

—হাড়মালা।' [১৬০]

উপরি-উদ্ধৃত অংশ 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী'র নিম্নোক্ত অংশেরই যেন অনুবাদমাত্র;যথা,—

"অস্থি চর্ম তথা নাড়ী লোম মাংসস্তথৈব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্তিা।।
মলমূত্রং তথা শুক্র শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ ক্ষান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতঃ।।
বিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ।।
রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ।
এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ।।[১৬১]

'হাড়মালা' গ্রন্থে দেহস্থ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী নির্ণয় প্রসঙ্গটি বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত নাড়ীতত্ত্বেরই বিশ্লেষণমাত্র। তান্ত্রিক সাধন-ক্রমে দেহস্থ নাড়ী-জ্ঞান অপরিহার্য অঙ্গ। নাথধর্মে তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির প্রভাব পড়েছিল বলেই নাথধর্মতত্ত্বের পরিচয়বাহী নাথসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ' বা 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তন্ত্রের মূল কথা। 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'প্রাণতোষিণী তন্ত্র', 'শিবসংহিতা', 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র', 'রুদ্রযামল তন্ত্র', 'তোড়লতন্ত্র' প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে এই পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে'র সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। তন্ত্রে পঞ্চভূতময় শরীরকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

"বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মূলে।"[১৬২]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান সমস্ত পদার্থই দেহের মধ্যে আছে। দেহের মধ্যেই সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, নদনদী, পর্বত, নবগ্রহ, পুণ্যতীর্থাদি, ঋষি, মুনিবর্গ, সর্বদেবদেবী, বিভিন্ন পীঠস্থান ও পীঠদেবতাগণ, আকাশ, জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, চতুর্দশ ভুবন প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় জীবদেহে বর্তমান,—এটাই তন্ত্রশাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত।[১৬৩] 'হাড়মালা' গ্রন্থেও দেহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন পদার্থের অবস্থিতি সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রানুরূপ সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দেহমধ্যে পঞ্চপীঠের স্থান-নির্দেশ প্রসঙ্গে 'হাড়মালা' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে,—

"ষড়চক্র ভেদ দেবী কহিল তুমারে।
দেহমধ্যে পঞ্চপীঠ শুন কহি তারে।।
মহাপীঠ উজিয়াল আর জলন্ধর।
কামরূপ পূর্ণগিরি শ্রীহট্ট কহি আর।।
এই পঞ্চপীঠ বৈসয়ে পঞ্চস্থানে।
মন দিয়া সেইকথা শুন সাবধানে।।
শক্তি নাভিদ্বার মধ্যে পীঠ উজিয়াল।
নাভির মধ্যত আছে জলন্ধরের স্থান।।
কামরূপের উপরে হৃদয়ে পূর্ণগিরি।
শ্রীহাট পীঠ আছে তথির উপরি।।
এই পঞ্চপীঠ দেবী কহিনু স্থূলরূপে।
ভ্রূমধ্যে বিশ্বরূপী পূর্ণাক্ষ পীঠ আছে।
উজিয়াল পীঠ আছে নাসিকার দ্বারে।।
কামাখ্যা পীঠ আছে সহস্রদলে।
গুপ্তরূপে তিনপীঠ জানিও স্বরূপে।।
মূলাধার আদি করি কমল সহস্রদল।
মেরুদণ্ড জুড়িয়া আছে এ সকল।"[১৬৪]

দেহমধ্যে বিভিন্ন পীঠস্থানের নির্দেশ-প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রভাব 'হাড়মালা' গ্রন্থের উপরি-উদ্ধৃত অংশে পরিলক্ষিত হয়; যথা,—

"মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং প্রিয়ে।
পূর্ণগিরিং তথা ভাগে উড্ডীয়ানং তদূর্ধ্বকে।।
বারাণসী ভ্রূবার্মধ্যে জ্বলন্তী লোচনত্রয়ে।
মায়াবতী মুখোবৃত্তে কণ্ঠে চাষ্টপুরী তথা।।

নাভিমূলে মহেশানি ! অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে।।"

—'তোড়লতন্ত্র', ৭/৩১-৩৩।

দেহের বিভিন্নস্থানে সর্বদেবদেবী, চতুর্দশ, ভুবন ইত্যাদির অধিষ্ঠান সম্পর্কে 'হাড়মালা'য় যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার কিয়ংদশ নিম্নে উদ্ধৃত হল,—

"শিব বলে শুন দেবী বচন আমার।
যেই স্থানে বৈসে যেই শরীর-মাঝার।।
নাভিতে বৈসয়ে ব্রহ্মা হৃদয়ে শ্রীহরি।
বিন্দুরূপে বৈসে ব্রহ্মা মনরূপে হরি।।
বায়ুরূপে শিবদেব দেহে অধিকারী।
রজোভাবে ব্রহ্মা সত্ত্বগুণে হরি।।
তনুরূপে শিবদেও জগৎ সংহারী।"[১৬৫]

* * *

"বামচক্ষুতে জান শিবলোক থাকে।
মাথাতে ব্রহ্মালোক জানিয় কৌতুক।।
শিবশক্তি সেইস্থানে করয়ে কৌতুক।
নির্গুণ প্রতিঘটে জান পরম স্বরূপ।।" [১৬৬]

* * *

"পদ পাতাল বিতল পাদ উপর।
সুতল পাতাল সন্ধি জঙ্ঘি মহাদল।।
উত্তর দিকে চন্দ্রলোক ঈশানে বৈসে তল।
জানু হইতে উপর উরুতে অতল।।"[১৬৭]

* * *

"গোলক নাভিদেশ দক্ষিণে ভবলোক।
তপলোক কণ্ঠমধ্যে সাথে সত্যলোক।।
কটির উপরে ব্রহ্মাণ্ড অধেতে পাতাল।
উর্দ্ধমুখ হেটমাথা শরীর রুদ্ধাকার।।

রবিশশি দুইজন বৈসে দুই স্থানে।
সুধা বরিষে চান্দে না করে ভক্ষণে।।"[১৬৮]

* * *

"নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, হৃদয়ে শ্রীহরি।
শীরে শিব, বৈসে জ্যোতির্ময় ধরি।।
বিন্দুরূপে বৈসে ব্রহ্মা মনরূপে হরি।
বায়ুরূপে বৈসে সে যে দেব অধিকারী।।"[১৬৯]

তন্ত্রোক্ত ধারণার অনুসরণ করেই[১৭০] এখানে দেহমধ্যে সমস্ত দেবদেবী ও ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষতঃ শরীরস্থ চতুর্দশ ভুবনের অবস্থিতির উপরি-উদ্ধৃতি বর্ণনার সঙ্গে 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী'র নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি তুলনীয়,—

"পাদাধস্তুতলং বিদ্যাত্তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
জানুনোঃ সুতলঞ্চৈব তলঞ্চ সন্ধিরন্ধ্রকে।
তলাতলং গুল্‌ফমধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্‌।
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্বুধঃ।
ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি।
স্বর্লোকো কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি।
জনলোকস্তধূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকোললাটকে।
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দশ।।"

'হাড়মালা'র উদ্ধৃতাংশ 'নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড' কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, সুষুম্না নাড়ীর মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। 'শীরে শিব' অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মে শিবের অধিষ্ঠান।

ষট্‌চক্রভেদই তন্ত্র-সাধনার মূলভিত্তি। 'হাড়মালা' গ্রন্থে এই ষট্‌চক্রভেদের তন্ত্রানুমোদিত এক দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই বর্ণনার কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল,—

"শঙ্কর বুলেন দেবী শুন সাবধানে।
ষড়চক্রভেদ কথা কহি তব স্থানে।।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর।
অনাহত বিশুদ্ধ আর আদ্য চক্রমূল।।

এই ছয়পদ্ম বৈসয়ে স্থানে স্থান।
বিস্তারিয়া কহি দেবী অপূর্ব কথন।।
গুদমূলে মূলাধার অরুণের বর্ণ।
বাসান্তবর্ণ চারিদলের লিখন।।
এই চারিদলে চারি যোগিনীর স্থিতি।
ডাকিনী ব্যাকিনী আর রামা ইচ্ছামতী।।

* * *

লিঙ্গমূলে অধিষ্ঠান পীতবর্ণ তার।
শরতের চন্দ্র যেন তেনই আকার।।
ব আ লিল (নীল) বর্ণে অক্ষর ছয় দলে।
ছয়ভাগ যোগিনী আছয়ে কুতূহলে।।

* * *

নাভিমধ্যে মণিপুর পদ্ম নীলবর্ণ।
উ আদি শকারান্ত দশদলে লিখন।।
দশদলে যোগিনী বৈসয়ে দশদলে।
ডাকিনীর সর্বদ্বার আছয়ে বিরলে।।

* * *

হৃদিপদ্ম অনাহত সিদ্ধবরুণ।
বারদলের ঠকরান্ত তাহাতে লিখন ॥

* * *

কণ্ঠমধ্যে বিশুদ্ধ চক্রমূল আকার।
সূক্ষ্ম দলে নায়িকা বৈসয়ে তাহার।।

* * *

ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র জানি বর্ণ তার।
শরৎকালের চন্দ্র তেনই আকার।।
হং সঃ দুই অক্ষর বলয়ে দুই দলে।
এই দুই অক্ষর বৈসয়ে ভালে দলে।।
দুই দলে বৈসয়ে তবে দুইত নায়িকা।
মহাকালী মহালক্ষ্মী দুই যে নায়িকা।।

ষড়চক্র উপরে আছে সহস্রদল।
তার বিবরণ দেবী শুনহ সকল।।
বিকশিত জ্যোতির্ময় নানারূপ ধরে।
নানারূপে নানাধ্বনি তার মধ্যে করে।।
শিব ঈশ্বর তার উমা সকতি।
সহস্রদলের মধ্যে করয়ে বসতি।।
পরমাত্মা নিরঞ্জন সেই নিরকার।
সূক্ষ্ম হৈয়া তথা করয়ে বিহার।।
জ্যেতির্ময় রূপে সেই বৈসে পদ্মমাঝে।
সর্ববর্ণময় সেই সর্বদেব পূজে।।"[১৭২]

'মহানির্বাণতন্ত্র', 'রুদ্রযামলতন্ত্র', 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'শিবসংহিতা', 'নিগমলতাতন্ত্র', 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী', 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' প্রভৃতি গ্রন্থে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্র বা পদ্ম এবং মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মের দলসংখ্যা, পদ্মে অধিষ্ঠিত দেবদেবী ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, 'হাড়মালা' গ্রন্থের ষট্‌চক্র-বর্ণনা তারই এক উজ্জ্বল তান্ত্রিক ভাষ্যমাত্র। তন্ত্রোক্ত নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি অনুধাবন করলেই 'হাড়মালা'র বর্ণনার সঙ্গে তন্ত্রের ঐক্য পরিলক্ষিত হবে।

(১) "সুষুম্নাগ্রন্থিসংস্থানি ষট্‌পদ্মানি যথাক্রমাৎ।
আধারাখ্যং মূলচক্রমতিরক্তং চতুর্দলম্।
বাসান্তবর্গসংযুক্তং রক্তবর্ণং মনোহরম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী।"

—'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী', ৪র্থ উল্লাস।

(২) "লিঙ্গমূলে মহাপদ্মে স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়দলম্।
বাদিলান্তার্ণসংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূরকম্।
ডাদিফান্তান্বিতদলৈররুণৈর্দশভির্যুতম্।।"

—'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী,' ৪র্থ উল্লাস।

(৩) "হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতম্।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতম্।।"

—'শিবসংহিতা' ৫/৮৩।

(৪) "তদূর্দ্ধে তু বিশুদ্ধাখ্যাং দল ষোড়শপঙ্কজং।
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মানাধিষ্ঠিতঃ পরং।।"
—'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।

(৫) "সহস্রার শিবপুরং সুখদুঃখবিবর্জিতং।
সর্বতোংলঙ্কৃতৌর্দিব্যৈনিত্যপুষ্পফলৈদ্রুমৈঃ।।"
—'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী', ৪র্থ উল্লাস।

এইভাবে দেখা যায় যে, 'হাড়মালা' গ্রন্থে ষট্চক্রের বর্ণনা তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব বা দেহস্থিত বিভিন্ন চক্র বা পদ্মে বিভিন্ন শক্তির অধিষ্ঠান 'হাড়মালা' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছে।

"উর্দ্ধশক্তি বৈসে কণ্ঠে অধঃশক্তি মূলে।
মধ্যে শক্তি বইসেয়ে নাভিতে কুতূহলে।।
কণ্ঠ মধ্যে চান্দ নাভিতে পবন।"[১৭৩]

এখানে 'উর্দ্ধশক্তি বৈসে কণ্ঠে' অর্থে কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্রে শাকিনী নাম্নী শক্তির [১৭৪] অধিষ্ঠান এবং 'অধঃশক্তি মূলে' অর্থে মূলাধার পদ্মে ভৈরবী দেবী[১৭৫] বা কুণ্ডলিনী শক্তির[১৭৬] অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। তন্ত্রমতে জীবের কামনা-বাসনার হেতুস্বরূপা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার চক্র থেকে সহস্রার পদ্মে উত্থিত করলে পুনর্জন্ম রহিত হয়।[১৭৭] 'মধ্যে শক্তি বইসেয়ে নাভিতে কুতূহলে' অর্থে নাভিপদ্মে বা মণিপুর চক্রে লাকিনী শক্তির অধিষ্ঠানকে[১৭৮] নির্দেশ করা হয়েছে। 'কণ্ঠ মধ্যে চান্দ' অর্থাৎ প্রাণ এবং 'নাভিতে পবন' অর্থাৎ অপান—এই দুই প্রধান বায়ু রয়েছে। এই দুই বায়ু চন্দ্র ও সূর্যস্বরূপ। নাথধর্ম সাধনার প্রাণ-অপান বায়ুর বা চন্দ্র-সূর্যের মিলনের দ্বারা অমরত্বলাভের মধ্য দিয়ে তন্ত্র-সাধনার শিব-শক্তির মিলনতত্ত্বই প্রকটিত হয়েছে।

তন্ত্রোক্ত শিবশক্তির মিলন-সাধনের দ্বারা সংসার-সাগর অতিক্রমণের কথা 'হাড়মালা' গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে,—

"পাতালেতে বৈসে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে শঙ্কর।
অহঙ্কার বৈসে কাল জীবন স্বরূপ।।
চঞ্চল চিত্তে শক্তি শিবহীন মনে।
শিবশক্তি এক করি লয় যার মনে।।

সংসার সাগর পার হয় সেইজনে।
নিশ্চয় জানিও দেবী শুন সাবধানে।।"[১৭৯]

'পাতালেতে বৈসে শক্তি' অর্থাৎ মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি এবং 'ব্রহ্মাণ্ডে শঙ্কর' অর্থাৎ মস্তকে সহস্রার পদ্মে শিব বিরাজিত রয়েছেন।[১৮০] কুণ্ডলিনী শক্তি যেমন জীবের মোক্ষদাত্রী, তেমনই আবার জীবের সংসার-বন্ধনের এবং সর্ববিধ কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার কারণ।[১৮১] কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবের জীবভাব ও অহংভাবের কারণ;মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রিত অবস্থাই জীবের অজ্ঞানতার হেতু এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণেই জীবের মুক্তিলাভ বা শিবত্ব-প্রাপ্তি। তান্ত্রিক সাধক মূলাধার পদ্ম থেকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্নাবর্ত্মে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে সহস্রার পদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করে অমৃতাভিষিক্ত হন এবং পুনরায় কুণ্ডলিনীকেমূলাধার পদ্মে আনয়ন করেন। তান্ত্রিক সাধকের শিবশক্তির এই পুনঃ পুনঃ মিলন-সংঘটনকে তন্ত্রে সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে অনবদ্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।।"

—'কুলার্নবতন্ত্র', ৭/১০০।

শিবশক্তির মিলনে জীবের জীবভাব দূরীভূত হয়ে শিবত্বলাভ বা মুক্তিলাভ ঘটে। নাথধর্মাবলম্বীদের সাধনাও শিব-শক্তির মিলনের সাধনা। শিব-শক্তির একত্ব সংসাধনে দেহস্থিত সুষুম্নাবর্ত্মে অমৃতপ্রবাহ অক্ষয় হয় এবং তার ফলে দেহ অক্ষয় ও চিন্ময় হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য,—

"Secretion of nectar from the moon is associated with rousing of the Kundalini Sakti and it is held that rousing of Sakti in the Sahasrara is instrumental to the trickling down of the nectar and sometimes Sakti herself is depicted as the drinker of the nectar. Drinking of wine and eating of meat which are indispensible to Tantrik Sadhaka are explained by the Natha yogins as the drinking of nector from the moon and turning the tongue backwards to the hallow above."[১৮২] এই মন্তব্যের দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে নাথধর্মের এক সুগভীর সংযোগ রয়েছে। 'হাড়মালা' গ্রন্থে বর্ণিত 'চন্দ্রসাধন'[১৮৩] তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্বেরই অঙ্গীভূত।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নাথধর্মের প্রধান কথাই 'কায়াসাধন'। এই কায়া-সাধনের লক্ষ্য হচ্ছে সিদ্ধদেহে জীবন্মুক্তি এবং দিব্যদেহে পরামুক্তি লাভ।[১৮৪] নাথধর্মের বায়ুসাধন,

বিন্দু-ধারণ ও চিত্তস্থৈর্যও সিদ্ধদেহ-লাভের প্রধান উপায়। আমাদের দেহের মূল উপাদান বায়ু ও রস;—এই বায়ু ও রসের সাধনার দ্বারাই নাথযোগীরা বিভিন্ন কামনা-বাসনাময় অশুদ্ধ দেহকে বিশুদ্ধ ও পক্ক যোগদেহে পরিণত করেন। নাথযোগীরা প্রাণায়ামাদি তান্ত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীয়দেহের রসকে সহস্রারস্থিত অমৃতের সঙ্গে যুক্ত করে দেহের ক্ষয় নিবারণ করেন এবং মিলিত অমৃত প্রবাহের দ্বারা দেহ ও মন অভিসিঞ্চিত করে অক্ষয় সিদ্ধদেহ লাভ করেন। এই বিষয়ে 'হাড়মালা' গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য;—

"বায়ু রাখে বিন্দু[১৮৫] দেবী বিন্দু রাখে বাই।[১৮৬]
দুইয়ে এক হইলে বাড়ে পরমাঞি ॥
উর্দ্ধমুখে যায় বায়ু মাথে করি চন্দ্র।[১৮৭]
চন্দ্র[১৮৮] ভেদি যায় যথা আকাশের চন্দ্র।।[১৮৯]
চন্দ্র ভেদের[১৯০] দেবী শুন কহি ফল।
এক পদ্ম ভেদিলে জিয়ে সহস্র বৎসর।।
ক্রমে ক্রমে ছয় পদ্ম ভেদিবারে পারে।
মরণ নাহিক তার সংসার ভিতর।।[১৯১]

উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বায়ুসাধন বা প্রাণায়ামের ফলে বিন্দুস্থৈর্য লাভ হয়। প্রাণায়ামে বায়ু বশীভূত হলেই দেহের 'রস' বা 'শুক্র' স্থির হয় এবং দেহের ক্ষয় রোধ হয়। ষট্‌চক্র ভেদ করে বায়ু মূলাধার সন্নিহিত রসকে উর্দ্ধমুখে নিয়ে যায় এবং মস্তকের সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থিত অমৃতাধারে সঞ্চিত করে। সেই অমৃতধারায় দেহ-মন আপ্লুত হলে অক্ষয় দিব্যদেহের অধিকারী হওয়া যায়। এই সাধনায় দেহস্থ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্র বা পদ্মের জ্ঞান অপরিহার্য। ষট্‌চক্রভেদ হলেই সাধকের অমরত্ব-লাভ ঘটে।

অতএব, 'হাড়মালা'য় বর্ণিত সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিক যৌগিক সাধন-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। কারণ, প্রাণায়াম, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও ষট্‌চক্রভেদ 'চন্দ্রসাধন' বা 'রস-সাধনে'র প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। তন্ত্র-সাধনায় প্রাণায়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণায়ামের প্রভাবেই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে ষট্‌চক্রভেদ হয়। এ'প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশ সবিশেষ স্মরণীয়,—"আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে যোজয়েন্মনঃ। গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তামাকুঞ্চ্য প্রবুদ্ধয়েৎ।।"[১৯২] 'মহানির্বানতন্ত্র' (৫/১৯-১০৪), 'গৌতমীয়তন্ত্র' (৯ম ও ৩৪শ অধ্যায়), 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী' (৪র্থ উল্লাস), 'শিবসংহিতা' (৫ পটল) প্রভৃতি সমস্ত

ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ভূতশুদ্ধি (দেহশুদ্ধি) প্রভৃতির মূল অবলম্বন স্বরূপ প্রাণায়াম সাধনের উল্লেখ করা হয়েছে। 'হাড়মালা' গ্রন্থেও এই প্রাণায়াম বা বায়ু সাধনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে ষট্‌চক্রাদি ভেদের কথা বলা হয়েছে।

"বাম নাসা পূর্ণ বায়ু করিবে পুরক।
প্রাণায়াম করিয়া বায়ু করিব কুম্ভক।।
মূলাধার আকুঞ্জন চলিব পবন।
দক্ষিণ নাসাগ্রে বায়ু করিবে রেচন।।

* * *

ক্রমে ক্রমে বায়ু শতেক পুরে যদি।
অধোবায়ু ঊর্ধ্বে যায় চক্র ভেদি ভেদি।।
পুরক কুম্ভক রেচক বাড়ে দিনে দিনে।
চিরজীবী হয় দেবী দীর্ঘ প্রাণায়ামে।।
যত ধ্যান যোগ দেবী কহিল তোমারে।
বায়ু দিনে যোগ সিদ্ধি না হয় শরীরে।।
বায়ু মন এক করি করিবা সাধন।
হংসরূপে বায়ুমন্ত্র করিয়া ধ্যেয়ান।।
অধঃবায়ু সাধিবা যে ঊর্ধ্বে পবন।
শূন্যেতে নিরবধি করিবা আকুঞ্জন।।
নাভি মধ্যে প্রাণবায়ু করিবা চালন।
তবে প্রাণ আপনে করিবা দরশন।।
হৃদি স্থানে প্রাণ আপন উদুখলে।
দুই এক সম্বাদে বায়ু যদি সে চলে।।
দুই বায়ু মিলি হয় একাকার।
এহি সবে বায়ু হয় হংস আকার।।
অধঃবায়ু এড়িবা যে সাধিবা পুরণ।
মূলাধার নিরবধি করিবা আকুঞ্জন।।
চালিতে চালিতে বায়ু দুই প্রচণ্ড হইয়া।
সুষুম্নার পথে চলে চক্র ভেদিয়া।।"[১৯৩]

প্রাণায়ামের ফলে প্রাণ ও অপান বায়ুর সম্মিলিত প্রবাহ সুষুম্না নাড়ীর মুখ উন্মুক্ত

করে সুষুম্না-বিবরস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ইত্যাদি ষট্‌চক্রভেদপূর্বক সহস্রারে প্রবেশ করে। কিন্তু সুষুম্না নাড়ীর মুখে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে সুষুম্না নাড়ীতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। এই জন্য কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করতে হয় এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণেই ষট্‌চক্রভেদ সম্ভব হয়।

কুণ্ডলিনীর জাগরণের জন্য অন্যান্য সাধনার সঙ্গে বিভিন্ন মুদ্রাভ্যাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৯৪] নাথধর্মেও তন্ত্রানুমোদিত মহামুদ্রা, যোনিমুদ্রা, খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন মুদ্রাসাধন প্রচলিত আছে। 'হাড়মালা' গ্রন্থে বর্ণিত বায়ুসাধন, চন্দ্রসাধনের মূলকথাও হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ এবং ষট্‌চক্রভেদ। প্রাণায়ামের প্রভাবে দেহস্থ বায়ু ও মনকে একীভূত করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হয় এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণেই নাথযোগী ঈপ্সিত অমরত্বের সন্ধান লাভ করে। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ও চিত্তকে বশীভূত করে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ এবং সেই শক্তিকে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত পথে ষট্‌চক্রভেদপূর্বক মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মে পরমাত্মাস্বরূপ পরমশিবের সঙ্গে মিলন সাধনের তন্ত্রোক্ত তত্ত্বই 'হাড়মালা' গ্রন্থের বায়ুসাধন, চন্দ্র সাধন ইত্যাদির[১৯৫] মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুতঃ, নাথধর্মের 'চন্দ্রসাধনে' (রস-সাধন) অক্ষয় সিদ্ধদেহ লাভ তান্ত্রিক যৌগিক সাধনারই অঙ্গীভূত।

'হাড়মালা' গ্রন্থের বায়ুসাধনাদির প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত অংশে 'হংস' মন্ত্র ধ্যান ও জপের উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থের ষট্‌চক্রবর্ণনা-অংশে 'হংস' মন্ত্র সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যে,—

> "হুংকারে নিঃসরে বায়ু স-কারে প্রবেশে।
> হংস মন্ত্র জীবে, জপে অহর্নিশে।।
> অজপা গায়ত্র সেই শুনহ পার্বতী।
> হংস বায়ু সাধনে শীঘ্র হয় মুকতি।।"[১৯৬]

এই 'হংস' মন্ত্র বা 'অজপা' মন্ত্র যে তন্ত্রোক্ত সাধন প্রক্রিয়ার এক প্রধান অঙ্গ এবং এই মন্ত্রের সঙ্গে কুণ্ডলিনী শক্তির সম্পর্ক যে নিগূঢ়, তা' গোপীচাঁদের গান-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'হংস' বা 'অজপা' মন্ত্রজপের দ্বারা সাধক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হন। এই 'হংস'-ই জীবের জীবাত্মা। মূলাধার থেকে 'হংস' শব্দ উত্থিত হয়ে 'অনাহত' পদ্মে ধ্বনিত হয়। বায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'অনাহত' থেকে 'হংস' নাসিকা দিয়ে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বের হচ্ছে। 'হংস'-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শিবশক্তিতত্ত্বই প্রতিপাদিত হচ্ছে। 'হংস' মন্ত্রের সাধনে কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ ইত্যাদি তান্ত্রিক যৌগিক ক্রিয়া অপরিহার্য।[১৯৭] 'হাড়মালা' গ্রন্থে এই 'হংস' মন্ত্র ধ্যান ও সাধন-প্রসঙ্গ বর্ণনার পর 'ওঁ'-

কার মন্ত্র-সাধন এবং ব্রহ্মত্ব-লাভের পথ নির্দেশিত হয়েছে।[১৯৮] এই 'ওঁ'-কার সাধনের দ্বারা সাধকের শিবশক্তিতত্ত্বোপলব্ধি ঘটে। 'ওঁ'-কার শিবশক্তি-সমন্বিত পরব্রহ্মের প্রতিপাদক।[১৯৯]

এইভাবে দেখা যায় যে, 'হাড়মালা' গ্রন্থটিতে নাথধর্মের বায়ুসাধন, চন্দ্রসাধন ও চিত্তসংযমের দ্বারা সিদ্ধদেহলাভে অমরত্ব-প্রাপ্তি এবং 'ওঙ্কার'-সাধনে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যে সাধন-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তা মূলতঃ তন্ত্রোক্ত সাধন প্রক্রিয়ারই দ্যোতক। নাথ সাহিত্যের এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের প্রভাব সুপরিস্ফুট।

প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী মহাশয় 'নাথধর্ম ও সাহিত্য' গ্রন্থে নাথসাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ 'হাড়মালা' ব্যতীত 'নিগমসপ্তক' ও যোগশঙ্করের 'কালান্ত বিচার' নামক অপর যে দুইটি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেই গ্রন্থ দুটিও তন্ত্রোক্ত সাধনতত্ত্বেরই ভাষ্যস্বরূপ।[২০০] কারণ, এই দুইটি গ্রন্থে তন্ত্রের 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব', নাড়ীতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, শিবশক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

পাদটীকা

১. কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলকাতা, ১৯৫০; পৃঃ ১০।
২. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের কথা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩;পৃঃ ১৬৪।
৩. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'মীনচেতনের কবি', ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্, ১৯৯৫।
৪. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ের কবি', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১৭।
৫. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খাবিজয় গ্রন্থের কবি', বিশ্বভারতী, ১৯৪১।
৬. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, কলকাতা, ১৯৬৯; পৃঃ ২২৭।
৭. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩;পৃঃ ১৬৪।
৮. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরাধ, কলকাতা, ১৯৬৯; পৃঃ ২২৭।
৯. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'নাথধর্ম ও সাহিত্য', আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ১৯৫৫।
১০. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', প্রস্তাবনা—ণ.—থ.।

১১. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', প্রস্তাবনা—V.।

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৬ ; পৃ: ৩৫৮।

১৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮ ; পৃ: ১৬।

১৪. P.C. Bagchi, 'Religion' (*History of Bengal*—Dhaka University), I, Chap. XIII ; Page-423.

১৫. S.K.Dey, *'Sanskrit Literature'* (History of Bengal—Dhaka University), I, Chap. XI, Pages 338-39.

১৬. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম সংস্করণ ; পৃ: ২৯-৪২।

১৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ঢাকা, ১৯৫৩ ; পৃ: ১৭।

১৮. S.B. Dasgupta, 'Obscure Religious cults as background of Bengali Literature', Calcutta, 1946 ; Page-226.

১৯. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭।

২০. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮।

২১. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮৯।

২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', কলকাতা, ১৩৬৪ ; পৃ: ২৬১-২৬২।

২৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৬২।

২৪. S.B. Dasgupta, ibid, Page-220.

২৫. কল্যাণীমল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১।

২৬. "We should say that the final aim of the Nath Siddhas was the attainment of Sivahood in and through the attainment of immortality, and the means of attaining it was primarily Hatha-yoga."—S.B.Dasgupta, ibid., Page-250.

২৭. কল্যাণীমল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৬৪।

২৮. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'গোর্খাবিজয়', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৬ ; ভূমিকা।

২৯. গোপীনাথ কবিরাজ, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম', উত্তরা, কার্তিক, ১৩৩৪।

৩০. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৬৫।

৩১. "পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয় বীরভাবকং।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ।।"

—'রুদ্রযামলতন্ত্র', ৬ষ্ঠ পটল।

৩২. "বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবংস্মৃতং।
সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্য সৎ কৌলমুচ্যতে।"
—'বিশ্বসারতন্ত্র', ২৪ পটল।
৩৩. "Kaulajnannirnaya' (কৌলজ্ঞান নির্ণয়), P.C. Bagchi edition, Metropolitan printing and publishing house, Calcutta.
৩৪. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৬৭।
৩৫. 'মহানির্বাণতন্ত্র', চতুর্থ ও চতুর্দশ উল্লাস।
৩৬. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৬৭।
৩৭. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৪।৩৪।
৩৮. গুপ্তযুগে লিখিত 'কুব্জিকাতন্ত্রে'র একটি পাণ্ডুলিপি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। দ্রষ্টব্য : Chintaharan Chakravorty, 'Tantras, Studies on their Religion and Literature, Calcutta, 1972, page-20.
৩৯. 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', ৪।৩৭।
৪০. 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংহিতা', ৪।২৪।
৪১. "বিদ্যাবলেন যঃ কশ্চিদাগমার্থং বিচারয়েৎ।
পরান্ দিশতি ধর্মার্থং স পচেন্নরকে ধ্রুবম্।।"
—'ভৈরবডামরতন্ত্র', উত্তরভাগ।
৪২. 'কুলার্ণবতন্ত্র', ১২। ১৩।
৪৩. 'কুলার্ণবতন্ত্র', ১৩। ৫৪।
৪৪. গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', সরস্বতী ভবন, কাশী ; পৃ: ৩২।
৪৫. 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', ৫। ৮।
৪৬. "ব্রহ্মাণ্ডং বৈ শরীরস্তু সর্বেষাং প্রাণধারিণাম্।
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ৬।৪০।
৪৭. 'শিবসংহিতা', ২।১-৪।
৪৮. 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ', ৩।২।
৪৯. 'গোরক্ষসংহিতা', ৪।১৮৩-১৮৪।
৫০. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৫১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৬২।
৫২. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পরিচায়িকা, পৃ: ৮৬।
৫৩. এই 'নবচক্রসাধন' তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে এই নবচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে 'প্রাণতোষিণী' নামক তন্ত্রগ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৫৪. "স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং স্বয়ং তাবত্তথা ভবেৎ।"
—'তন্ত্রসার', পৃ: ১০৫৪।
৫৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'গোপীচন্দ্রের গান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৯ ; পৃ: ৩৩৬।
৫৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩৯।
৫৭. ঐ ঐ পৃ: ৩৫৯।
৫৮. ঐ ঐ পৃ: ৩৭৭।
৫৯. ঐ ঐ পৃ: ৪২৮।
৬০. 'তন্ত্রসার', টিপ্পনী, পৃ: ৪।
৬১. ঐ ঐ পৃ: ৩।
৬২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১।
৬৩. "রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সনের সনে।।"
—বৃন্দাবন দাসের ' চৈতন্যভাগবত',
আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়, বসুমতী সংস্করণ।
৬৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', টীকা-টিপ্পনী, পৃ: ৪৩২।
৬৫. ঐ, ঐ, ঐ, পৃ: ৫।
৬৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৫।
৬৭. 'বলিদান' তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ এবং 'মঙ্গলবার' তন্ত্রোক্ত সাধনা ও ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে সবিশেষ ফলপ্রদ। এ' বিষয়ে 'রুদ্রযামলতন্ত্র', 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'শ্যামারহস্য', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে বিশেষ বিবরণ আছে।
৬৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১২, ১৩।
৬৯. ঐ, ঐ, পৃ: ১৩।
৭০. 'গায়ত্রীতন্ত্র', ৩য় পটল ; ' গৌতমীয়তমতন্ত্র', ৩৪ অধ্যায় ; 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫ম উল্লাস ; 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী', ৪র্থ উল্লাস ; প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৭১. তন্ত্রসার, পৃ: ২০০৭-২০০৮।
৭২. তন্ত্রসার, পৃ: ৩৪০, ৩৪২ (টিপ্পনী)।
৭৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ৩৩৮।
৭৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৪১।
৭৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৪৩।
৭৬. এই 'আড়াই অক্ষর' জ্ঞান হচ্ছে 'হংস' মন্ত্র বা অজপামন্ত্র।
৭৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ২৯৩।
৭৮. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৭৭।

৭৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২০।
৮০. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২১।
৮১. স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, 'তান্ত্রিকগুরু', আসাম মারস্বতমঠ, ১৩২৩ ; পৃঃ ১৫৫-১৫৯।
৮২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ৫১-৫২।
৮৩. ঐ, ঐ, পৃঃ ২৭৬-২৭৭।
৮৪. 'মহানির্বাণতন্ত্র',—(১।৩৭, ৩৮, ৪০, ৪২), (৪।৫০, ৫১, ৫২)।
৮৫. দেহরূপ তরীর প্রাণ ও অপানবায়ু।
৮৬. ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পঞ্চতত্ত্ব।
৮৭. গুরু।
৮৮. প্রাণ ও অপানসহ 'হংস' বা জীবাত্মাকে।
৮৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৮৭।
৯০. নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'সাধনকল্পলতিকা', কলকাতা, ১৩২১ ;পৃঃ ৮৭।
৯১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৫৯-৬১।
৯২. 'শিবসংহিতা', ৫।১০০, ১৩৩।
৯৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৫৪।
৯৪. 'শিবসংহিতা', ৪র্থ ও ৫ম পটল।
৯৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৪২১।
৯৬. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২২-৪২৪।
৯৭. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২৩।
৯৮. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২৩-৪২৪।
৯৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ২৭২।
১০০. ঐ, ঐ, পৃঃ ২৯১।
১০১. ঐ, ঐ, পৃঃ ৩০১।
১০২. ঐ, ঐ, পৃঃ ৩১২।
১০৩. ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৯৮।
১০৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ৩৯৯।
১০৫. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪১৪।
১০৬. 'কামাখ্যাতন্ত্র', 'কুলার্ণবতন্ত্র', 'যোগিনীতন্ত্র', 'গুরুতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
১০৭. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ৫৮।
১০৮. 'তন্ত্রসার', পৃঃ ১৪৬।
১০৯. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ২৪।

১১০. ঐ, ঐ, পৃ: ২৪।

১১১. ঐ, ঐ, পৃ: ৫৮।

১১২. "বাহুভ্যাঞ্চের জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ।।"
—'তন্ত্রসার', পৃ: ১৯১।

১১৩. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ৫৮।

১১৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৬৯।

১১৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৭০-৭১।

১১৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৭১।

১১৭. "ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং।
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণাকারস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততম্।"
—'শিবসংহিতা', ৫। ১০৩।

১১৮. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ৯৬।

১১৯. ঐ, ঐ, পৃ: ১৪৬।

১২০. ঐ, ঐ, পৃ: ৭১-৭২।

১২১. ঐ, ঐ, পৃ: ৯১।

১২২. 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়', ২০।১।

১২৩. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯১, ৯২।

১২৪. "It is held in practical yoga that the quaintessence of the visible body is distilled in the form of soma or nectar or Amrita and is reposited in the moon in the Sahasrar."—
S. B. Dasgupta, ibid, Page-275.

১২৫. 'গৌতমীয়তন্ত্র', ৯ অধ্যায় ; 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী', ৪র্থ উল্লাস।

১২৬. 'কুব্জিকাতন্ত্র' (১ম ও ৬ষ্ঠ পটল), ' তোড়লতন্ত্র' (২য়, ৭ম, ও ৯ম পটল)।

১২৭. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ৯৪।

১২৮. ঐ, ঐ, পৃ: ৫৯।

১২৯. 'শিবসংহিতা' (৪।১৫, ৩১-৩৭)।

১৩০. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯৪।

১৩১. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৭-৮৮।

১৩২. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৮-৯০।

১৩৩. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৮-৯০।

১৩৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৮-৯০।

১৩৫. ঐ, ঐ, পৃ: ১৪৭।
১৩৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৯০।
১৩৭. ঐ, ঐ, পৃ: ১১৮।
১৩৮. ঐ, ঐ, পরিশিষ্ট, পৃ: ১২৩-১২৪।
১৩৯. 'নির্বাণতন্ত্র', ১ম পটল ; 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ৭ম পটল।
১৪০. "সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী-ওমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া।।
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্।।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র', ৪।২৫-২৬।
১৪১. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১ম পটল।
১৪২. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৬৭-৩৬৯।
১৪৩. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৬৮।
১৪৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৬৮।
১৪৫. ভৈরবতন্ত্রোক্ত কালিকার ধ্যানমন্ত্রের অংশবিশেষ। দ্রষ্টব্যঃ—'শ্যামারহস্য', ১।৮।
১৪৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৬৯।
১৪৭. 'নির্বাণতন্ত্র', ১ম পটল, 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১ম পটল।
১৪৮. যোগ, ব্রহ্মজ্ঞান।
১৪৯. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩, ৪।
১৫০. ঐ, ঐ, পৃ: ৫।
১৫১. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৬-৩৮।
১৫২. 'হংস' ধ্বনি।
১৫৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৮।
১৫৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৪০।
১৫৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৬-১০।
১৫৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৭-৪০।
১৫৭. 'জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র', শ্লোকসংখ্যা ২৫-২৭।
১৫৮. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯।
১৫৯. জলেতে।
১৬০. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯-১০।
১৬১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', কলকাতা, ১৩১৮ সাল ;প্রথম পটল, পৃ: ৮।
১৬২. 'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।

১৬৩. 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', প্রথম পটল।
১৬৪. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮।
১৬৫. ঐ, ঐ, পৃ: ১৯।
১৬৬. ঐ, ঐ, পৃ: ২০।
১৬৭. ঐ, ঐ, পৃ: ২১।
১৬৮. ঐ, ঐ, পৃ: ২২।
১৬৯. ঐ, ঐ, পৃ: ১৬-১৭।
১৭০. 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'শারদাতিলক', 'জ্ঞানসঙ্কলিনী' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
১৭১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', প্রথম উল্লাস, পৃ: ৯।
১৭২. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৬-১৭।
১৭৩. ঐ, ঐ, পৃ: ১৭।
১৭৪. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত, 'ষট্চক্রনিরূপণ' (পূর্ণানন্দগিরি রচিত), কলকাতা, ১৩৮৩, শ্লোকসংখ্যা ৩০, পৃ: ২৬।
১৭৫. 'শিবসংহিতা', ৫।৬১।
১৭৬. 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', ৪।১০।
১৭৭. 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', ৪।৮-১৩।
১৭৮. 'শিবসংহিতা', ৫।১০।
১৭৯. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৪।
১৮০. 'শিবসংহিতা', ৫।১৫১-১৫২।
১৮১. 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', ৪র্থ উল্লাস।
১৮২. S. B. Dasgupta, ibid., Page-278.
১৮৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯৮।
১৮৪. "The final end of the Natha Sidhas—immortality in a perfect body and in a devine body."—S.B. Dasgupta, ibid., Page-250.
১৮৫. শুক্র, রস।
১৮৬. বায়ু।
১৮৭. রস, কুণ্ডলিনী।
১৮৮. চক্র বা পদ্ম।
১৮৯. মস্তকে সহস্রার পদ্মমূলে যোনিস্থিত চন্দ্র।
এই স্থান থেকে সর্বদা সুধা ক্ষরিত হচ্ছে।
—'শিবসংহিতা', ৫।১০৩।
১৯০. ষট্চক্রভেদের।
১৯১. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩-৩৪।

১৯২. 'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।

১৯৩. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩-৩৪।

১৯৪. "সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োর্ঽপিচ।।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ।।"
—'শিবসংহিতা', ৪।১৩-১৪।

১৯৫. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত ;পৃ: ২১-৫৮।

১৯৬. ঐ, ঐ, পৃ: ২৮।

১৯৭. 'তন্ত্রসার', টিপ্পনী, পৃ: ৩৩৮-৩৪২।

১৯৮. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৪-৩৬।

১৯৯. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৩য় উল্লাস।

২০০. প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪১-৫৬।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণব সাহিত্য ও তন্ত্র

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে তন্ত্রের প্রভাব :

সাধারণতঃ 'বৈষ্ণব' বলতে আমরা তাঁদেরকেই বুঝি, যাঁরা 'বিষ্ণু' বা বিষ্ণুর অবতারদির ভক্ত বা উপাসক এবং 'বৈষ্ণবে'র আচরিত ও পালনীয় উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মসাধনার বিশেষ রীতি ও পথকেই বৈষ্ণবধর্ম নামে অভিহিত করা হয়। 'বাজসনেয়ী সংহিতা'য় 'বৈষ্ণব' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়; সেখানে 'বৈষ্ণব' কথাটির অর্থ হচ্ছে 'বিষ্ণু যার অধিকারী'। সম্ভবতঃ, মহাভারতেই ধর্মগোষ্ঠী অর্থে 'বৈষ্ণব' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১]

ভারতবর্ষে বিষ্ণু-উপাসনা বৈদিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যে মণ্ডিত। ঋগ্বেদে কতকগুলি বিষ্ণুসূক্ত পরিদৃষ্ট হয়। যজুর্বেদ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, কঠোপনিষদ্ প্রভৃতি—আরণ্যক-ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে বিষ্ণুর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। উপনিষদ্-পরবর্তীকাল থেকেই ভারতে বিষ্ণু ও বাসুদেবকে কেন্দ্র ক'রে ভক্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল এবং 'বাসুদেব', 'ভাগবত', 'পাঞ্চরাত্র', 'সাত্বত' প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধায় বিষ্ণুভক্তগণ অভিহিত হতেন। কৃষ্ণ-বাসুদেবের লীলা ও মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র ক'রেই ভারতে বৈষ্ণবধর্মের বিচিত্র বিকাশ ঘটে এবং কালক্রমে রামানুজ (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী), নিম্বার্ক (খ্রীঃ ১১শ—১২শ শতাব্দী), মধ্বাচার্য (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী), বল্লভাচার্য (১৪শ-১৫শ শতাব্দী) প্রভৃতি দার্শনিক ও আচার্যগণকে কেন্দ্র ক'রে ভারতে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

ভারতের এই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনেও তন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত তত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। কারণ, ভারতীয় ধর্মসাধনার সুবিশাল পরিমণ্ডলে প্রায় সর্বত্রই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও চিন্তা ধারার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষতঃ, ভারতের মধ্যযুগের অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্ম সাধনায় যে একটা বিশেষ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, তার কারণই হচ্ছে তন্ত্র প্রভাব। দ্বৈতবাদের সোপান বেয়ে অদ্বৈততত্ত্বে আরোহণরই হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রের লক্ষ্য। মধ্যযুগের অধিকাংশ ধর্মসাধনা এই দ্বৈত থেকে

অদ্বৈতে গমনের সাধনা এবং তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি মধ্যযুগের বিভিন্ন সাধন-প্রণালীকে প্রভাবিত করেছে,[২]—এরই ফলে বিভিন্ন ধর্ম-সাধনায় একটা ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়।

তন্ত্র বা তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে সাধারণের একটা ধারণা হচ্ছে যে, এটা কেবলমাত্র শক্তি-আরাধনাকেন্দ্রিক এবং 'পঞ্চ-মকারাদি সহযোগে তন্ত্রোক্ত সাধনরীতি শাক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ'কথা যথার্থ নয়। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য—ভারতের এই পঞ্চোপাসক ধর্মসম্প্রদায়ের স্ব স্ব ইষ্টদেব বা দেবীর আরাধ্য মন্ত্র, যন্ত্র, পূজাপদ্ধতি, ধর্মাচরণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়।[৩] তন্ত্রশাস্ত্রে কালীতারাদি দশমহাবিদ্যা এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, রাধা, সরস্বতী প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার বীজমন্ত্র, যন্ত্রাদি ও অর্চনাপদ্ধতি যেমন নির্দেশিত হয়েছে, তেমনই শিব, বিষ্ণু কৃষ্ণ, রাম, গোপাল, সূর্য, গণেশ প্রভৃতি সমস্ত পুরুষদেবতার বীজমন্ত্র, যন্ত্র ও বিশেষ বিশেষ সাধনরীতি তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

"উপাস্য দেবতা ও উপাসনার পদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। * * * 'শক্তি সঙ্গমতন্ত্রে' (৫/৯২/৩) বৈষ্ণব, গাণপত্য, শৈব, স্বায়ম্ভুব, চান্দ্র, পাশুপত, চীন, জৈন, কালমুখ, বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবগণই প্রধান।"[৪] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ 'পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে' তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন তন্ত্রের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা সাধারণতঃ 'সনৎকুমার তন্ত্র', 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'শারদাতিলক', 'ক্রমদীপিকা' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের অনুসরণে সাধন-ভজন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম প্রতিপালন করেন।

বৈষ্ণবদের দীক্ষাগ্রহণ, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ন্যাস ও মুদ্রা, ধ্যান, পুরশ্চরণ প্রভৃতি বিবিধ ক্রম ও পদ্ধতি তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেই সম্পাদিত হয়। বৈষ্ণবদের আরাধ্য কৃষ্ণ, রাম, গোপাল প্রভৃতি ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্রগুলি তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত।[৫] তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর অবতারাদির বিবিধ ধ্যান এবং ধ্যানানুযায়ী মন্ত্র, বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা পূজায় ফলপ্রাপ্তি, মন্ত্র-পুরশ্চরণের বিশেষ বিধি প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনায় যোগানুষ্ঠানের প্রাধান্যও রয়েছে। এই যোগসাধনা সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতি যোগ-প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।[৬] বৈষ্ণবধর্মে এবং বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনায় তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি যে বিশেষভাবে গ্রাহ্য, তার প্রমাণ স্বরূপ বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বনীয় গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত হল; যথা,—

"যাত্রাবলিবিধানাঞ্চ সর্বাবার্ষিক পর্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণম্।।"

উপাসনার সুবিধার জন্যই যে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধরূপ কল্পনা করা হয়েছে, সেবিষয়ও 'শ্রীমদ্ভাগবতে' শৌনক ও সুতের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে;যথা,—

"শ্রীশৌনক উবাচ।।
অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তম।
সমস্ত তন্ত্রবাদ্ধান্তে ভবান্ ভগবত তত্ত্ববিৎ।।
তান্ত্রিকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলস্যশ্রিয়ঃ পতেঃ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ।।
তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্।
যেন ক্রিয়ানৈপুণেন মর্ত্যো যায়াদমর্ত্যতাম্।।"[৭]

[শৌনক বললেন,—হে ভগবদ্ভক্ত! আপনি সমস্ত তন্ত্রসিদ্ধান্তে বিশারদ, অতএব অতঃপর আপনি বহুজ্ঞ, আপনাকে এই তান্ত্রিক পূজাবিবেক জিজ্ঞাসা করব। চৈতন্যঘন রমাপতির সেবা বিষয়ে তান্ত্রিক উপাসকগণ চরণাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুর্দশনাদি অস্ত্র ও কৌস্তুভাদি ভূষণ সকল যে যে তত্ত্বের যে যে ভাবে উপাসনা সৌকর্যের জন্য নিরূপণ করেন, যে ক্রিয়া-নিপুণতায় মরণশীল মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই ক্রিয়াযোগ জানতে অভিলাষী, অতএব আমাদের নিকট সেই শ্রেয়স্কর ক্রিয়াযোগ কীর্তন করুন।]

তন্ত্রশাস্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব বা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব যে বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শক্তিতত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ এবং প্রাচীনকাল থেকে ভারতে তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই শক্তিতত্ত্ব নানাভাবে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে ভারতীয় গণমানস এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনেরও সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব ও বিকাশের মূলে শক্তি। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে পরমেশ্বরের নিত্যসঙ্গিনী হচ্ছেন পরমাশক্তি। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি কোথাও লক্ষ্মী এবং কোথাও শ্রীরাধা। শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ন্যায় বৈষ্ণবদর্শনও স্বীকার করেছে যে, দুগ্ধ ও তার ধবলত্ব, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেরূপ অভিন্ন, শক্তি ও শক্তিমান অর্থাৎ ব্রহ্ম ও প্রকৃতিও সেইরূপ

অভিন্ন। বৈষ্ণবধর্ম ও সম্প্রদায়ের নিকট সবিশেষ প্রামাণ্য ও আদরনীয় গ্রন্থ 'বিষ্ণুপুরাণে' উক্ত হয়েছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তি সুপ্তা থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিসহযোগেই সগুণ হন এবং ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান শক্তি বলে শক্তি প্রকাশিত হন। সৃষ্টিকার্যে সর্বকর্তৃত্বময়ী শক্তির প্রাধান্য তন্ত্রের ন্যায় 'বিষ্ণুপুরাণে'ও সগৌরবে কীর্তিত হয়েছে।[৮] তন্মধ্যে একটি স্থান উদ্ধৃত হল,—

"বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা।।
ন কেবলং রবৌ শক্তির্বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্।।"[৯]

'কূর্মপুরাণে'ও পরমাশক্তির মহিমাজ্ঞাপন করা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের শিব ও শক্তি বা ব্রহ্ম ও পরমাপ্রকৃতিই বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পরম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'নারদপঞ্চরাত্রে'র (২।৩।৫৩) একটি উক্তি উদ্ধৃত হ'ল,—

"যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপাচ নির্লিপ্তা প্রকৃতে পরা।।"

অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন ব্রহ্মস্বরূপ নির্লিপ্তা দেবী। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধাও নিত্যসত্যস্বরূপা এবং উভয়ে অভিন্ন। এখানে তন্ত্রের শিবশক্তির 'অবিনাভাব' সম্বন্ধ-তত্ত্বটির[১০] প্রভাব লক্ষণীয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের শক্তি মাহাত্ম্যের এক অপরূপ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব ধর্মে। বৈষ্ণব-দীক্ষায় শক্তির বীজমন্ত্র প্রদত্ত হয় এবং গোপীব্যতীত গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদন সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় এবং বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধার স্থান যে কত উচ্চে, তার প্রমাণ পাই বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে। 'গায়ত্রীতন্ত্রে' (৫।৯৩) বলা হয়েছে যে,—

"শক্তি পূজাং বিনা ভদ্রে যদি কৃষ্ণং প্রপূজয়েৎ।
সা পূজা কাষ্ঠ পূজাবদ্ গোহত্যা কৃষ্ণপূজনে।।"

[ভদ্রে! শক্তিপূজা না ক'রে যদি বিশিষ্টবিধানে কৃষ্ণের পূজা করা যায়, তা'হলে সেই পূজা কাষ্ঠপূজাবৎ বিফল হয়ে থাকে, সেরূপে কৃষ্ণের পূজা করলে গোহত্যা করা হয়।]

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমস্তগ্রন্থেই এরূপে শক্তি-মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম আদরনীয় গ্রন্থ 'নারদপঞ্চরাত্রে' প্রথমে রাধার নামোচ্চারণ ক'রে পরে

কৃষ্ণের নামোচ্চারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে জগৎপিতা এবং শ্রীরাধাকে জগন্মাতা রূপে বন্দনা করা হয়েছে। যথা,—

> "আদৌ সমুচ্চরেদ্ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
> বিপরীতাং যদি পঠেদ্ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবম্।।
> শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
> পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী।।"[১১]

তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন উক্ত হয়েছে,—"তব শক্ত্যা বয়ং শক্ত্যাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু"[১২] [অর্থাৎ আমরা (ব্রহ্মা-বিষ্ণু—মহেশ্বর) তোমার (পরমাশক্তির) নিকট থেকে শক্তিলাভ করেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্যে সমর্থ হয়েছি], তেমনই 'নারদপঞ্চরাত্রে'ও বলা হয়েছে, যে, "যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলকেশঃ পরঃ" (অর্থাৎ রাধার প্রসাদেই কৃষ্ণ গোলকের অধীশ্বর ও প্রভু)।[১৩]

'নির্বাণতন্ত্রে' শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়,—

> "ভক্ত্যা বাপ্যথবাঽভক্ত্যাজপন্তি যুগলং যদি।
> এব ভক্ত্যা প্রদাস্যামি সদ্গতিঃ শৃণু রাধিকে।।"[১৪]

অর্থাৎ রাধিকা, শ্রবণ কর, ভক্তিতেই হোক, অথবা অভক্তিতেই হোক, যারা তোমার আমার যুগলনামের পূজা করে, তোমার প্রতি ভক্তির বলে আমি তাদেরকে সদ্গতি প্রদান করি।

রাধাকৃষ্ণের এই যুগলরূপ এবং এক হয়েও দুই ও দুই হয়েও এক হওয়ার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবের রাসলীলার নিগূঢ় তত্ত্বটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবের এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত শিবশক্তিবাদই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দই বৈষ্ণবের চরম রসতত্ত্ব। তন্ত্রশাস্ত্রে একেই বলা হয় সহস্রারে শিবশক্তির সামরস্য। তন্ত্রের কুণ্ডলিনী শক্তি, ষট্চক্র ও সহস্রার মহাপদ্মের কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়েছে। 'নারদ পঞ্চরাত্রে' উল্লিখিত হয়েছে যে,—

> "মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতং।
> বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্চক্রঞ্চ বিভাব্য চ।
> কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরম্।
> সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুঃ।
> দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীত কৌষেয়বাসসম্।
> সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্।।"[১৫]

[(ব্রাহ্মণ বালক) মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই ষট্‌চক্রবিভাবনপূর্বক সহস্রদলপদ্মস্থিত স্বশক্তি কুণ্ডলিনীর সঙ্গে অবস্থিত সস্মিত-সুন্দর-দ্বিভুজ-নবীনজলদপ্রভ পীতকৌষেয়বসন পরমেশ্বর নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আপন হৃদয়ে দর্শন করলেন।]

উদ্ধৃতাংশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তান্ত্রিক সাধক যেমন ষট্‌চক্রভেদ ক'রে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে পরমশিবের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে শিবশক্তির সামরস্যে আপ্লুত হন, তেমনই বৈষ্ণবসাধকও অনুরূপভাবে রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ অনুভব করেন। তন্ত্রোক্ত সহস্রদলপদ্ম বা সহস্রারই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের গোকুল। এ' প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মন্তব্যটি উদ্ধৃত হল,—" 'ব্রহ্মসংহিতা'য় বলা হয়েছে সহস্রপত্র কমল শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান গোকুল। ভগবানের অনন্তরূপের অংশসম্ভূত এই পদ্মের কর্ণিকাই সেই ধাম। এই কর্ণিকার উপরে প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নিত্যরাসবিহার করেন। কর্ণিকার কিঞ্জল্ক ভগবদংশ গোপদের ধাম এবং পদ্মের পাঁপড়ি ভগবৎপ্রেয়সী গোপীদের ধাম। গোকুল আর গোলক বস্তুতঃ একই। উর্ধ্বভূমিতে যা গোলক, নিম্নভূমিতে তাই গোকুল। গোলক গোকুলেরই চিন্ময়রূপ। গোলকেই অবস্থিত রাসমণ্ডল। এখানেই চলে রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাসলীলা। কাজেই সহস্রারে শিবশক্তির সামরস্যের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলন।"[১৬]

বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের মিলন-সম্ভূতরসোপলব্ধিজনিত রসতত্ত্ব-সাধনার মধ্যেও মূলতঃ তন্ত্রোক্ত-সাধন তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। তান্ত্রিকের প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সাধন-রহস্যই বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব-সাধনার মধ্য দিয়ে দ্যোতিত হয়েছে। শক্তিসাধক তান্ত্রিককে যেমন প্রথমাবস্থায় 'পশুভাব'-বিহিত আচারপালন (ইন্দ্রিয়দমনাদি সহ বিবিধ শুদ্ধাচার ও অনুষ্ঠান) করতে হয়, তেমনই বৈষ্ণবের ক্ষেত্রেও সাধারণ অবস্থায় গুরোপদেশ অনুযায়ী শাস্ত্রনির্দিষ্ট পবিত্র-জীবনযাপন করতে হয় এবং তারপর ক্রমে চিত্ত কামনামুক্ত হয়ে ভগবৎপ্রেমে অত্যন্ত আকুল শুদ্ধ-দেহমনে রসতত্ত্বের সাধনায় ব্রতী হতে হয়। বস্তুতঃ, শক্তি সাধক তান্ত্রিকের বীর ও দিব্যভাবের সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিই বৈষ্ণবদের রসতত্ত্বের সাধনার মধ্যে পরিস্ফুট।[১৭] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদরনীয় গ্রন্থ 'পদ্মপুরাণে', 'শ্রীমদ্ভাগবদ্' গ্রন্থে বর্ণিত বৃন্দাবন-লীলার যে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে, তার মধ্য দিয়েও রূপকাকারে তান্ত্রিক যোগসাধন-তত্ত্বের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে।[১৮] উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশটি উল্লেখযোগ্য,—

"সারে বৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপী কোটীভিরাবৃতম্।
তত্র গঙ্গা পরাশক্তিস্তৎস্থমানন্দ কাননম্।।"[১৯]

অর্থাৎ জগতের সারস্বরূপ বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণ কোটিসংখ্যক গোপীদ্বারা পরিবৃত রয়েছেন এবং সেখানে গঙ্গাই পরমাশক্তি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, গঙ্গা বৃন্দাবন থেকে বহুদূরে অবস্থিত, অথচ 'পদ্মপুরাণে" বৃন্দাবন-বর্ণনায় গঙ্গাকেই পরমাশক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এখানে তন্ত্রোক্ত যোগ-সাধনার আভাস রয়েছে। তন্ত্রে দেহমধ্যস্থ ইড়া নাড়ীকে 'গঙ্গা' নামে অভিহিত করা হয়।[২০] 'পদ্মপুরাণে' উপরি-উদ্ধৃত অংশে 'গঙ্গা' শব্দের দ্বারা তন্ত্রোক্ত গুহ্য যোগ-সাধনাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২১] বস্তুতঃ, বৈষ্ণবধর্মের বৃন্দবনলীলা ও রাসলীলার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ সাধনরহস্যের সঙ্কেত প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে তান্ত্রিক যোগতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।[২২] তন্ত্রের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। তান্ত্রিক সাধক যেমন ষট্চক্রভেদাদির দ্বারা স্বকীয় দেহেই শিব-শক্তির মিলনানন্দ অনুভব করেন, বৈষ্ণব সাধকও তেমনই নিজের দেহমধ্যেই রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দে আপ্লুত হন।[২৩] তন্ত্রের নাড়ীতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, শক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে যে প্রভাবিত করেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা', 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'নারদপঞ্চরাত্র', 'সনৎকুমার-তন্ত্র', 'শারদাতিলক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' ও তন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত তত্ত্বকে যে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা' আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'পাঞ্চরাত্র' সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও তন্ত্র-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুতঃ, নানা-প্রশাখায় বিমণ্ডিত ভারতের বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন এক স্বতন্ত্র মহিমায় বিভূষিত হলেও তন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত ভাবধারা যে একে প্রভাবিত করেছে, এ'কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূজার্চনা-সাধনভজন এবং ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলেই এই তন্ত্র-প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তন্ত্র-প্রভাব

বাংলাদেশে প্রাচীনযুগ থেকে বিষ্ণু-আরাধনা ও বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রচলন ছিল, তা' আমরা বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, লিপিলেখন ও বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণ পাই। শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) নামক পর্বত গাত্রে উৎকীর্ন রাজা চন্দ্রবর্মার (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক) একটি লিপি, পঞ্চম শতাব্দীর বগুড়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি নিদর্শন প্রাচীনযুগে বাংলায় বিষ্ণু উপাসনার প্রমাণ। গুপ্ত-সম্রাটদের সময়ে বিষ্ণু আরাধনা বিশেসভাবে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। বাংলার সেন রাজগণের সময়েও বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলার জনমানসে বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আখ্যানের যে বিশেষ প্রসার ঘটেছিল, তা'

বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি, লিপিলেখন প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত হয়।[২৪] মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আর্ভিাবের পূর্বে বাংলার বৈষ্ণবভক্তদের মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী, 'রায়মুকুট' বৃহস্পতি, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সর্বব্যাপক বিকাশ লাভ ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রতিভায়। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মে প্রেম ও ভক্তির সর্বব্যাপক প্রাধান্য সঞ্চারিত ক'রে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনকে এক অভিনব রূপদান করেন। বাংলায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মূলরূপটি 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এতে রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের একটা সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, একটা বিষয়ে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তা'হচ্ছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে শ্রীরাধিকার এক মহাগৌরবময় ভূমিকায় অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ মূল পরমতত্ত্ব এবং শ্রীরাধিকা তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তি। রাধা পূর্ণ শক্তি এবং কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান; অগ্নির সঙ্গে অগ্নির দাহিকা শক্তির সম্পর্কের ন্যায় কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রে পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বদিতে ধরে দুইরূপ॥

* * *

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে সদা করায় বিহ্বল॥
রাধিকা প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"[২৫]

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে রাধার এই প্রাধান্যের কারণ হচ্ছে তন্ত্রের শক্তি-মাহাত্ম্যের প্রভাব। এ'প্রসঙ্গ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভিমতটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য;— "সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীরাধাকে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও পাই, কিন্তু শক্তিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া রাধা তত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ গৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণ দ্বারাই সাধিত হইয়াছে,—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শক্তিতত্ত্ব বাংলার জাতীয় মানসে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়াছিল;তাই গৌড়ীয় দার্শনিকগণ শক্তিতত্ত্বের দ্বারাই শ্রীরাধার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছে।"[২৬] বাঙ্গালীর জাতীয় মানসে এই শক্তিতত্ত্ব-প্রাধান্যের কারণই হচ্ছে তন্ত্র-প্রভাব। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার গণজীবনে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্ব থেকেই বাঙ্গালীর ধর্মীয় জীবনে এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার গভীর প্রভাব বিস্তারিত ছিল। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা'[২৭] নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যাদির সাহয্যে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজের উচ্চনীচ নির্বিশেষ সর্বস্তরে তন্ত্র-সাধনা ও তান্ত্রিক ভাবধারার প্রবল প্রভাব ছিল। বিশেষতঃ, খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় গণজীবনে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের আধিপত্য সম্পর্কে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,—

"নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ষট্‌কর্ম ও পঞ্চ—'ম'কার সাধনা জনসাধারণের পরম আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। * * * গুরুবাদের ভিত্তি দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল এবং তান্ত্রিক সাধকের কদর বেড়ে গেল সমাজের সর্বশ্রেণীর কাছেই। শ্মশানে, তান্ত্রিক সাধুদের আস্তানায়, গৃহস্থের বাড়ীতেও মারণ, বশীকরণ, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির জন্য হোম, যজ্ঞ প্রভৃতির ধূম পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে চলল 'ভৈরবীচক্র' ও 'কারণবারি'-রূপ আসবপানের সঙ্গে নির্লজ্জ কামাচার।"[২৮]

"* * * সারাটা দেশই তো ছিল তান্ত্রিক পন্থী। বেদ, উপনিষদ্ এদেশে কোনদিনই শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি।"[২৯]

বস্তুতঃ, প্রাক্‌চৈতন্যপর্বে এবং চৈতন্য-সমসাময়িক কালে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে তন্ত্রচর্চার ও তান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, তার প্রমাণ 'চর্যাপদ', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যায়।

অতএব, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য তন্ত্র-প্রভাবের ফল। শক্তিতত্ত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বময়ী 'শক্তি'র মাহাত্ম্য তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার মধ্যেই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তন্ত্রের শক্তিবাদ এবং পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তিতত্ত্ব যে ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে, তা' আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। বাংলার বৈষ্ণবধর্মে রাধার প্রাধান্য বা রাধা ও কৃষ্ণের (শক্তি ও শক্তিমানের) অভিনত্ব ও যুগলমূর্তির উপাসনার মধ্য দিয়ে শক্তিতত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের

প্রভাব পরিস্ফুট। বিশেষতঃ, বাংলার ষড়গোস্বামীগণ চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে যেভাবে রূপদান করেছেন, তাতে এর উপরে তান্ত্রিক মতবাদ বা চিন্তাধারার প্রভাব সহজেই উপলব্ধ হয়।[৩০]

বিভিন্ন আগম এবং তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে শিব ও শক্তির মিলনাত্মক অদ্বয়রূপ বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্রের মূলকথাই হচ্ছে,—শিব বা ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র; পরমাপ্রকৃতি বা মহাশক্তিই ব্রহ্মের সর্বক্রিয়ার কারণ এবং তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটন করছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে তন্ত্রের এই শক্তিবাদ বা শক্তিমাহাত্ম্য বাংলার ধর্মজীবন ও গণমানসকে বহুপূর্ব হতেই প্রভাবিত ক'রে আসছিল বলেই বাংলার বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে শক্তিতত্ত্বের অপরূপ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাক্ চৈতন্যপর্ব হতে চৈতন্যোত্তর যুগ অবধি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুরারি, নরহরি, চন্দ্রশেখর, বাসুদেব, রামানন্দ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজন এবং পদকর্তাদের রচনায় শ্রীরাধতত্ত্বের যে পরিস্ফুটন হয়েছে, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের প্রতিফলনকে অস্বীকার করবার উপায় নাই।[৩১]

শক্তি বা নারী-সহযোগে সাধনা তন্ত্রসাধনার এক প্রধান অঙ্গ। বাংলার বৈষ্ণবধর্মেও উচ্চঅধিকারীর জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি নিয়ে সাধনা-অনুমোদনের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রায় রামানন্দ ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সংবাদ এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে উক্ত অংশটি উদ্ধৃত হল,—

"আমিত সন্ন্যাসী আপনা-বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি।।
তবঁহি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোনজন।।
রামানন্দরায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন।।
এ দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।।
স্নানাদি করায় পরায় বাম বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন।।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ।।

নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুনী স্পর্শে নির্বিকার মন।।
এক রামনন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।।
তাহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।।
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।।
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।।
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি, মহাবীর হয়।।
উজ্জ্বল মধুর প্রেম-ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্যে বিহরে সদায়।।"[৩২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট মুকুটমণি স্বরূপ। অতএব, বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় বিশিষ্ট উচ্চাধিকারীর জন্য স্ত্রী-প্রকৃতি সহ সাধনার স্বীকৃতি যদি না থাকত, তা'হলে কখনই কৃষ্ণদাস কবিকাজের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বব্যাখ্যায় উক্ত-অংশ বর্ননা করতে পারতেন না। চৈতন্যদেব নিজে স্ত্রীমুখ দর্শন না করলেও এবং ছোট হরিদাসকে নারী-সম্ভাষণের জন্য শাস্তি দান করলেও রামানন্দের ন্যায় উচ্চ অধিকারীর জন্য নারী নিয়ে বৈষ্ণবের বিশেষ সাধন-পদ্ধতিকে যে স্বীকার করেছেন, উপরি-উদ্ধৃত অংশটি তার প্রমাণ। তন্ত্রে উচ্চাধিকারী কৌলাচারী সাধককে নারী বা শক্তিসহ বিশেষ গুহ্যসাধনায় যেমন সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,[৩৩] উদ্ধৃতাংশেও তেমনই বৈষ্ণবের 'প্রকৃতি' সহ সাধনায় নির্বিকারত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তান্ত্রিক 'বীর' সাধকের ন্যায় এখানেও ঐ জাতীয় সাধককে 'মহাবীর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করা হবে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থখানিতে আমরা তন্ত্র-প্রভাবের স্বাক্ষর লক্ষ্য করি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ রয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই কাব্যটি যে প্রাক্চৈতন্যযুগের কাব্য'[৩৪] তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার জনজীবনের সর্বত্র তন্ত্র ও

তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত ছিল বলেই (এ' বিষয়ে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে তান্ত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অহনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে করিলে মধুপান।
এঁবে পাইএঁা অহ্মে ব্রহ্মগেয়ান॥
দূর আনুসর সুন্দরী রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞীঁ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥"[৩৫]

উপরি-উক্ত অংশে 'মন পবন', 'মূলকমল', 'ইড়া', 'পিঙ্গলা', সুসমনা (সুষুম্না নাড়ী), 'দশমী দুয়ার' প্রভৃতি শব্দগুলি তান্ত্রিক যোগক্রিয়ার অঙ্গীভূত। হঠযোগ ও সহজযানেও এইগুলি সুপ্রচলিত। কিন্তু, হঠযোগ ও সহজযান যে তন্ত্র-প্রভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচনা করেছি। তন্ত্রে ষট্‌চক্রভেদে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীকে কেন্দ্র ক'রে মস্তকস্থ সহস্রার পদ্মে শিবশক্তির সামরস্যজনিত যৌগিক প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, উদ্ধৃতাংশে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রত্যেকটি পদের ভণিতায় 'বাসলী দেবী'র উল্লেখের দ্বারা কবির শক্তিদেবীর প্রতি ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, চণ্ডীদাস এই বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন।[৩৬] প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে এবং চৈতন্যসমসাময়িককালে তান্ত্রিকাচার এবং তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের প্রভাব গণমানসে বিস্তৃত ছিল বলেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও তার স্বাক্ষর পড়েছে।

বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সহজিয়াবৈষ্ণব সাহিত্যে তন্ত্র-প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের ক্রমিক পরিণতি হচ্ছে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম।[৩৭] কিন্তু অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম থেকে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের উদ্ভব হয় নি। অধ্যাপক পরিতোষ দাস বলেছেন যে,—"চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অধ্যবহিত পরেই শাক্ত-প্রভাবিত বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত বৌদ্ধসহজিয়া ধর্ম মিলিত হইয়া বাংলা দেশে এক অভিনব ধর্ম

সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল—এই সম্প্রদায়টির নাম হইল 'বৈষ্ণব সহজিয়া'।"[৩৯] বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ আমাদের আলোচ্য নয়। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর তন্ত্র-প্রভাবই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত,[৪০] অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু,[৪১] উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,[৪২] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,[৪৩] প্রমুখ সমস্ত পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও সহজিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপর তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার গভীর প্রভাব পড়েছিল। তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতিকে বক্ষে ধারণ ক'রেই বাংলাদেশে এই বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম বাংলাদেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রের গুরুবাদ, শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব, 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব', নাড়ীতত্ত্ব, ষট্চক্রতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মসাধনার মূল অবলম্বন। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব ও সাধন-প্রক্রিয়া 'আগমসার', 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরত্নাবলী', 'অমৃতরসাবলী', 'বিবর্তবিলাস', 'দুর্লভসার' প্রভৃতি গ্রন্থাদি এবং চণ্ডীদাসাদি কবির নামে প্রচলিত রাগত্মিকা পদাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি এবং রাগাত্মিকা পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মে দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—'বৈধীভক্তি' ও 'রাগানুগাভক্তি'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই দুই প্রকার ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে।

"এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন-জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥

* * *

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ-লক্ষণ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ।।"[৪৪]

এই 'রাগানুগা' বা 'রাগত্মিকা' ভক্তিকেই বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সাধনার মূল লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল। বৈষ্ণকব সহজিয়ারা তাদের সাধনাকে 'রাগের ভজন' রূপে অভিহিত করেছে। এই 'রাগের ভজন' কোন প্রচলিত শাস্ত্রের আচার আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ 'ভজন' নয়; এটা হচ্ছে 'প্রেম-পিরীতিমার্গে'র ভজন। তন্ত্রশাস্ত্রমতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের শিব ও শক্তিরূপ দুটি সত্তার প্রতীক হচ্ছে জাগতিক পুরুষ ও নারী[৪৫] এবং বিশেষ সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে শিব-শক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধিই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার প্রধান লক্ষ্য। বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেমের সাধনায় 'রাগের ভজন', 'যুগলমিলন' বা 'যুগলভজনে'র মধ্য দিয়ে তন্ত্রের ঐ বিশেষতত্ত্বই রূপায়িত হয়ে উঠেছে। তন্ত্র যেমন বলছে যে, জগতের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর মধ্য দিয়ে শিব ও শক্তিই প্রকটিত হচ্ছেন, তেমনই সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতে জগতের নর-নারী স্বরূপে কৃষ্ণ ও রাধা। পুরুষরূপী কৃষ্ণ এবং প্রকৃতিরূপিনী রাধা—এই দুইয়ের মিলিত তত্ত্বই হচ্ছে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পরমসত্য। রাধাকৃষ্ণের যুগনমিলনের দ্বারা মহাভাবে উপনীত হয়ে সহজ মানুষের স্বরূপ-উপলব্ধিই হচ্ছে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধনার লক্ষ্য এবং এই সাধন-লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বৈষ্ণব-সহজিয়ারা তন্ত্রোক্ত সাধনপথের গুরুবাদ, ষট্‌চক্রতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, 'প্রকৃতি' বা নারীসহ সাধনা-প্রভৃতি রীতি বা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। বৈষ্ণবসহজিয়াগণ অনেকস্থলে তন্ত্রগ্রন্থের ন্যায় হর-পার্বতীর কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের রচিত গ্রন্থদিতে সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের কোন কোন পুঁথির নামকরণের মধ্যেই তন্ত্র-প্রভাব সুস্পষ্ট; যেমন,—'আগমসার'। 'আগম' তন্ত্রশাস্ত্রেরই একটি বিভাগ।

বৈষ্ণবসহজিয়াদের সাধনতত্ত্বে তান্ত্রিক জটিল সাধনরহস্যের প্রভাব পড়েছিল বলেই তন্ত্রের ন্যায় বৈষ্ণবসহজিয়া সাহিত্যেও গুরু-মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। ক্রিয়ামূলক তন্ত্রসাধনা একান্তরূপে গুরুগম্য; গুরুর সাহচর্য বা কৃপা ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে মর্মোদ্ভেদ অসম্ভব। সেকারণেই তন্ত্রে গুরু সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। ভারতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ই গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। কিন্তু তন্ত্রের গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদ এক স্বতন্ত্র মহিমায় ভূষিত। তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, গুরুই পরমব্রহ্ম। গুরু ও ইষ্টের বা আরাধ্যদেবতার অভিন্ন-জ্ঞান তান্ত্রিকসাধনায় অপরিহার্য। তন্ত্র প্রভাবের ফলে বাংলার বৈষ্ণবধর্মেও বলা হয়েছে যে, গুরুর মধ্য দিয়েই ভগবান কৃষ্ণ কৃপা করেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে।।"[৪৭]

বাংলার বৈষ্ণবসহজিয়া সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথমেই গুরুর বন্দনা করা হয়েছে। কোন কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে গুরুর তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত প্রণামমন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছে; যেমন 'আগমসার' গ্রন্থের[৪৮] প্রথমেই রয়েছে,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

উক্ত শ্লোকটি তান্ত্রিক গুরু-বন্দনা।[৪৯] তন্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর এবং প্রতিমাকে শিলা বা পাথর মনে করলে নরকে গমন করতে হয়; যথা,—

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ।।"[৫০]

এই তন্ত্র-বচনটিই বৈষ্ণব-সহজিয়া সাহিত্যের নিম্নোদ্ধৃত পদে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে,—

"গুরুকে মনিস্য কয় তার গতি নাই হয়
মন্ত্রকে অক্ষরী করি লেখে।
শালগ্রাম-শিলা বন্দি নহে তার মন্ত্র সিদ্ধি
অঘোর নরকে গিয়ে ঠেকে।।"[৫১]

তন্ত্রানুগ গুরু-মাহাত্ম্য-কীর্তনের নিদর্শনস্বরূপ বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত হল:—

(১) "গুরু অন্ত গুরু তন্ত্র গুরু সে পূজার মন্ত্র
গুরুর মহিমা কে বা জানে।"[৫২]

(২) "গুরুরূপে কৃষ্ণ আপনি ভগবান।
এই কথা শুন সাধু পুরাণ প্রমাণ।।"[৫৩]

(৩) "গুরুবিষ্ণু গুরু ব্রহ্মা গুরু যজ্ঞ দান ধর্ম
গুরু হন দেব মহেশ্বর।
গুরুকে অধিক আর কি আছে সংসার-মাঝ
গুরুদেব সর্ব-পরাৎপর।।"[৫৪]

চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যের আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্রের গুরু-মাহাত্ম্য-সূচক যে-সকল বচন উদ্ধৃত হয়েছে, বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের উপরি-উক্তি অংশ সমূহে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় তন্ত্রভিত্তিক প্রেমভক্তি-মার্গের সূক্ষ্ম-জটিল সাধনার অনুশীলন করতেন বলে তন্ত্রোক্ত গুরুবাদ তাদের ধর্মদর্শনকে প্রভাবিত করেছে।

তান্ত্রিক সাধনায় বৈদিক সংস্কারের প্রাধান্য নাই। সর্বসংস্কার ও সর্ব আচারের ঊর্ধ্বে উঠে শিব-শক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানলাভই তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। বৈষ্ণব সহজিয়াদেরও 'যুগলভজন' বা 'রাগের ভজন' বেদ-বিধির বহির্ভূত; লৌকিক সংস্কার এবং বিধিনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ডাদির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে যে রাগানুগা প্রেম-ভক্তির সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না, তা' বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে;—

(১) "রাগের ভজন যাজন কঠিন
আচার বিষম হয়।
বেদবিধি ছাড়ে কুল-পরিহারে
তবে হয় প্রেমোদয়।।"[৫৫]

(২) "যুগল ভজন তাহার যাজন
বেদ-বিধি অগোচর।"[৫৬]

(৩) "বেদের বিধানে কহে জগজ্জনে
তাহাতে নাইক পাই।
অতি বিপরীত হয় রাগ-পথ
শুহ সাধক ভাঁই।।[৫৭]

(৪) "নগর ভিতরে আছে এক রসের মন্দির।
বৈধী ভক্তি আচরণ গড়ের প্রাচীর।।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম-কাণ্ড গড়ন বিভিতে।
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারি প্রবেশিতে।।"[৫৮]

তান্ত্রিক সাধনা দেহ-ভিত্তিক। মানবদেহকে কেন্দ্র ক'রেই তন্ত্রশাস্ত্রে বহুবিচিত্র সাধনক্রম উল্লিখিত হয়েছে। দেহের মধ্যেই পরমাত্মা বা শিব-শক্তির অধিষ্ঠান; দেহের মধ্যেই জল, বায়ু, তেজ, মৃত্তিকা, আকাশ, সপ্ত পাতাল, সপ্ত ঊর্ধ্বলোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সাগর, সপ্ত পর্বত প্রভৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর অবস্থান কল্পিত হয়েছে।[৫৯] বিশাল তন্ত্রশাস্ত্রের মূলতত্ত্বই হচ্ছে,—

(১) "ব্রহ্মাণ্ডং বৈ শরীরন্তু সর্বেষাং প্রাণ-ধারিণাম্।
ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (৬।৪০)।

(২) "প্রতিদেহং পরেশানি ব্রহ্মাণ্ডং মাত্র সংশয়ঃ।
কথিতং বাহ্যদেহস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য চ লক্ষণম্ ।।
যন্মধ্যে বর্ততে সাক্ষাদ্ ভুবনানি চতুর্দশ।
তদেব বিগ্রহং দেবি মহাব্রহ্মাণ্ডমধ্যগম্ ।।"
—'নির্বাণতন্ত্র' (১০। ১৩-১৪)।

তন্ত্রের এই 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ' বা 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' বৌদ্ধতান্ত্রিক, নামযোগী, সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করেছে। বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় তন্ত্রোক্ত 'দেহতত্ত্ব'কে অবলম্বন করেই তাদের সাধন-পথে অগ্রসর হয়েছে। রাগানুগা প্রেমমার্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের আত্মজ্ঞানলাভের সাধন রহস্যের প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে নিজের শরীর বা দেহতত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন। 'রত্নসার', 'আগমসার', 'অমৃতরসাবলী' প্রভৃতি বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে দেহের মাহাত্ম্য এবং দেহতত্ত্বোপলব্ধির কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে।

(১) "ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।
* * *
ভাণ্ড বিচারিলে জানি দেহের মাহাত্ম্য।
আপনা জানিলে জানি বৃন্দাবনতত্ত্ব।
ভাণ্ড হইতে কত কৃষ্ণের মহিমা।
ভাণ্ড হইতে জানি রাধা প্রেমতত্ত্ব সীমা।।"—'রত্নসার।'[৬০]

(২) 'সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির।।
দেহকে জানিতে যদি পার ভালমনে।
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দভুবনে।।"—'অমৃতরত্নাবলী।'[৬১]

(৩) "ভজনের মূল এই নরবপু দেহ।
নরবপু দেহ হৈলা সর্ব কর্তা যেহ।।
* * *
আপনা জানিলে তবে সহজ বস্তু জানে।
বাহ্যের ক্রিয়া বাহ্যে থাকুক মনের ক্রিয়া মনে।।"—'অমৃতরসাবলী'।[৬২]

(৪) "দেহের সাধন হয় সর্বতত্ত্ব সার।"—'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।'[৬৩]

(৫) "নিজ দেহ না জানিলে তত্ত্ব নাহি জানে।"—'সুধামৃতকণিকা।'[৬৪]

'আগমসার', 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরত্নাবলী', 'আত্মনিরূপণ' প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গ্রন্থাদি এবং রাগাত্মিকা পদাবলীতে তন্ত্রের ন্যায় দেহের মধ্যেই চতুর্দশভুবন, চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত তত্ত্বের অধিষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণস্বরূপ মানব-দেহাভ্যন্তরের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যেমন তান্ত্রিক সাধনার প্রধান অঙ্গ, তেমনই সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মমতে দেহতত্ত্বের সম্যক মর্মোদঘাটনই হচ্ছে 'সহজ'-সাধনার বা আত্মতত্ত্বোপলব্ধির প্রাথমিক স্তর। এইজন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের নাড়ীতত্ত্ব, ষটচক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ প্রভৃতি সাধন-প্রক্রিয়া সহজিয়া বৈষ্ণব-সাধনাকে প্রভাবিত করেছে। তান্ত্রিক মত অনুসরণ ক'রে বৈষ্ণব সহজিয়ারা দেহ মধ্যে বিভিন্ন চক্র ও পদ্মের কল্পনা করেছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এই যে, তারা 'চক্রে'র পরিবর্তে বিভিন্ন 'সরোবরে'র কল্পনা করেছে। 'আনন্দ ভৈরব' গ্রন্থে শিবের প্রশ্নে শক্তিদেবী মানবদেহের বিভিন্ন অংশে বিরাজিত 'পদ্ম' ও 'সরোবরে'র বর্ণনা করেছেন।

"সহস্রদল হয় মস্তক ভিতরে।
অক্ষয় নামেতে তথা আছে সরোবরে।।
উদর ভিতরে আছে মান সরোবরে।
তথা হৈতে ফুল গেল সহস্রদল উপরে।।
ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখ-হইয়া নাসার।
সর্বকালে মূলবস্তু আছে তার ভিতর।।
অক্ষয় সরোবরের জল রসাল অধর।
তথা হৈতে যায় বহি মান সরোবর।।
পদ্মের ডাটা বেয়ে ঊর্দ্ধগতি চলে।
সত্তা সহিতে পুন মিশায় সেই জলে।।
মান সরোবরের উপর ক্ষীরোদ সরোবরে।
তথা হৈতে উপজিল পদ্ম শতদল।।
মূল বস্তুর স্বরূপ সেই পদ্ম রয়।
তার নাম সরোবর পৃথু নাম হয়।।
তথা হৈতে উপজিল অষ্টদল পদ্ম।
তার নাম সরোবর বুঝিবারে ধন্দ।।
অষ্টদল পদ্মে পরাৎপর বস্তু হয়।
ঘোর অন্ধ সরোবরে উরুপদ্ম উপজয়।।"[৬৫]

উপরি-উদ্ধৃত অংশে তন্ত্র-নিরূপিত চক্রের পরিবর্তে মস্তকে 'অক্ষয় সরোবর', উদরে 'মান সরোবর' প্রভৃতি বিভিন্ন সরোবরের এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পদ্মের সম্বন্ধ বর্ণিত হয়েছে। 'সহস্রদল হয় মস্তক ভিতরে' বাক্যটি তন্ত্রোক্ত মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মকে নির্দেশ করছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মকে অধোমুখ[৬৬] বলা হয়েছে, তেমনই বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যেও 'সহস্রদল' পদ্মকে 'উলটা কমল' বলা হয়েছে; যথা,—

"অক্ষয় সরোবর এক উলটা কমল।
পরমাত্মা স্থিতি তাহা স্থান নিরমল॥
উলটা কমলে সব স্থিতির নির্ধার।
পাইচে সহজ বস্তু করিয়া বিচার॥
* * *
সহস্রদলের স্থিতি অক্ষয় সরোবর॥"
—'অমৃতরসাবলী'।[৬৭]

অন্যান্য বৈষ্ণব সহজিয়াগ্রন্থে এবং চণ্ডীদাসাদির রাগাত্মিকা পদাবলীতেও মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 'পদ্ম' ও 'সরোবরে'র এবং তন্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে।

(১) 'কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃৎপদ্ম নির্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে॥
নাভির ভাগে প্রেম সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥"
—'চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদ।'[৬৮]

(২) "মস্তকে অক্ষয় সরোবর সহস্রদল ইথে।
তার নিচে কণ্ঠ সরোবর জানিবে নিশ্চিন্তে॥

চতুর্দ্দল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়।
হৃদয় ভিতরে ক্ষীর সরোবর হয়।
অষ্টদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
উদয় ভিতরে মান সরোবর কয়।
শতদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
পৃথু নাভির নাম পৃথু সরোবর।
ষড়দল পদ্ম ইথে জানিবে নির্ধার।।"
—'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী'।[৬৯]

দেহমধ্যস্থ ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না নামক তিনটি নাড়ীই হচ্ছে তান্ত্রিক যোগ-প্রক্রিয়ার মূল অবলম্বন। তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতিতে ঐ তিনটি নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই প্রধান এবং মূলাধার চক্রে বা পদ্মে নিদ্রিতা মহাশক্তিরূপিনী কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা ক'রে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বে পরিচালিত করতে হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম সাধনারও প্রধান অঙ্গ কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব এবং রাগমার্গের প্রেমসাধনার 'দ্বার স্বরূপ' হচ্ছে ঐ তিনটি নাড়ী। 'অমৃতরসাবলী' নামক গ্রন্থে দেহমধ্যস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর তত্ত্ব সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে; যথা,—

"বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকহ একের কাছে।।"[৭০]

উদ্ধৃতাংশে দেহমধ্যস্থ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীকে তিনটি দ্বাররূপে অভিহিত করা হয়েছে। 'চতুর হইয়া দুইকে ছড়িয়া' অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে পরিত্যাগ ক'রে 'থাকহ একের কাছে' সুষুম্না নাড়ীকে অবলম্বন ক'রেই 'নিত্যধামে' প্রবিষ্ট হতে হবে বা 'সহজ'-জ্ঞানলাভ করতে হবে। তান্ত্রিক সাধনক্রমে মূলাধার চক্রে বা পদ্মে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ক'রে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে ষট্চক্রভেদের দ্বারা মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত করতে হয়। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধককেও রাগমার্গের ভাবসাধনায় তন্ত্রভিত্তিক সাধনার দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণেই যে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা শিব ও শক্তির কথোপকথনের মাধ্যমে 'আনন্দভৈরব' গ্রন্থে রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে;—

"বুঝিয়া মহেশ তবে করিল অঙ্গিকার।
শক্তির চরণে আসি করিল নমস্কার॥
হাসিয়া মহামায়া কহে মধুর বচনে।
আমার আজ্ঞা পালন তুমি করিবে সর্বক্ষণে॥
তোমার যেই ইচ্ছা সেই ইচ্ছা হয় মোর।
বুঝিলে নিকট হয়, নহিলে হয় দূরে॥
তাহার লাগিয়া মোরে করহ ভজন।
আমাকে জানিলে তার পাবে দরশন॥
মনে মনে বুঝিয়া দেখ উপাসনা কি।
হর কহে কামবীজের আশ্রয় হয়াছি॥
বীজের স্বরূপ আমি দেখ আমার গুণ।
হর কহে সর্ব অঙ্গ করাহ দরশন॥
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্বগুণ।
শুনিয়া হরের বাক্য ত্যজিল বসন।
শিব করে একে একে অঙ্গ দরশন॥
শক্তি অঙ্গে উদয় করিল সর্বগুণ।
পশিল অন্তরে হৈল হর অচেতন॥"[৭১]

উদ্ধৃতাংশে কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের ফলে শিবের শক্তিতত্ত্বোপলব্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণেই মায়ার আবরণ দূরীভূত হয়। উদ্ধৃতাংশে শক্তির 'বসন' পরিত্যাগের অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ার আবরণ অপসারণ ক'রে শক্তি শিবকে স্বীয় চিৎগুণান্বিত মূর্তি বা স্বরূপ দর্শন করালেন।

এই 'আনন্দভৈরব' গ্রন্থের একটি কাহিনীতে ভৈরবের সহজধর্ম শিক্ষায় তান্ত্রিক দেবী কালীর আরাধনার বিষয় সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। ভৈরব আদ্যাশক্তি কালিকার উপাসক; তাই তিনি বলছেন যে,—

"ভৈরব আমার নাম সহজপুরে বাস।
হরিনারায়ণ রাজার পাত্র কালীমাতার দাস॥

* * *

আমার মূলমন্ত্র হয় কালী-শঙ্করী।
প্রাণ গেলে তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি॥"[৭২]

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের বীজমন্ত্র হচ্ছে 'কামগায়ত্রী কামবীজ'। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে।

(১) "হর কহে কামবীজের আশ্রয় হয়্যাছি।"

—'আনন্দভৈরব'।[৭৩]

(২) "কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা বড়।
গায়ত্রীবীজ সিদ্ধ কৈলে সেই ভক্তি দড়॥
কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা যার।
নিশ্চয় পাইবে সেই ব্রজেন্দ্রকুমার॥"

—'বিবর্তবিলাস'।[৭৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও এর উল্লেখ আছে।

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥"[৭৫]

এই 'কামবীজ কামগায়ত্রী' হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী। 'কামবীজ' হচ্ছে 'ক্লীঁ'[৭৬]—এটা শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষরী মন্ত্র। বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বীজমন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। 'কামগায়ত্রী' হচ্ছে,—'কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।'[৭৭] বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক পরমনিষ্ঠার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত ঐ বীজমন্ত্র ও কামগায়ত্রী জপ করেন।

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম-সাধনার দুইটি ক্রম বা দিক রয়েছে;—'বাহ্য' ও 'অন্তর' ('মনের করণ')।

(১) "বাহ্যের সাধন মনের করণ
সহজ বস্তু যেঁহো লিখাইলা।"

—'অমৃতরসাবলী'।[৭৮]

(২) "বাহ্য অন্তর দুইমত জাজন।"

—'সহজতত্ত্ব'।[৭৯]

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও এই দুই প্রকার সাধন রীতির উল্লেখ আছে,—

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।"[৮০]

বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'বাহ্য' সাধনার ভিত্তি ভূমি তন্ত্র। 'বাহ্য' সাধনক্রমে সহজিয়া সাধককে

মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন 'চক্র' বা 'পদ্ম' ও 'সরোবর', ইড়াপিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীর রহস্য, কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব প্রভৃতি অবগত হতে হয়। 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরত্নাবলী', 'বিবর্তবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতির নামে প্রচলিত রাগাত্মিকা পদসমূহে এই সাধনক্রমের বর্ণনা রয়েছে। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক এই তন্ত্রানুসারী সাধন-পদ্ধতির মাধ্যমে কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণের দ্বারাই 'আত্মতত্ত্ব'-জ্ঞান লাভ করেন এবং রাগমার্গের প্রেমভক্তির সাধনায় শ্রীরাধার মহাভাবে উপনীত হন।

আমরা পূর্বেই আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীরাধার প্রাধান্যের কারণ হচ্ছে তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রভাব। বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব।

তন্ত্রমতে সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের বা পরমশিবের দু'টি অংশ বা রূপ ঃ—শিব ও শক্তি। শিব ব্যতীত শক্তি থাকেন না, শক্তি ব্যতীত শিব থাকেন না। শক্তির সঙ্গে শিবের অবিনাভাব সম্পর্ক। মানবদেহে মস্তকে সহস্রারপদ্মে শিবের এবং মূলাধারচক্রে কুলকুণ্ডলিনীরূপে শক্তির অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক সাধক মূলাধারে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করেন এবং ষট্‌চক্রভেদ ক'রে সহস্রারে শিব-শক্তির সামরস্য জনিত অনির্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হন। তান্ত্রিক সাধকের লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মদেহে শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে শিবতত্ত্বের মিলনসাধনজনিত পরমানন্দ উপলব্ধি।[৮১] তন্ত্রানুসারে জগতের পুরুষ ও নারী যথাক্রমে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের প্রতীক।[৮২] এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রে নারী ও পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে যে বিচিত্র সাধন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিব-শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ-উপলব্ধি। শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যই তন্ত্রে প্রকৃতি বা নারী সহ সাধনার বিবিধ ক্রম ও পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হয়েছে।

তন্ত্রের এই শিব-শক্তিতত্ত্বই সহজিয়া বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে।

(১) "রাধাকৃষ্ণ এক দেহ জানিহ নিশ্চয়।
দ্বিভাগ করিলে তার বড়ই সংশয়॥

* * *

আদ্যা শক্তি রাধা কৃষ্ণ আদি পুরুষ।
এক ব্রহ্ম দুইরূপে করয়ে বিলাস॥"
—'আগমসার'।[৮৩]

(২) "পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুইরূপ।
এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ॥

তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ-প্রকৃতি।
সকলের মূল হয় সেই রস-মূরতি॥
* * *
পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ।
সহস্রার দলে করে রসের স্বরূপ॥"[৮৪]

(৩) "রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্তি।
সেই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি॥
প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা জন্য নয়।
সেই হেতু প্রকৃতিভাব করয়ে আশ্রয়॥"[৮৫]

(৪) "সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার।
সেই কৃষ্ণ সেই রাধা একুই আকার॥
রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ।
অতএব দুই রূপ হয় এক রূপ॥"[৮৬]

বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের উপরি-উদ্ধৃতাংশগুলিতে তন্ত্রের শিব-শক্তিবাদ বা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তন্ত্রশাস্ত্রমতে সাধক নিজেকে শিবস্বরূপ এবং সাধিকা নিজেকে শক্তিস্বরূপিনী চিন্তা ক'রে সাধনায় নিমগ্ন হন এবং শিবশক্তিতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধিতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রের ন্যায় সহজিয়া বৈষ্ণবদর্শনেও পুরুষকে কৃষ্ণতত্ত্বের এবং নারীকে রাধাতত্ত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণতত্ত্বকে 'রস' এবং রাধাতত্ত্বকে 'রতি' নামে অভিহিত করেছে। কৃষ্ণই প্রকৃতি ও পুরুষরূপে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতভাবে লীলা করছেন।

"জয় জয় সর্বাদি বস্তু রসরাজ কাম।
জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্যধাম॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃতে।
বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে॥
স্বয়ং কাম নিত্যবস্তু রস-রতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয়॥
একবস্তু পুরুষ-প্রকৃতি দুইরূপ হইয়া।
বিলাসহ দুইরূপ ধরি দুই কায়া॥"[৮৭]

বৈষ্ণব সহজিয়ামতে বাস্তবজগতের নারীপুরুষের প্রেমের মধ্য দিয়ে নিত্যবৃন্দাবনস্থিত

রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজ প্রেমলীলাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

"এই যে সহজ বস্তু সহজ তার গতি।

* * *

নারী পুরুষরূপে সতত বিহরে।।"[৮৮]

বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'রূপ-স্বরূপ' তত্ত্বের মধ্যেও তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তিতত্ত্বের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর বাহিরের 'রূপ' তার স্থূল পরিচিতিমাত্র; প্রত্যেক নর ও নারী 'স্বরূপে' যথাক্রমে 'কৃষ্ণ' ও 'রাধা'। অতএব, পুরুষ ও নারীকে 'রূপ' থেকে 'স্বরূপে' উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন 'আরোপ' সাধনা। পুরুষ ও নারী প্রাকৃত প্রেম-মিলনের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে কৃষ্ণ ও রাধাজ্ঞানে সাধনায় নিমগ্ন হবে এবং 'স্বরূপে' কৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধিতেই তাদের সাধনার চরম সিদ্ধিলাভ। 'আরোপ' সাধনার দ্বারা বাস্তব জগতের নর-নারী 'স্বরূপে' অধিষ্ঠিত হলেই তাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে রাধা-কৃষ্ণের নিত্য-প্রেমলীলা। সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই 'আরোপ' সাধনার দ্বারা জীবের পার্থিবসত্তার বিলুপ্তিতে অপ্রাকৃত সত্তার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে তন্ত্র-সাধকর 'পশু' ভাব থেকে 'দিব্য' ভাবে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটিই পরিস্ফুট হয়েছে। চণ্ডীদাসের পদে এই 'আরোপ' সাধনার বিষয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে;—

(১) "নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নানুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে।
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।।
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ,
ঐক্যতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি শুন শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে।।"[৮৯]

(২) 'স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।।"[৯০]

চণ্ডীদাস, নরোত্তম, নরহরি, লোচন প্রভৃতির ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন সহজিয়া পদে এই 'স্বরূপ'-ভজনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

(১) "স্বরূপে আরোপ এই রসকূপ
সকল সাধন পর।
স্বরূপ বুঝিয়া সাধন করিলে
সাধক হইবে পার ॥"[৯১]

(২) "স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।
জীবলোক স্বরূপ নয় ॥
স্বরূপ রসেতে মাধুর্য হয়।
তাহা বিনু মন কিছুই নয় ॥

* * *

পদ্ম গন্ধ হয় তাহার গতি।
তাহারে জিনিতে কার শকতি ॥

স্বরূপ ভজিলে মানুষ পাবে।
আরোপ ছড়িলে নরকে যাবে।"[৯২]

(৩) "স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল করিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে ॥"[৯৩]

এই 'স্বরূপ'-ভজনে পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত-সাধনায় স্থূল দেহভোগ-চেতনা পরিত্যাগ করতে হয় এবং 'প্রকৃতি' হয়ে 'প্রকৃতি'র সঙ্গে মিলিত হতে হয়।

(১) "প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীত
দেহরতি নাহি রয়।

* * *

প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচার
করিবে নারীর সঙ্গ ॥"

—চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদ।[৯৪]

(২) "আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।"
—'রসসার গ্রন্থ'।[৯৫]

(৩) "স্বভাব প্রকৃতি হইলে তবে রাগরতি।"
—'অমৃত রত্নাবলী'।[৯৬]

রাগাত্মিকা পদসমূহে এবং 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরসাবলী', 'অমৃতরত্নাবলী', 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী' প্রভৃতি বিভিন্ন সহজিয়া গ্রন্থে এই 'আরোপ' সাধনা ও 'স্বরূপ'-ভজনের বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। তান্ত্রিক সাধনক্রমে যেমন শক্তি বা নারী সহযোগে সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে কামকে জয় ক'রে শিবশক্তিসত্তায় অধিষ্ঠিত হওয়া, তেমনই বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'মহাভাবে'র সাধনা বা 'আরোপ' সাধনায় প্রকৃতি বা নারী নিয়ে সাধনারও লক্ষ্য হচ্ছে কামকে জয় করা এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের পূর্ণোপলব্ধি।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তন্ত্রের শিবশক্তিতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনী যোগক্রিয়া, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবসহজিয়াদের রাগমার্গের প্রেম-ভক্তি সাধনাকে প্রভাবিত করেছে। বস্তুতঃ, বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্মসাধনায় তন্ত্রের যোগ-সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণবের প্রেমের ভাবসাধনার এক অপরূপ সম্মিলন ঘটেছে এবং বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে তন্ত্র-ভিত্তিক প্রেমসাধনার বাণীই শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

পাদটীকা

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭০; পৃ: ২৬৩।

২। প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'নাথধর্ম ও সাহিত্য', আলিপুর দুয়ার, ১৯৫৫; পরিচায়িকা, পৃ: ১০।

৩। Chintaharan Chakravorty, 'Tantras : Stadies on thir Religion and Literature', Kolkata, 1972; Chapter-VII & X.

৪। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তন্ত্রকথা', কলকাতা, ১৩৬২ সাল; পৃ: ২৬।

৫। দ্রষ্টব্য :—'গৌতমীয়তন্ত্র'।

৬। 'নারদপঞ্চরাত্র', 'গৌতমীয়তন্ত্র', 'গায়ত্রীতন্ত্র', 'নির্বাণতন্ত্র', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৭। 'শ্রীমদ্ভাগবত'—১২শ স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ১-৩।
৮। 'বিষ্ণুপুরাণ'—প্রথমাংশ (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং দ্বিতীয়াংশ (একাদশ অধ্যায়)।
৯। 'বিষ্ণুপুরাণ'—দ্বিতীয়াংশ, একাদশ অধ্যায়—শ্লোক সংখ্যা ১১-১২।
১০। 'মহনির্বাণতন্ত্র', চতুর্থ উল্লাস।
১১। 'নারদপঞ্চরাত্র', ২।৬।৬-৭।
১২। 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫।১।
১৩। উপেন্দ্রনাথ দাস, 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা', বিশ্বভারতী, ১৩৭৩; পৃ: ১০৪৩।
১৪। 'নির্বাণতন্ত্র', ৫।৩৯।
১৫। 'নারদপঞ্চরাত্র', ১।৩।৭০-৭১।
১৬। উপেন্দ্রনাথ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১০৪৬।
১৭। ঐ, ঐ, পৃ: ১০৪৬।
১৮। সুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, 'হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি', ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৭; পৃ: ৫৬-৫৭।
১৯। সুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫৫।
২০। 'শিবসংহিতা', ৫/১০২।
২১। সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫৫-৫৭।
২২। উপেন্দ্রনাথ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১০৪৬-১০৪৭।
২৩। 'গৌতমীয়তন্ত্র', ৩৪ অধ্যায়।
২৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৩; পৃ: ১৪৬-১৪৭।
২৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', কলকাতা, ১৩৬৮; আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।
২৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ: ১৪৭।
২৭। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা', কলকাতা, ১৯৭৫; পৃ: ৪২-৪৩, ৬১-৭০।
২৮। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৬৩।
২৯। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৭০।
৩০। Sushil Kumar De, 'Introduction to পদ্যাবলী রূপগোস্বামীকৃত', Dhaka University, Dhaka, Page-VIII.
৩১। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', কলকাতা, ১৩৬৪; পৃ: ২৮৪-২৮৮।

৩২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত'; অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৩৩। 'কুলার্ণবতন্ত্র' (২।১২৩, ৫।৮২), 'যোগিনীতন্ত্র', ষষ্ঠপটল।

৩৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩১৪।

৩৫। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ: ১৪১-১৪২।

৩৬। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৫১।

৩৭। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৪।

৩৮। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'সহজিয়া সাহিত্য', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২; ভূমিকা, পৃ: ৯৩।

৩৯। পরিতোষ দাস, 'চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি', কলকাতা, ১৯৭২; মুখবন্ধ।

৪০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'প্রাগুক্ত'; পৃ:১৪৯-১৫৪।

৪১। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ভূমিকা ।l০

৪২। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৫৮-৩৫৯।

৪৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য় খণ্ড, কলকাতা, পৃ: ৫৫৩—৫৩৮।

৪৪। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

৪৫। 'কুব্জিকাতন্ত্র', ৭। ৭; 'নিরুত্তর তন্ত্র', ৬। ৩।

৪৬। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৯৯-৩০০।

৪৭। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

৪৮। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭।

৪৯। 'তন্ত্রসার', পৃ: ১৫৬।

৫০। 'কুলার্ণবতন্ত্র', ১২।৪৫।

৫১। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ১নং পদ।

৫২। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ১নং পদ।

৫২। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ২নং পদ।

৫৩। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ৩নং পদ।

৫৫। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ৯নং পদ।

৫৬। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ৩৮নং পদ।

৫৭। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ৬০নং পদ।

৫৮। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'প্রাগুক্ত', ৬৯নং পদ।

৫৯। 'তোড়লতন্ত্র', 'নির্বাণতন্ত্র', 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৬০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১১১১, তৃতীয় অধ্যায়।
৬১। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত';পৃ: ১৩৪-১৩৫।
৬২। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত';পৃ: ১৮৬-১৮৭।
৬৩। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত';পৃ: ৬৬।
৬৪। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত';পৃ: ৬৬।
৬৫। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত';পৃ: ৮৭-৮৮।
৬৬। 'কুঞ্জিকাতন্ত্র', ৬। ৩৯-৪৪; 'ষট্‌চক্রনিরূপণ', শ্লোক সংখ্যা—৪০-৪১।
৬৭। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৩৫, ১৪৬।
৬৮। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫০।
৬৯। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫১।
৭০। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮৮।
৭১। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮৪-৮৫।
৭২। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১০১-১০২।
৭৩। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮৫।
৭৪। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ:১০৪।
৭৫। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ: ২১৪।
৭৬। 'গৌতমীয়তন্ত্র', উনত্রিংশ অধ্যায়।
৭৭। 'তন্ত্রসার', পৃ: ১৬৫।
৭৮। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮১।
৭৯। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৯।
৮০। 'চৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।
৮১। 'কুব্জিকাতন্ত্র', ষষ্ঠ পটল।
৮২। 'নিরুত্তরতন্ত্র', ৬। ৪।
৮৩। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮, ২৭।
৮৪। 'রত্নসার', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি নং ১১১১।
৮৫। 'দীপকোজ্জ্বল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুঁথি নং ৫৬৪।
৮৬। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, 'রাধারসকারিকা', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ৩য় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ: ১৬৭১।
৮৭। 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব', তরুণীরমণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫, ৪র্থ সংখ্যা।
৮৮। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, 'প্রেমবিলাস', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ: ১৬৬২।

৮৯। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'রাগত্মিকা পদ', কলিকাতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা, ১৯৩২; পৃঃ ১-২।

৯০। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'রাগাত্মিকা পদ', পৃঃ ৬১।

৯১। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'সহজিয়া সাহিত্য', পৃঃ ৫৩।

৯২। মণীন্দ্রমোহন বসু, 'সহজিয়া সাহিত্য', পৃঃ ৬৫।

৯৩। মণীন্দ্রমোহন বসু, সহজিয়া সাহিত্য', পৃঃ ১৩৮।

৯৪। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৩৬৪।

৯৫। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৩৬৪।

৯৬। পরিতোষ দাস, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ১৩৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব

ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল শাখা হচ্ছে 'অনুবাদ সাহিত্য'। সংস্কৃত সাহিত্যের 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থগুলির অনুবাদকে কেন্দ্র ক'রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'অনুবাদ সাহিত্যে'র ধারাটি বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু এই 'অনুবাদ-সাহিত্য' শাখার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির কোনটিই সংস্কৃতভাষায় রচিত মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নয়। মধ্যযুগের বাংলার অনুবাদ সাহিত্য-শাখা বাঙ্গালীর স্বকীয় ভাব কল্পনায় ও মানস-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই শ্রেণীর সাহিত্য-শাখায় বাঙ্গালীর বহুকাল-প্রচলিত সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যশাখা বাঙ্গালীর এক অভিনব জাতীয় সম্পদ। বস্তুতঃ, বাংলা ও বাঙ্গালীর আপন বৈশিষ্ট্য বক্ষে ধারণ ক'রেই এই অনুবাদ সাহিত্যের ধারাটি বিকশিত হয়েছে। তাই, অন্যান্য শাখার ন্যায় এই শাখার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থেও বাঙ্গালীর তন্ত্র-প্রভাবপুষ্ট শাক্তসংস্কার সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে যে তান্ত্রিক-মানসিকতা ও শাক্তভাব বিজড়িত হয়ে আছে, তা' মধ্যযুগের বাংলার অনুবাদ-সাহিত্য শাখায়ও এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'

বঙ্গ-মানসে তন্ত্র-চেতনা ও শাক্ত-সংস্কারের প্রভাব যে কত গভীর, তার অনবদ্য স্মারক হচ্ছে 'বঙ্গের অলঙ্কার' কবি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' গ্রন্থখানি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' গ্রন্থখানি যে মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত 'রামায়ণে'র হুবহু অনুবাদ নয়, এ'কথা সর্বজনবিদিত। কৃত্তিবাস ঋষিকবি বাল্মীকির 'রামায়ণ' অনুবাদ করতে বসে মূলগ্রন্থের বহু অংশকে বর্জন করেছেন এবং অনেক নূতন অংশকে সংযোজন করেছেন।[১]

বাঙ্গালীর প্রাণের কবি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' গ্রন্থটি কবির স্বকীয় ভাবকল্পনা ও বাঙ্গালীর সহজাত মানস-প্রকর্ষে ভাস্বর। এইজন্যই কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' আমরা তন্ত্র-চেতনা-প্রসূত শাক্তভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দেবী দুর্গা বা চণ্ডিকা-পূজার উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। দেবী ভগবতী কর্তৃক রক্ষিত রাবণকে বধ করা শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

"অসিতবরণা কালী কোলে দশানন।
রূপের ছটায় ঘটা তিমিরনাশন।।
* * *
আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী।।
বিস্মিত হইয়া রাম ফেলি ধনুর্বাণ।
প্রণাম করিলা তাঁরে করি মাতৃজ্ঞান।।
বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ।
রাবণ-বিনাশে মিতা! হইল ব্যাঘাত।।
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে।
রক্ষিত রাবণ আজি হর-বরাঙ্গনে।।"[২]

আদ্যাশক্তি মহামায়ার আশ্রিত-জনকে বিনাশ করা যে অসম্ভব, কালী-ভক্তি পরায়ণ বাঙ্গালী জাতির এই চিরকালীন প্রত্যয় কবি কৃত্তিবাসের লেখনীতে সার্থকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই, রামচন্দ্রের এই সঙ্কটে ইন্দ্রাদিদেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে দেবী দুর্গার অকাল-বোধনের দ্বারা পূজা করতে আদেশ দিলেন।

"শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী　　কন কমণ্ডলুপাণি
উপায় কেবল দেবী পূজা।

* * *

শুনি কহে সুরপতি　　যাও তুমি শীঘ্রগতি
জানাও শ্রীরামে বিবরণ।।
প্রেমে পুলকিত চিত　　পদ্মযোনি আনন্দিত
শ্রীরাম-নিকটে উপনীত।
বিনয় করিয়া কয়　　শুন প্রভু দয়াময়।
রাবণ বধের যে বিহিত।।

ব্রহ্মার বচন শুনি কন রাম গুণমণি
কহ বিধি! কি উপায় করি।
মিথ্যা শ্রম করিলাম অনুপায়ে ঠেকিলাম
রক্ষিত রাবণে মহেশ্বরী।।
বিধাতা কহেন প্রভু এক কর্ম কর বিভু,
তবে হবে রাবণ সংহার।
অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী
তরিবে এ দুঃখ-পাথার।।
শ্রীরাম কহেন তবে কিরূপে পূজিত হবে,
অনুক্রম কহ শুনি তার।
শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধি-সময়
শরৎ অকাল এ পূজার।।"[৩]

অকালে দেবী ভগবতীর পূজায় শ্রীরামচন্দ্রের এই সংশয় ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত বিধির দ্বারা বিদূরিত হল এবং রামচন্দ্র সাড়ম্বরে একশত আটটি নীলোৎপল দ্বারা দেবী-পূজার আয়োজন করেন। কিন্তু, দেবীর মায়ায় একটি পদ্ম অপহৃত হ'লে রামচন্দ্র নিজের নীলোৎপল সদৃশ একটি নয়ন দেবীকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হলেন, সেইসময় দেবী ভগবতী সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হয়ে রামচন্দ্রকে রাবণ-বধের বরদান করলেন। শ্রীরামের এই দেবীপূজার বর্ণনায় কবি কৃত্তিবাস পৌরাণিক বিধানাদির সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিধির কথাও সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন ;যথা,—

"তন্ত্র-মন্ত্রমতে পূজা করে রঘুনাথ।
একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাথ।।"[৪]

আমরা 'বাংলায় তান্ত্রিকধর্ম' অধ্যায়ে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি যে, বাঙ্গালীর সমস্ত রকম পূজা-অর্চনার পদ্ধতিতে তন্ত্র-প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'ও শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজায় তন্ত্র-চেতনা ক্রিয়াশীল। শ্রীরামচন্দ্র দেবীর যে স্তব পাঠ করেছেন, তাতে আদ্যাশক্তি কালিকা বা মহামায়ার তন্ত্র-বর্ণিত সর্বকর্তৃত্বময়ী রূপটি ফুটে উঠেছে এবং তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি নাম সভক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে। যথা,—

(১)

"দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গমে স্মরণী বিন্ধ্যগিরিনিবাসিনী।।
দুরারাধ্যা ধ্যানসাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমপ্রকৃতি পুরাতনী।।
নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা।
পরাৎপরা মূলশক্তি সচ্চিতা সাকারা।।

* * *

কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুলকুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার।।
লম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষ-নাশিনী।
কৃতান্তদলনী কাল-উরুবিলাসিনী।।"৫

(২)

"রাজরাজেশ্বরী রমা রণকরী
শঙ্করী শিবে ষোড়শী।।
মাতঙ্গিবগলে কল্যাণী কমলে
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব-বিশ্বোদরী শুভে শুভঙ্করী
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী।।
সহস্র সহস্তে ভীমে ছিন্নমস্তে
মাতা মহিষমর্দিনী।

* * *

দেবী দিগম্বরী দুর্গে দুর্গ-অরি
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়া
ঘোররূপা এলোকেশী।।
সর্বসুশোভনী ত্রৈলোক্যমোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিক্‌বসনা শর্বা শবাসনা
বিশ্বা বিকটদশনা।।"৬

(৩)

কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতিবাক্য কয়।
হের গো নয়নে কালী মোর অসময়।।
পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ-নাশিনী।
মহামায়ারূপে ত্রিজগৎ আচ্ছাদিনী।।

* * *

সর্বময়ী সর্বআত্মা তুমি সর্বশক্তি।
তোমাতে আশ্রিতজীব সংসারানুরক্তি।।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মা তুমি।
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ সুরভূমি।।"[৭]

(৪)

"কাল-নিবারিণা কালী কালের মোহিনী।
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম-শোভিনী।।"[৮]

উপরি-উদ্ধৃত অংশসমূহে একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কৃত্তিবাস রামচন্দ্র কর্তৃক পঠিত দেবী দুর্গার যে স্তব রচনা করেছেন, তাতে দেবীর 'কালী' নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী মহাশক্তির রূপ ও গুণবৈশিষ্ট্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' তার প্রতিফলন ঘটেছে স্পষ্টরূপে। কালী-তারাদি তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার কথা যে ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে, তা' নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী-মানসিকতার বহুযুগ-সঞ্চিত তন্ত্র-প্রভাব ও শাক্ত-চেতনারই প্রমাণ সূচিত করে। তন্ত্রে পরমাশক্তি 'কুলকুণ্ডলিনী' রূপে আরাধিতা এবং কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ও কৃপালাভই তান্ত্রিক সাধকের পরম লক্ষ্য। কৃত্তিবাস-রচিত উপরি-উদ্ধৃত এই দেবীস্তুতিতেও দেবীকে 'কুলকুণ্ডলিনী' রূপে বন্দনা ক'রে কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'র সর্বপেক্ষা বড় কথা হচ্ছে এই শক্তিমাহাত্ম্যের আবেগ-পুরিত ঘোষণা। মূল বাল্মীকি 'রামায়ণে' শক্তিদেবীর এই প্রাধান্য বা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার এই আখ্যানটি নাই। দেবীর অকালবোধনের কথা 'দেবীভাগবত', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি শক্তি-মাহাত্ম্য বিষয়ক। বিশেষতঃ বাল্মীকির পরবর্তীকালে সংস্কৃতে রচিত 'রামায়ণ' গ্রন্থগুলিতে তান্ত্রিক-প্রভাব পড়েছিল।[৯] কৃত্তিবাস দেবী দুর্গার অকাল-বোধনের এবং পূজার এই কাহিনীটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা' তাঁর মৌলিক রচনা-বৈশিষ্ট্যেরই নির্দেশক। প্রশ্ন

হতে পারে যে, এটা কৃত্তিবাসের স্বকীয় রচনা কি না। কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদি ও অকৃত্রিম পাঠ এখন পর্যন্ত নির্ণীত না হওয়ায় রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার উপাখ্যানটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে কেউ কেউ সংশয় পোষণ করলেও অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে এটা কৃত্তিবাসেরই রচিত। এ'প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ;—"....বিবিধ কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজার প্রচলিত উপাখ্যানটি আমাদের খাঁটি বলিয়া মনে হয়।...এই অংশটিকে আমাদের পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলিয়া মনে হয় না।"[১০] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য[১১], ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১২] প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই অংশটি কৃত্তিবাসের দ্বারাই রচিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' যোগাদ্যার বর্ণনা-অংশটি তন্ত্র-প্রভাবের অপর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কবি কৃত্তিবাস 'মহীরাবণের পালা' আখ্যানে এই দেবী যোগাদ্যা বা মহামায়া কালিকার কথা বর্ণনা করেছেন। লঙ্কা-যুদ্ধে যখন রাবণ ব্যতীত আর কোন বীর অবশিষ্ট রইল না, তখন রাবণ নিরুপায় হয়ে পাতালে তার পুত্র মহীরাবণকে স্মরণ করেছে। মহীরাবণ দেবী কালিকার প্রসাদেই অপরাজেয় বীর।

"পাতালে আছয়ে পুত্র শ্রীমহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন।।
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী?
কালিকা পূজিয়া সে পায় বরদান।
অব্যাহত মায়া জানে সর্ব ঠাঁই যান।।"[১৩]

দেবী কালিকা বা যোগাদ্যাই মহীরাবণের রাজ্যের রক্ষয়িত্রী এবং তাঁরই বরে সে অমিতবীরত্বের ও বিচিত্রমায়া বা ঐন্দ্রজালিক-শক্তির অধিকারী।

"কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধি।
মহামায়া তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী।।
যাহা মনে করে তাহা করিবারে পারে।
ত্রিভুবন কাঁপে মহীরাবণের ডরে।।"[১৪]

তাই, রাবণের চরমসঙ্কট ও দুর্গতিতে মহীরাবণ রাবণকে আশ্বস্ত করে বলেছে ;—

"শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব লয়ে পাতাল ভুবনে।।

রাম-লক্ষ্মণেরে আর নাহি তব শঙ্কা।
সীতা লয়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্কা।।"[১৫]

বিচিত্র মায়াজাল বিস্তার ক'রে মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে এবং দেবীর নিকট বলি দেওয়ার সঙ্কল্প করেছে। কিন্তু দেবীর কৃপায় হনুমান মহীরাবণের এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করেছে। হনুমান পাতালে প্রবেশ ক'রে মক্ষিকারূপে দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছে যে,—

"মক্ষিরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কানে।
মহীবেটা আনিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।
নরবলি দিবে শুনি বেলা দ্বিপ্রহরে।
আপনি কি আজ্ঞা করেছ মহীরে?"[১৬]

দেবী প্রত্যুত্তরে হনুমানকে মহীরাবণ বধের উপায় ব'লে দিয়েছেন এবং দেবীর উপদেশানুসারেই হনুমান মহীরাবণকে বধ ক'রে রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেছে।

মহীরাবণের এই আখ্যানটি বাল্মীকির 'রামায়ণ'-কাহিনীতে নাই। এটা কৃত্তিবাসের স্বকীয় সংযোজনা। এই আখ্যানটিতে নরবলি ইত্যাদির দ্বারা দেবীপূজার যে চিত্র কৃত্তিবাস অঙ্কন করেছেন, তাতে তন্ত্রোক্ত পূজারীতির বৈশিষ্ট্যেরই ছাপ পড়েছে। শ্রীরাম-পাঁচালী রচনা করতে ব'সে কবি কৃত্তিবাস ক্ষণে ক্ষণে দেবী কালিকা বা মহাশক্তির মাহাত্ম্যকে স্মরণ করেছেন। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' এই শাক্ত-প্রভাব পরবর্তীকালের সংযোজনা নয়; এটা কৃত্তিবাসেরই রচনা।[১৭] বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জায় যে তন্ত্র-চেতনা ও শাক্ত-ভাবনা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে, কৃত্তিবাস তাকে অপরূপভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীরাম-কাহিনী বর্ণনায় অঙ্কিত করেছেন এবং পরমাশক্তির বন্দনায় কবির লেখনী ভক্তি-বিগলিত হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, কৃতিবাসের 'রামায়ণ' কেবলমাত্র রাম-মহিমাই নয়, দেবী-মহিমাও বটে।

কাশীরামদাসের 'মহাভারত'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ব্যতীত আরও যে একখানি অনুবাদ-কাব্য আজও বাঙ্গালীর চিত্তে অক্ষয় আসন লাভ ক'রে আছে, তা' হচ্ছে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'। 'অমৃতসমান' মহাভারত কথাকে কাশীরাম দাস এমন অপরূপভাবে পরিবেশন করেছেন যে, তা' বাংলার জাতীয় জীবনের সকল অনুপ্রেরণার ও আনন্দের উৎসস্থল হয়ে আছে। কাশীরাম দাসের পূর্বে 'মহাভারতে'র অনুবাদকরূপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও

শ্রীকরনন্দীর নাম স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত কাশীরামের পূর্বে বা সমসাময়িককালে 'মহাভারতে'র অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ। এঁদের মধ্যে প্রায় কেউই সম্পূর্ণ 'মহাভারত' রচনায় অগ্রসর হন নি এবং কাশীরামের মত এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি। বস্তুতঃ, বাংলার জাতীয় গ্রন্থরূপে কাশীরামের 'মহাভারত' আজও অম্লানগৌরবের অধিকারী হয়ে আছে। কিন্তু কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ 'মহাভারতে'র অনুবাদ করেছিলেন কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে 'মহাভারতে'র আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের রচয়িতা যে কাশীরাম দাস, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অর্থাৎ কাশীদাসী 'মহাভারতে'র আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বগুলি কাশীরামেরই রচনা।[১৮]

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'র ন্যায় কাশীরামের 'মহাভারত'ও ব্যাসদেবের 'মহাভারতে'র হুবহু অনুবাদ নয়। কাশীরাম দাস মূল ভারতের অনেক অংশকে পরিত্যাগ করেছেন এবং কিছু মৌলিক সংযোজন করেছেন। 'মহাভারতে'র অনুবাদ করতে বসে কাশীরাম দাস যে বাঙ্গালীর শাক্ত-তান্ত্রিক মানসিকতাকে বিস্মৃত হতে পারেন নি, তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে বিরাটপর্বের অন্তর্গত "রণভূমে চামুণ্ডার আগমন" অংশটি। এই অংশটি উদ্ধৃত হল।

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন

"আইল চামুণ্ডা করে খর খাণ্ডা
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিভা বিদ্যুতের প্রভা
ঘন-বদন করালা।।
বিকট-দশনা শোণিত-রসনা
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা অতিশয় শোভা
ভূত-প্রেতগণ থাকে।।
সবার কুণ্ডল মিহির মণ্ডল
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজ-দলনী সক্রোধ চাহনী
গলে নরমালা মুণ্ডে।।

যুগ্ম-পয়োধর জিনিয়া ভূধর
দশ-অষ্ট-চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী সদা মুক্তবেণী
সর্বদেব করে পূজা।।
উদর-সমুদ্র সশঙ্কিত রুদ্র
গম্ভীর উচ্চ-শবদা।
পর্বত-কন্দরা সদৃশ খর্পরা
সদাই আনন্দ হৃদা।।
চিরন্তনী কৃষ্ণা অতিশয় তৃষ্ণা
সংগ্রাম শুনিয়া আসে।
দেখি কুতূহল হাসে খল-খল
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে।।
সঙ্গে সহচর ভূচর-খেচর
ধেয়ে চতুর্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ডে তুলি ধরে তুণ্ডে
যেমন কেন্দুয়া পড়ে।।
করতালি-বাদ্যে রণভূমি-মধ্যে
নাচয়ে বিহ্বলমতি।
কটিতে সুন্দর ব্যাঘ্রচর্মাম্বর
চরণে বিদরে ক্ষিতি।।
ঘোর-রণস্থলী আথালী-পাথালী
পড়ি তুরঙ্গ সেনা।
নদী বহে রক্তে খরতর স্রোতে
পর্বত-সদৃশ ফেনা।।
তুরঙ্গম সব সদৃশ কচ্ছপ
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ-সহ রথী যেন যূথপতি-
ভাসি যায় রথধ্বজ।।
ছত্র হৈল পত্র পুষ্প হৈল বস্ত্র
ভুজ কমলের দণ্ড।

সদৃশ জলধি তৃণ-কাষ্ঠ-আদি
ভাসে করপদ্ম খণ্ড।।
কাটা পদ-কর ছিন্ন কলেবর
শত শত ছত্রদণ্ড।
দীঘল কুন্তল শ্রবণে কুণ্ডল
ভাসি যায় নরমুণ্ড।।
প্রলয়-গম্ভীর বহিছে রুধির
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।
কত উঠে ডুবে ধরি আনে সবে
ভক্ষয়ে মেলি বদন।।
খর্পর ভরিয়া উদর পুরিয়া
করিল রুধির পান।
অর্জুনে কল্যাণ করি নিজ স্থান
কালিকা কৈল প্রয়াণ।।
ভারত-অমৃত পিয়ে অনুব্রত
শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কালী-পদযুগে কাশীদাস মাগে
দাসার্থে নন্দ-নন্দন।।"[১৯]

মহর্ষি বেদব্যাস রচিত 'মহাভারতে'র বিরাট-পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিরাটরাজের গৃহে পাণ্ডবগণ এক বৎসর ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস-জীবন যাপন করছিলেন। সেইসময় দুর্যোধনাদি কৌরবগণ বিরাটরাজের 'গোধন' হরণ ক'রে নিয়ে গেলে বিরাট রাজের পুত্র উত্তর বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে সারথী ক'রে সেই অপহৃত গোধন উদ্ধারে যুদ্ধ যাত্রা করে। কিন্তু অমিতশক্তিশালী-বিশাল কৌরববাহিনী সন্দর্শনে ভীত উত্তরকে যুদ্ধে অক্ষম দেখে অর্জুন এককভাবে সমগ্র কৌরব সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে বিরাট রাজের গোধন উদ্ধার করেন। কাশীরাম দাস মূল মহাভারতের এই অংশটিকে অনুসরণ করেছেন বটে ;কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত ও 'মোহপ্রাপ্ত'[২০] কৌরবসৈন্যের মধ্যে 'চামুণ্ডার আগমন' তাঁর নিজস্ব সংযোজন। এই অংশটি ব্যাসদেবের 'মহাভারতে' নাই। কাশীরাম দাস যেন বাঙ্গালীর শাক্ত-তান্ত্রিক ঐতিহ্যের বশবর্তী হয়েই তাঁর অনূদিত 'মহাভারতে' 'রণক্ষেত্রে চামুণ্ডার আগমন' অংশটি রচনা করেছেন। 'চামুণ্ডা' তান্ত্রিক দেবতা ;এই ভয়ঙ্করী দেবীর সঙ্গে রণক্ষেত্রের এক নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। কাশীরাম দাসও তাই অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিক্রমে

হত ও সম্মোহিত কৌরবসৈন্যের রক্তস্রোতের মধ্যে দেবী চামুণ্ডা বা কালিকার রক্ত বিহ্বলা-নৃত্যপরায়ণা রূপের এক ভীষণমধুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। করাল-বদনা-লোলজিহ্বা-মুণ্ডমালা বিভূষিতা-খড়্গধারিণী-কারণপ্রিয়া ("অধরে বারুণী")-মুক্তকেশী দেবী কালিকার যে রূপ-বর্ণনা কবি করেছেন, তা' সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী। তন্ত্রে দেবীর রূপ-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, কাশীরাম দাসের চিত্রিত রণক্ষেত্রে দেবী চামুণ্ডার আবির্ভাব দৃশ্যটি যেন তারই কাব্যিক অভিব্যক্তি। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কবি উক্ত অংশের ভণিতায় কালী-ভক্তি প্রার্থনা করছেন ;যথা,—

"কালীপদ যুগে　　　　কাশীদাস মাগে
দাসার্থে নন্দ-নন্দন।।"

আসল কথা হচ্ছে এই যে, বাঙ্গালী গণমানসে যে 'শক্তি'-ভক্তি ও তান্ত্রিক-সংস্কার বিজড়িত রয়েছে, কবি সুযোগ বুঝে তাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করেছেন। বাঙ্গালী কবি মহাশক্তির পাদপদ্মে প্রণাম না জানালে যে স্বস্তি পান না, তারই প্রমাণ কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র উদ্ধৃত অংশটি।

'গোবিন্দমঙ্গল কাব্য'

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারায় দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' নামক কাব্যখানিতেও আমরা শক্তি-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাই। এই কাব্যে 'গোপগণের হরগৌরীপূজা' এবং 'রুক্মিণীর চণ্ডিকা পূজা' অংশ দুইটির মধ্য দিয়ে পরমাশক্তির মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয়েছে। 'গোপগণের হরগৌরী পূজা' অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"গোপগণের হরগৌরী পূজা"

"নন্দ আনন্দিত হৈয়া　　　　রামকৃষ্ণ সঙ্গে লৈয়া
ডাকিয়া আনিল গোপগণে।
সবে মিলি এক মতি　　　　নিরূপণ কৈল যুক্তি
' হরগৌরী পূজার কারণে।।
নানা উপহার আনি　　　　মধুপর্ক রস চিনি
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে।

নৈবেদ্য অনেক বর্ণে শকটে পুরিয়া যত্নে
চলিলা সারদা নদী তীরে।।
গোকুল বসতি যতি গোপ গোপী শত শত
নানা কুতূহলে সবে মিলি।
শিঙ্গা নানা বেণু বাদ্যরঙ্গে কুলপুরোহিত সঙ্গে
চলিল বলাই বনমালি।।
পরম আনন্দ হৈয়া গোকুল-বৈভয় লৈয়া
গেল নন্দ সরস্বতী তীরে।
পরম সুখদধাম লিঙ্গ হরগৌরী নাম
মহাঘোর বনের ভিতরে।।
কৌলিক ব্রাহ্মণে বরি মুখে বেদধ্বনি করি
আরাধিল শ্রীশঙ্কর গৌরী।
গন্ধ আমলকি দিয়া শঙ্খে গঙ্গাজল লৈয়া
হরগৌরী অভিষেক করি।।
মাতৃকান্যাস ধরি যাজক উত্তরী করি
করিল পূজার আরম্ভণ।
নৈবেদ্য মিষ্টান্ন যত দুধি দুগ্ধ মধু ঘৃত
দেবীরে করিল নিবেদন।।
তবে নন্দ হরষিতে রামকৃষ্ণ লৈয়া সাথে
পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে।
যুগল করিয়া কর মাগে মনোমত বর
হর সে প্রসন্ন হৈল তারে।।
নন্দ গোপ কুতূহলে সকল গোয়ালা মেলে
করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন।
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রসগান।"[২১]

উপরি-উদ্ধৃত পূজা-পদ্ধতিতে 'বেদধ্বনি'র সঙ্গে মিলিত হয়েছে তন্ত্রোক্ত 'মাতৃকান্যাস'। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বাঙ্গালীর পূজা-পদ্ধতিতে তান্ত্রিক অংশই অধিক। এখানেও তার স্বাক্ষর রয়েছে। 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যে 'যদুবংশের শাপ বিবরণ ও রুক্মিণীর চণ্ডিকাপূজা'

অংশে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করবার জন্য রুক্মিণী কর্তৃক চণ্ডিকা পূজার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, নিম্নে তা' উদ্ধৃত হল।

"শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন।
তবে যেন মতে কৈল রুক্মিণী হরণ।।
হেথা সে বিদর্ভ দেশে ভীষ্মক রাজন।
রাজগণে স্নানদান করান ভোজন।
স্বয়ম্বর স্থান রাজা কৈল সুশোভিত।
বিভা কার্যে বসিল লৈয়া পুরোহিত।।
সভা করি বসিল যতেক রাজগণ।
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন।।
তবেত কৌশিক রাজা অরবিন্দ দেশে।
ছত্র দণ্ড দিল কৃষ্ণে পরম হরিষে।।
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজা সর্বদল বলে।
বিভা কার্যে বিদর্ভ নগরে শীঘ্র চলে।।
উপনীত হৈল হরি বিদর্ভ নগরে।
স্বয়ম্বর স্থানে কৃষ্ণ গেল রথোপরে।।
সভামধ্যে বসিয়াছে যত্ রাজগণ।
কৃষ্ণ দেখি অধোমুখে রহে সর্বজন।।
রামকৃষ্ণ আইল রথে শুনিল রুক্মিণী।
চণ্ডিকা পূজিতে যায় ভীষ্মক নন্দিনী।।
নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া।
চণ্ডিকা মন্দিরে দেবী উত্তরিল গিয়া।।
দেবী অভিষেক করি পূজিল রুক্মিণী।
কৃষ্ণপতি পাবে বর দিল নারায়ণী।।
বর পেয়ে রথে চড়ি যায় স্বয়ম্বরে।
হেনকালে গোবিন্দ দেখিল রুক্মিণীরে।।
রুক্মিণী হরিব হেন ভাবিল মুরারি।
দুঃখী শ্যামদাস মাগে চরণ মাধুরী।।"[২২]

বস্তুতঃ, 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যে কবি গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-কীর্তনের সঙ্গে সর্বকর্তৃত্বময়ী মহাশক্তির মাহাত্ম্যকেও সংযুক্ত করেছেন। বাঙ্গালী কবির চিত্তে শক্তি-

ভক্তি যে কত প্রবল, উপরি-উদ্ধৃত অংশ দুইটি তারই সার্থক আলিম্পন।

এইভাবে দেখা যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় 'অনুবাদ-সাহিত্য' শাখাতেও শাক্ত-তান্ত্রিক ঐতিহ্যের ছায়াপাত ঘটেছে। তন্ত্র ও শাক্ত-সাধনার পীঠভূমি বাংলার জাতীয় মানসে শক্তিতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল বলেই 'অনুবাদ-সাহিত্য' ধারার বিভিন্ন গ্রন্থে 'শক্তি'-মাহাত্ম্য ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী কবির এই দেবী-ভক্তি বা 'শক্তি'-নিষ্ঠার কারণই হচ্ছে জাতীয় জীবনে তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের গভীর প্রভাব।

পাদটীকা

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭০ ; পৃ: ৫৫১।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতি, কলকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নাই, পৃ: ৪৪৫।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৪৬।

৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৪৮।

৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫০।

৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫০।

৭. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫২।

৮. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫২।

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫৪৩।

১০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ: ১৬০,১৬৬।

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫৪৯, ৫৫৩।

১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪২৩।

১৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৪২৫।

১৫. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪২৫।

১৬. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪৩২।

১৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৪৪৩-৫৫৩।

১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬।

১৯. সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'কাশীদাসী মহাভারত', দেবসাহিত্যকুটির, কলকাতা, ১৯৭৮ ; বিরাটপর্ব, ৬১৬-৬১৭।

২০. সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', বিরাটপর্ব, পৃঃ ৬১৬।

২১. ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, 'গোবিন্দমঙ্গল' (দুঃখীশ্যামদাস রচিত), ৩৪/১, কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম-মেশিন প্রেসে বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮০৮ শকাব্দ, পৃঃ ১০৯।

২২. ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ২১৯-২২০।

সপ্তম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য ও তন্ত্র

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশে তন্ত্রের শক্তি-মাহাত্ম্যের প্রভাব ঃ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য জাতীয় সম্পদ মঙ্গলকাব্যগুলি শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য-আখ্যানেই পরিপূর্ণ। যদিও ধর্মঠাকুর, শিব প্রভৃতি দুই-একজন পুরুষদেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই বিশেষ বিশেষ শক্তিদেবতার জয়ঘোষণায় মুখর। পুরুষ দেবতার একনিষ্ঠ ভক্ত ও উপাসকও যে সমস্ত আত্ম-অহমিকা বিসর্জন দিয়ে শক্তিদেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। শক্তিদেবীর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত যে ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের অন্য কোন পথ নাই, সে'কথাই অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে উদ্গীত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব ও বিকাশের মূলেও আমরা দেখতে পাই যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার জাতীয় মানস ও জনজীবনের গভীরতম প্রদেশে যে তান্ত্রিক সংস্কার ও শাক্ত-ভাবনার ধারা প্রবাহিত ছিল, তা'ই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানদের ভয়াবহ আক্রমণ বাংলা ও বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনাঙ্গনে এক চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। প্রায় সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর ব্যাপী বাংলার জনজীবন ও সমাজের উপর দিয়ে বয়ে যায় নিদারুণ অত্যাচারের বন্যা। যখন কোন ন্যায়পরায়ণ রাজশক্তি বা অনুরূপ কোন রক্ষাকর্তা নাই, বরং শাসক ও শোষকের ভয়াল কৃপাণ মস্তকের উপর সদাই বিঘুর্ণিত, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের দৈবী আশ্রয়ই তো পরম সান্ত্বনা স্থল হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান আক্রমণের সঙ্কটের সম্মুখে সেদিন আপামর বাঙ্গালী জনসাধারণ একমাত্র দেবতার কৃপালাভকেই মুখ্য অবলম্বনীয় মনে করেছিল। "...এই অবস্থায় পরপীড়িত জাতি অল্পকালমধ্যেই জীবনের সর্বপ্রকার উচ্চতর আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া সকল রকম দৈব সহানুভূতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া রহিল। সামাজিক জীবনের এই অবস্থা হইতেই

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম হইয়াছিল।"[১] বস্তুতঃ, বাংলা ও বাঙ্গালীর বহুকাল-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের সংঘাত ও সংঘর্ষজনিত প্রতিক্রিয়ার ফলেই মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার উদ্ভব ঘটেছিল।

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের এই উদ্ভব ও বিকাশে শক্তিদেবতার মাহাত্ম্যই প্রধান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কারণ, প্রবল রাষ্ট্রীয় সংঘাত এবং নিদারুণ সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখে তৎকালীন বাঙ্গালী-মানস পুরুষ দেবতা অপেক্ষা শক্তিদেবতার বরাভয়কেই অধিকতর কাম্য মনে করেছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের তীব্র নিষ্পেষণের সম্মুখে সেদিনের বাঙ্গালী-সমাজ নিষ্ক্রিয় শৈবধর্ম অপেক্ষা বলিষ্ঠ শাক্তধর্মের উদ্বোধনেই আত্মনিয়োগ করেছিল।[২] এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"বস্তুতঃ সাংসারিক সুখ-দুঃখ বিপৎ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। * * * দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। * * * কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। * * * কিন্তু যে দেবতা বলেন, সুখ-দুঃখ, দুর্গতি-সদ্গতি কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্পাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে,—সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি উপাসক হইতে হইল।"[৩] অতএব এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের পটভূমিকায় শক্তি-মাহাত্ম্যই বাঙ্গালীকে মঙ্গলকাব্যরচনার প্রধান অনুপ্রেরণা দান করেছিল। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই এই কারণে শক্তিদেবতার লীলা-কীর্তনে মুখর।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই শক্তি-মাহাত্ম্যের কারণ হচ্ছে বাঙ্গালী-মানসিকতায় তন্ত্র-প্রভাব ও শাক্ত-সংস্কার। আমরা 'বাংলায় তান্ত্রিকধর্ম' নামক অধ্যায় এবং পূর্ববর্তী আলোচনা সমূহে দেখেছি যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তন্ত্রের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। গুপ্তযুগে বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনে তন্ত্র ও তান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। পালযুগে বাংলার গণজীবনকে তান্ত্রিক ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই সময় তন্ত্র ও তান্ত্রিক ভাবনা একদিকে যেমন হিন্দু পৌরাণিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, তেমনই অপরদিকে বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-সংস্কার তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করেছে। পালযুগের নিদর্শনরূপে স্বীকৃত

সর্বানী, সর্বমঙ্গলা, অপরাজিতা, কৌমারী, বারাহী, ভুবনেশ্বরী, মাহেশ্বরী, চণ্ডিকা প্রভৃতি মাতৃকা ও শক্তিমূর্তিগুলি থেকে সমকালীন বাংলাদেশে তন্ত্র ও শাক্তধর্মের ব্যাপক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

পালযুগের পর সেনরাজাদের আমলে বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-শাস্ত্রাদি অনুসৃত ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও এই সময়ে বাংলায় তান্ত্রিক ধর্মের প্রবাহ অব্যাহত ছিল। ভবদেব ভট্ট নামক একজন পণ্ডিত তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য সেনযুগে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই সেনযুগেই তান্ত্রিকতার চন্দ্রাতপের নিম্নে হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলন সাধিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পে তন্ত্র ও তান্ত্রিকধর্মের প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। এই সময়েই তন্ত্র-সাধনা বাংলা, কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, তাঞ্জোর প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত তান্ত্রিকধর্মই বাংলার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি শক্তি দেবীর পূজা বাংলার গণজীবনে এই সময়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থাদি থেকেও জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'পঞ্চ-মকারাদি'র সাধনাসহ শক্তিদেবীর পূজা এবং তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাংলাদেশে সবিশেষ পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তান্ত্রিকধর্ম ও তন্ত্রাচার উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাংলার গণজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দুটি শতকে বাংলার সমাজজীবনে শক্তিদেবীর পূজা, তন্ত্র-সাধনা ও তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

বাংলার মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে সমকালীন বাঙ্গালী মানসের এই তান্ত্রিক-চেতনা ও শাক্ত-ভাবনা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল ব'লে অনুমিত হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি বিশিষ্ট রূপলাভ করতে থাকে।[৫]

মঙ্গলকাব্যের এই উদ্ভবপর্বে বাংলার সমাজ-জীবনে শাক্তমতবাদ ও তান্ত্রিক সংস্কার যে গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল, তা' আমরা আলোচনা ক'রে দেখেছি। তুর্কী মুসলমানের আক্রমণের পটভূমিকায় সেদিনের বাঙ্গালীর জীবন সর্বক্ষেত্রে যে শঙ্কা ও অসহায়ত্বের সম্মুখীন হয়েছিল, তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ সে খুঁজে পেয়েছিল শক্তিদেবীর একছত্র আধিপত্য ও নিরঙ্কুশ মহিমার মধ্যে। তাই, শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রধান উপজীব্য। শক্তিদেবীই যে ত্রিতাপক্লিষ্ট মানুষকে সববিপন্মুক্ত করতে পারেন এবং মানুষের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন,—এ'কথাই বাংলা মঙ্গলকাব্যে সগৌরবে বিঘোষিত হয়েছে। আর এই ধারণার মর্মমূলে রয়েছে, বাঙ্গালীর বহুকালের তান্ত্রিক সংস্কার

ও ঐতিহ্য। কারণ তন্ত্রমতে পুরুষ বা শিব নিষ্ক্রিয় চৈতন্য মাত্র, প্রকৃতি বা শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ। সর্বকর্মের মূলাধার হচ্ছেন পরমাপ্রকৃতি বা মহাশক্তি।[৬] এ'জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে মানবের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সাংসারিক ও জাগতিক প্রয়োজন-সিদ্ধি ও সমস্ত আপদ্-বিপদ নিবারণের জন্য এবং চতুর্বর্গলাভের জন্য শক্তি-আরাধনামূলক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলনের ফলে বাংলার জাতীয় জীবনে তন্ত্রের এই শক্তিতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। এক চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বিপাকের সম্মুখে যুগ-প্রয়োজনেই বাঙ্গালীর এই শাক্ত-সংস্কার বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুতঃ, তন্ত্র-প্রভাবজাত বাঙ্গালীর শাক্ত-মানসিকতা ও শক্তিদেবীর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্ব ও মঙ্গলকাব্যের দেবী-মহিমা

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক শক্তি দেবতাদের মাহাত্ম্য-কীর্তন করাই এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল।[৭] কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যের সমস্ত দেবতাই লৌকিক নয়। এঁদের মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতাও রয়েছে। বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যের শক্তিদেবীদের কারোই লৌকিক রূপটি অক্ষুণ্ণ থাকে নি। এই সকল দেবীদের উপর যেমন একটা পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপিত হয়েছে, তেমনই আবার এই সকল দেবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত পুরাণের শক্তিপূজা ও শক্তিতত্ত্বের উপর যে তন্ত্রের প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য, তা' আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই আলোচনা করেছি। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পৌরাণিক ধর্মের তিন-চতুর্থাংশই তান্ত্রিক উপকরণ ও উপাদান। এই তান্ত্রিকতার পটভূমিকাই বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয়, এ'কথা বিস্মৃত হলে বাঙ্গালীর জাতীয় মানসের স্বরূপ বোঝা যাবে না। ষোড়শমাতৃকা পূজা তান্ত্রিক, অথচ এই পূজাটি না ক'রে বৈদিক কর্মাঙ্গীভূত অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠান বাঙ্গালী-সমাজে বিধিবহির্ভূত। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী হিন্দুর পূজানুষ্ঠান ও ধর্মাচরণে গুপ্তযুগ থেকেই[৮] তান্ত্রিকতার পরিচয়টি প্রকট। প্রাগার্যযুগেও বাংলার অধিবাসীদের মন্ত্র-বিশ্বাস, নানা প্রকার গুহ্যক্রিয়া-আচারানুষ্ঠান, শক্তিপূজার প্রবণতা প্রভৃতির মধ্যে তান্ত্রিক-চেতনার একটা স্বাক্ষর আছে ব'লে পণ্ডিতদের অনুমান।[৯] আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তন্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালীর বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম-সংস্কৃতিকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছে, তেমনই বাংলার আদিম অধিবাসীদের ধর্ম-

ভাবনা তান্ত্রিকতার মধ্য দিয়েই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এই তন্ত্রধর্ম-প্রবণতা ও তান্ত্রিক সংস্কার বাঙ্গালীর মজ্জাগত বলেই বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্রগুলি তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের আলোকেই অভিব্যক্ত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশপর্বে বাংলার জাতীয় জীবনের সর্বত্র তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন ছিল বলেই মঙ্গলকাব্যের তন্ত্র-প্রভাবের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবীচরিত্রগুলির উৎস লৌকিক বা পৌরাণিক যাই হোক না কেন, এই দেবীচরিত্রগুলি তান্ত্রিকতার আলোকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই সকল শক্তিদেবী তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়েই কাব্যে রূপায়িত হয়েছে।

তন্ত্রে শক্তিই প্রধান এবং তন্ত্রের শক্তিমাহাত্ম্য ও শক্তিতত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে,— এক আদ্যাশক্তি থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত হচ্ছে এবং সমস্ত শক্তি দেবীই সেই এক মহাশক্তির অংশ বিশেষ। আমরা বাংলা মঙ্গলকাব্যের মনসা, চণ্ডী, শীতলা, অন্নদা প্রভৃতি সমস্ত দেবীচরিত্রের মধ্যেই তন্ত্রের এই শক্তিতত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন দেবীর মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র ক'রে ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমস্ত দেবীই যে মূলতঃ অভিন্না এবং এক আদি মহাশক্তির বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিমাত্র,—এই তত্ত্বটি বাংলা মঙ্গলকাব্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও মঙ্গলকাব্যে এক দেবীর সঙ্গে অন্যদেবীর চূড়ান্ত বিবাদের চিত্র কাহিনীর প্রথমাংশে বর্ণিত হলেও আখ্যানভাগের শেষে এক অদ্বয়-মহাশক্তির তত্ত্বালোকে সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যকারেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে, সকল দেবীই মূলতঃ অভেদ এবং সেই এক মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা প্রকাশমাত্র; শক্তিদেবী মাত্রই সেই পরমা শক্তির মূর্ত প্রতীক। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় সমস্ত দেবীমাহাত্ম্য-আখ্যানই তন্ত্রোক্ত এই শক্তিতত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উল্লেখ করতে পারি। মনসাদেবীর মর্ত্যে চাঁদসদাগর কর্তৃক পূজাগ্রহণ ও মহিমা-প্রতিষ্ঠার ঘটনান্তর্গত চণ্ডী ও মনসার পারস্পরিক প্রচণ্ড বিরোধ কাহিনীর শেষাংষে এক পরম মিলন-মধুর সম্পর্কে অবসিত হয়েছে। চণ্ডীর পরমভক্ত চাঁদ সদাগর চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়েও যখন মনসা-পূজায় অস্বীকৃত হলেন, তখন চণ্ডীদেবী দৈববানী করেছেন,—

"পদ্মাবতী পূজা কর চাঁদ সদাগর।
একই মূর্তি দেখ সব না ভাবিও আর।।

* * *

যেই জান ভগবতী সেই বিষহরি।
পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি।।"[১১]

অতঃপর চাঁদসদাগর যখন মনসাদেবীর পূজা সমাপনান্তে মনসাদেবীর স্তব পাঠ করছেন, সেখানেও মনসাদেবীকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,—

"নমো নমঃ জগৎমাতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি মোক্ষ তুমি বিশ্বজননী।।
তুমি জল তুমি স্থল চরাচরবন্দিনী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি মূলধারিণী।।"[১২]

এখানে মনসার স্তুতিতে তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বেরই প্রভাব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ মনসাদেবীকে 'মূলধারিণী' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। 'মূলধারিণী' অর্থে মূলাধারবাসিনী 'কুণ্ডলিনী' শক্তিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও আমরা দেখতে পাই যে, মনসাদেবী সর্বশক্তিস্বরূপিণী জগন্মাতারূপেই বন্দিতা হয়েছেন। এই কাব্যে মনসাদেবী চাঁদসদাগরকে আত্মপরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে বলছেন,—

"আকাশ পাতাল ভূমি সৃজন সকল আমি
শক্তিরূপা সভাকার মাতা।
মহেশের মহেশ্বরী মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপা নারায়ণ যথা।।"[১৩]

কাব্যের কাহিনী-অংশে মনসাকে শিবের কন্যা বলা হয়েছে, অথচ উপরি-উক্ত অংশে 'মহেশের মহেশ্বরী'রূপে দেবী নিজেকে আখ্যায়িত ক'রে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমূর্তিতে আবির্ভূতা সেই আদ্যাশক্তি সনাতনী। তাই, চাঁদসদাগর তাঁর স্তুতি করেছেন,—

"আদ্যাশক্তি সনাতনী মুক্তি প্রদায়িনী
জগত পূজিতা জয়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কে বুঝিবে তব মায়া।।"[১৪]

বাংলা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারায় বর্ণিত লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যেমন পৌরাণিক উপাদান মিলিত হয়েছে, তেমনই আবার তান্ত্রিক ভাবধারাও চণ্ডীদেবীর সর্বকর্তৃত্বময়ী

মহাশক্তিতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, বাংলা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকাহিনীতে চণ্ডীদেবীর রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় তন্ত্রের প্রভাব যে সবিশেষ ক্রিয়াশীল, তা' শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় নানাভাবে বিচার ক'রে দেখিয়েছেন।[১৫] বস্তুতঃ বাংলা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকাহিনীতে চণ্ডী দেবীর রূপ-মহিমার সূত্রটি তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্ব এবং দেবীর তান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যে সংগ্রথিত রয়েছে, তা' নিম্নোদ্ধৃত অংশসমূহ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হবে। যেমন,—

(১) "চণ্ডিকা চামুণ্ডা ভীমা প্রচণ্ড মহিমা
চণ্ডমুণ্ড কালী কাত্যায়নী।
উগ্রচণ্ডা রূপ ধরি ঘাতিলা দেবের অরি
অমরাএ স্থাপিলা বজ্রপাণি।।"[১৬]

(২) "ভবানী ভামিনী গৌরী ভদ্রকালী মহেশ্বরী
ভবের বনিতা সর্বজয়া।
ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরি ভস্ম কর যথা বৈরী
ভয়হেতু ভাবম অভয়া।।
* * *
সাবিত্রী গায়ত্রী মেধা শক্তিরূপা স্বাহা স্বধা
শক্তিহস্ত অসুর নাশিনী।
* * *
শিবানী সারদা ষষ্ঠী সকল তোমার সৃষ্টি
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবনে।"[১৭]

(৩) "পূর্ণ মেঘের ধ্বনি চামুণ্ডা গর্জিনী।
গলে শোভে নরমুণ্ডমালা।
জঘনে বসনহীন ক্ষণে দিগাম্বরী-চিন
অমাবস্যা নিশি নির্মলা।।
অসি-পাশ পরিচ্ছদা দক্ষিণ করেত গদা
ভূপতি শিয়রে অভ্রছায়া।
করাল বদন করি ঘন ঘোর নাদ পুরি
স্বপ্ন কহেন মহামায়া।।"[১৮]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বের মাধ্যমেই। যথা,—

(১) "তুমি আদ্যা মহামায়া শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া
গিরিকন্যা ঈশান গৃহিনী।
আগম-নিগম তন্ত্র বীজরূপা নানা মন্ত্র
বেদমাতা বিশ্বের জননী।।
যোগময়ী যোগত্রাণী শক্তিভূতা সনাতনী
ত্রৈবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবনধাত্রী
শক্তিরূপা সংসার-বাসনা।।
* * *
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ-তম-সত্ত্ব
বেদমাতা সাবিত্রীরূপিনী।।"[১৯]

(২) "কোথাও সংহতি নাহি চিন্তিলেন গোঁসাঞি
আপনারে অসক্ত সমান।
চিন্তিলেন এমন কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।।"[২০]

(৩) "চণ্ডা চণ্ডাবতী চণ্ডী প্রচণ্ডী দানবখণ্ডী
অর্পণা অম্বিকা নারায়নী।
দূর্গা দুর্গা পরাবলী দুর্জয়া দক্ষিণাকালী
মহেশ্বরী শিখরবাসিনী।।
* * *
কান্তি কীর্তি কপালিনী কলাবতী কমলিনী
কুণ্ডলিনী লীলা কামেশ্বরী।।
কমলা কমলমালী কুমুদকর্ণিকা কালী
কৈলাসবাসিনী শাকম্ভরী।
ইন্দ্রানী রুদ্রাণী সৃষ্টি সর্বাণী মৃড়ানী তুষ্টি
ডম্বুরবাদিনী ভয়ঙ্করী।।

ডাকিনী হাকিনী সীমা গোপসুতা বর্গভীমা
কৃপাময়ী আমি কাত্যায়নী।
শঙ্করী শিবানী নিত্যা বারাহী নৃসিংহী সত্যা
আমি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী ।।”[২১]

(৪) “ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য-তারিণী।
ত্রিশক্তিরূপিনী তুমি কুরঙ্গনয়নী ।।

* * *

পশুপতি প্রজাপতি পুরুষপ্রধান।
পদ্মযোনি পুরন্দর নিতি করে ধ্যান ।।
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
পশুসম ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি ।।”[২২]

এইভাবে দেখা যায় যে, মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যকাহিনীতে চণ্ডীদেবী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তন্ত্র-বর্ণিত শক্তিবাদের কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বান্তর্গত আদ্যাশক্তির সর্বকর্তৃত্ব, পরমাশক্তির বিভিন্ন তান্ত্রিক রূপ ও নাম প্রভৃতি চণ্ডীদেবীর লৌকিক কাহিনীর বিভিন্ন প্রসঙ্গে আরোপিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সমসাময়িক কালে বাঙ্গালী-মানসে মহাশক্তির তন্ত্রোক্ত রূপ-প্রকৃতি সমুজ্জ্বল ছিল বলেই ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাহিনীতে চণ্ডীমাহাত্ম্য তান্ত্রিক ভাবনার মধ্য দিয়েই বিঘোষিত হয়েছে।

তান্ত্রিক-সিদ্ধান্তে সমস্ত দেবীই সেই এক ও অদ্বিতীয়া পরাপ্রকৃতি-মহাশক্তির পৃথক পৃথক রূপ ও নাম মাত্র। সেইজন্য বাংলার ‘শীতলামঙ্গল’, ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’, ‘কমলামঙ্গল’ প্রভৃতি দেবীমঙ্গল অখ্যানে কীর্তিত শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা ইত্যাদি সমস্ত দেবীকেই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাদেবী মহেশ্বরীর সঙ্গে অভিন্নারূপেই ঐ সকল দেবী স্তুতা হয়েছেন। কবি কৃষ্ণরাম দাসের ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’ ও ‘শীতলামঙ্গল’ কাব্যে ষষ্ঠী ও শীতলাকে দেবীদুর্গার সঙ্গে একীভূতারূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,—

(১) “দুর্গানামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ ।।”[২৩]

(২) কাতর হইএ অতি করে করপুটে স্তুতি
কৃপা কর জগতজননী।

* * *

দুর্গা দুর্গা পারা দক্ষ মক্ষ হারা
দুর্গতি রাখহ দীনেরে ॥

* * *

বিধিবিষ্ণু মায়া বিধি বিষ্ণুপ্রিয়া
বরমই বিষ্ণুধাতা।
সংখিনি শূলিনী সংকর গৃহিণী
শৈলসুতা সিবাদাতা ॥”[২৫]

কবি কৃষ্ণরামের ‘কমলামঙ্গলে’ও লক্ষ্মীদেবী মহামায়া-জগজ্জননী পরমাশক্তিরূপে কীর্তিতা হয়েছেন। যথা,—

(১) “সকলের শক্তি তিনি জগতের মাতা।
সত্বরে কহিনু রাজা এই সত্য কথা ॥
ঈশ্বরের শকতি তিনি ভাবিলে এক হয়।
ভাবিলে মুকতি পদ শুন মহাশয় ॥”[২৬]

(২) “জগতজননী তুমি সনাতনী একা।
সদয় হইয়ে নিজ রূপ দিয়া দেখা ॥

* * *

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যার নিত্য পূজা করে।
তাহারে করিতে স্তব কোনজন পারে ॥”[২৭]

সাধু কর্তৃক কমলাদেবীর পূজা-পদ্ধতির মধ্যে তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত রয়েছে; যথা,—

“একশত ছাগ বলি বাছিয়া ধবল।
রুধির খর্পর ভরি ভকতি করিল ॥[২৮]

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও দেবী অন্নদার বর্ণনা তন্ত্রের আলোকে উদ্ভাসিত; যথা,—

(১) “তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রী দুঃখ হরা
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ।

আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।[২৯]

(২) "অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপনসমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি।।[৩০]

(৩) "বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়।।
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল।।
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।।
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশ্বত্ব।।"[৩১]

(৪) "অম্বিকা অন্নদা শঙ্করী শারদা।
জয়ন্তী জয় কারিনী।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা করালী কালিকা
ত্রিপুরা শূলধারিনী।।"[৩২]

ভরতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের প্রসঙ্গে মশানে সুন্দরের কালীস্তুতিটি দেবী কালিকার তন্ত্রোক্ত স্তব ও নামাবলীর অনুসরণেই রচিত। সুন্দর অ-কারাদি ক্রমে 'ক্ষ'-বর্ণ পর্যন্ত পঞ্চাশ অক্ষরে কালিকা দেবীর স্তুতি করেছে। যথা,—

'সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে।।"[৩৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে অ-কারাদি পঞ্চাশটি বর্ণকে[৩৪] মাতৃকাবর্ণ বলা হয়। ইহাই বর্ণমালা।[৩৫] তন্ত্রশাস্ত্রের ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি যাবতীয় নিগূঢ় সাধনরহস্য এই মাতৃকাবর্ণ-তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত। আদ্যাশক্তি মহামায়াও স্বয়ং এই বর্ণময়ী। এই বিষয়ে 'কামধেনুতন্ত্রে' (১।৭)

উক্ত হয়েছে যে,—

(১) "পঞ্চাশন্মাতৃকাদেবীং নানাসুখবিলাসিনী।
নানাবিদ্যাময়ীং দেবীং মহাবিদ্যাময়ীং তথা।।"

[দেবী আদ্যাশক্তি পঞ্চাশৎ মাতৃকারূপে নানা সুখ বিলাসে ক্রীড়া করেন। তিনি নানাবিদ্যা (মন্ত্র) রূপিণী বিদ্যা এবং তিনিই স্বয়ং মহাবিদ্যাস্বরূপিনী।]

(২) "অ-কারাদি ক্ষ-কারান্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।"
—'কামধেনুতন্ত্র' (৪।৭৮)।

['অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত বর্ণ প্রত্যেকেই স্বয়ং পরমা কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র।]

বস্তুতঃ, তন্ত্রশাস্ত্রে এই পঞ্চাশৎবর্ণ-তত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রেই সমস্ত প্রকার সাধনার তাৎপর্য ও রহস্য বিবৃত হয়েছে। এই বিষয়ে Sir John Woodroffe সাহেবের "The Garland of Letters (varnamala)" নামক গ্রন্থটিতে সবিস্তারে আলোচনা রয়েছে।

ভারতচন্দ্র বিভিন্ন শাস্ত্রে ও বিষয়ে যে সুপণ্ডিত ছিলেন, তা' সর্বজনবিদিত। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গেও যে ভারতচন্দ্রের বিশেষ পরিচিতি ছিল, তা' তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। নিম্নে দু'টি অংশ উদ্ধৃত হল :—

(১) "বিস্তর অন্নদাকল্পে[৩৬] -- কতগুণ কব অল্পে
নিজ গুণে হবে বরদায়।
নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।।"[৩৭]

(২) "একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত।।"[৩৮]

ভারতচন্দ্রের অন্নদাদেবীর পরিকল্পনায় এবং 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কাহিনীর বিভিন্ন অংশে তন্ত্র-প্রভাব এবং তান্ত্রিক ভাবধারা সবিশেষ ক্রিয়াশীল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতচন্দ্র যে সময়ে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ও বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনার প্রবাহ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। এ'সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে আরও আলোচনা করব।

বাংলার 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে ('বিদ্যাসুন্দর') তন্ত্র-প্রভাব সবিশেষ প্রকট। কালী তান্ত্রিক দেবী। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে দেবী কালিকার রূপ-পরিকল্পনা ও মাহাত্ম্য-বর্ণনা

তন্ত্রের অনুসরণেই রচিত। বিশেষতঃ শ্মশানে সুন্দরের শব-সাধনার বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে যেন তন্ত্র গ্রন্থের বাংলা ভাষ্য। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা করব।

প্রকৃতপক্ষে, তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের আলোকেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন দেবী মহিমার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। এই সকল দেবীরা লৌকিক বা পৌরাণিক যে-কোন উৎস থেকেই আবির্ভূতা হোন না কেন, এঁদের রূপ-প্রকৃতিতে তান্ত্রিক প্রভাব যে গভীরভাবে পড়েছে, এ'কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তন্ত্রে মহাশক্তি একদিকে ভয়ঙ্কররূপিণী ভৈরবী এবং অপরদিকে কল্যাণময়ী—ভক্তবাঞ্ছাপুরণকারিণী জননী। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মধ্যে আমরা এই তান্ত্রিক শাক্ত-ঐতিহ্যের আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করি। তন্ত্র-প্রভাবের ফলেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্নরূপিণী শক্তিদেবতাগণ সেই এক আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর ভূমিকায় আরোহণ ক'রে পরস্পর মিলনের শাশ্বত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

বাংলার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের আখ্যানাংশে ও ভাববস্তুতে তন্ত্রানুগ ভাবধারা :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-অংশে, পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, চৌতিশাস্তব প্রভৃতি স্থানে আমরা তন্ত্রোক্ত ভাবধারা, তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিকযোগের পরিচয় পাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির যে কালপর্ব,[৩৯] সেই কালপর্বে বাংলার জাতীয় জীবনে ও গণমানসে তন্ত্রের প্রভাব নানাদিকে পরিব্যাপ্ত।[৪০] বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙ্গলীর মূল ধর্মই ছিল তান্ত্রিক-শাক্ত ধর্ম। মধ্যযুগে বাঙ্গলীর জীবন-প্রবাহ ও ধর্ম প্রধানতঃ তন্ত্রাশ্রয়ী ছিল।[৪১] এই কারণেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী, মনসা, অন্নদা, কালিকা প্রভৃতি দেবদেবীর রূপ ও পরিকল্পনায় তান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থ (আদি পর্ব) থেকেও আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডী, বাসলী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিদেবীর তান্ত্রিক মতে পূজা অনুষ্ঠান চলত। ফলে, বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশে তন্ত্রোক্ত ভাবধারা ও তান্ত্রিক যোগাদির স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। আমরা এইবার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী-আলোচনা ক'রে তন্ত্র-প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করব।

বাংলা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় যে তন্ত্রের প্রভাব রয়েছে, তা'শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় নানাভাবে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন।[৪২] তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের চণ্ডীদেবীকে তন্ত্র-প্রভাবজাত এক মিশ্রদেবতা বলেছেন।[৪৩] বস্তুতঃ, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকাহিনীতে চণ্ডীদেবীর রূপ-প্রকৃতি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা' বিশ্লেষণ করলে এই দেবীর উপর তান্ত্রিক ও পৌরাণিক উভয় ভাবধারার অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। "'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য পাঠ করিলে চণ্ডীদেবীর যে মূর্তি প্রধানতঃ চোখে পড়ে, কোন বৌদ্ধ বা আদিম গোষ্ঠীর দেবী অপেক্ষা পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মাতৃ-মূর্তির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বেশী।...বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে এবং পুরাণে ও তন্ত্রে স্বীকৃত মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর বেশ মিল পাওয়া যায়।"[৪৪] বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্মে এবং মানসিকতায় যে-তান্ত্রিক-চেতনা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে, তারই ফলে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকাহিনীর নানা অংশে তন্ত্র-প্রভাব সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমেই দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির বিষয় আলোচনা করা যাক্। দ্বিজ মাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য তন্ত্র-প্রভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিজমাধব কাব্যের ভণিতায় অধিকাংশ স্থানে 'সারদা' নাম ব্যবহার করেছেন এবং সমগ্র গীতটিকে তিনি 'সারদা-চরিত' নামেও অভিহিত করেছেন ;যথা,— "দ্বিজ মাধব গায় সারদাচরিত।"[৪৫] কাব্য সম্পাদক এই নামকরণের পশ্চাতে তন্ত্র-প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[৪৬] এই প্রসঙ্গে শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—"কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হইল, একদিকে ইহা যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যগুণের অধিকারী, অন্যদিকে মঙ্গলচণ্ডীর উপর তন্ত্রের প্রভাব-সম্বন্ধে ইহাতে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।...দ্বিজমাধবের কাব্যে পুরাণ অপেক্ষা তন্ত্রের প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।"[৪৭]

দ্বিজমাধবের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যারম্ভে সূর্য, গণেশ, সারদা, গুরু, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দশদিকপাল, নবগ্রহ প্রভৃতি সর্বদেবদেবীর বন্দনা-অংশটির মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। কবি 'সর্ব-দেবদেবী-বন্দনা' নামক একটি বিশেষ অংশ কাব্যে সংযুক্ত করেছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' বিভিন্ন দেবতার বন্দনা আছে। কিন্তু, দ্বিজমাধব যেভাবে প্রথমে গুরুকে বন্দনা ক'রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইন্দ্রাদিদশদিকপাল, আদিত্যাদিনবগ্রহ প্রভৃতি সর্বদেবতার বন্দনা করেছেন, তা' মুকুন্দরামের কাব্যে নাই। দ্বিজমাধবের কাব্যে এই গুরুবন্দনা এবং 'সর্বাদেবদেবীর বন্দনা' তন্ত্র-প্রভাব সূচিত করে। কারণ, তন্ত্রে গুরুর প্রাধান্য আপরিসীম ব'লে সর্বকর্মারম্ভে গুরুর পূজা ও বন্দনা করতে হয় এবং সর্বদেবদেবীর অর্চনা করা তান্ত্রিক পূজা-বিধির অপরিহার্য অঙ্গ। দ্বিজমাধবের কাব্যের প্রথমেই যে 'সূর্য-বন্দনা'র অংশটি সংযুক্ত হয়েছে, তা'তন্ত্র-প্রভাবের ফল ব'লে

অনুমান করেছেন শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়।[৪৮] তাঁর মতে "মঙ্গলচণ্ডীর মূলে সরস্বতী বা অন্য কোন বিদ্যাদেবী বর্তমান।"[৪৯] তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীবিদ্যার অর্চনার প্রথমেই সূর্যপূজায় বিধান দেওয়া হয়েছে।[৫০] দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক বর্ণনা প্রদান করেছেন;—

"ধবলবসন দেবী ধীর গম্ভীর।
পঞ্চাশ অক্ষরে যার নির্মাণ শরীর।।"[৫১]

এখানে "পঞ্চাশ অক্ষর' অর্থে তন্ত্রোক্ত 'পঞ্চাশৎমাতৃকাবর্ণ' সমূহকে নির্দেশ করা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মাতৃকাসরস্বতীর ধ্যানে উক্ত হয়েছে যে, মাতৃকাদেবীর শরীর পঞ্চাশদ্বর্ণময়।[৫২] দেবীসরস্বতী সর্বজ্ঞান ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। এই কারণেই তিনি স্বয়ং বর্ণময়ী। এই বিষয়ে 'সারদাতিলক' নামক তন্ত্রগ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী-পূজার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির অনুসৃতি। নিম্নে কলিঙ্গরাজের পূজার অংশটি উদ্ধৃত হল :—

"নাসিকা ধরিয়া হাতে সুষুম্না নাড়ীর পথে
ভূতশুদ্ধি করে দণ্ডধর।
অঞ্জলি রাখিয়া অঙ্কে সলিল পুরিয়া শঙ্খে
সংক্ষেপে স্মরে বীজাক্ষর।।
তাহা স্থাপি পঙ্করাজে পাপ পুরুষ দেবী মাঝে
পূরক কুম্ভকে কৈল ক্ষয়ে।
বামপুট নিঃশ্বাসে রেচক করয়ে শেষে
কালিকা ভাবিয়া হৃদয়ে।।
প্রণাম করিয়া রাজা হৃদে ভাবে দশভূজা
মনে পূজা করিয়া তখন।
শঙ্খপাত্র স্থাপিয়া তথা গন্ধ পুষ্প দিয়া
বীজাক্ষর করিলা স্মরণ।।
সেইজল কুশ আগে দর্ভ প্রক্ষ ভাগে ভাগে
আপনারে কৈল প্রক্ষালন।
শিব আদি পঞ্চদেবে ভক্তিযুক্ত হইয়া সেবে
তবে পূজে নবগ্রহগণ।।

করে জবা পুষ্প ধরি　　লোচন মুদিত করি
ভাবনায়ে পাইল নিকটে।
ষোড়শে করিয়া পূজা　　তুষিলেক দশভূজা
পুষ্প তুলিয়া দিল ঘটে।।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী　　গন্ধ পুষ্প ধূপ খানি
হোমের গঠিল কলানিধি।
দিয়া নৈবেদ্য মধুপর্ক　　হইয়া রাজা সতর্ক
বলিদান কৈল বহুবিধ।।
ভূপতির পূজা পাইয়া　　ধনে পুত্রে বর দিয়া
গেলা দেবী কৈলাসশিখরী।
দ্বিজ মাধবানন্দে　　তরিতে সংসার ধন্দে
হৃদয়ে ভাবিয়া মহেশ্বরী।।"[৫৩]

কলিঙ্গরাজের দেবী-পূজার উপরি-উক্ত বর্ণনাটি তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির এক স্বচ্ছ আলেখ্য। কবি এখানে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ষোড়শোপচার পূজা-পদ্ধতির প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ধ্যান, মানসপূজা, বিশেষার্ঘ্য-স্থাপন ('শঙ্খ পাত্র স্থাপিয়া'), শিবাদিপঞ্চদেবতার পূজা, বলিদান, হোম প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গসমূহের এক যথার্থ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'সৃষ্টিকথা'[৫৪] বর্ণনায় তন্ত্রোক্ত পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের ছায়া-সম্পাত ঘটেছে। আমরা তান্ত্রিক সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে 'নাথসাহিত্য ও তন্ত্র' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিজমাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' তন্ত্র-প্রভাবের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে "শিবের নিকট নীলম্বরের মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান শিক্ষা।" নিম্নে এই অংশটি উদ্ধৃত হল :—

"হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি।
কর্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী।।
কর্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে।
সে সব কারণ কহি বৈসয়ে নিকটে।।
শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর।।
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।।

জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরশান।
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান্॥
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়া পিণ্ডে হৈব দেখা নিশ্চল শরীর॥
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত॥
সে অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান।
নহি টালিবেক পথ সুস্থির পরাণ॥
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন॥"[৫৫]

উপরি উক্ত অংশ মহাদেব নীলাম্বরকে তান্ত্রিক যোগের কথাই বলেছেন। উদ্ধৃতাংশে 'ইড়া' ('ইঙ্গলা'), 'পিঙ্গলী' ও সুষুম্না নাড়ীতত্ত্ব, সহস্রার পদ্ম ('সহস্রদল পদ্ম'), 'নবদ্বার' প্রভৃতির মাধ্যমে তান্ত্রিক ষট্চক্রভেদের কথা বলা হয়েছে। অমরত্ব লাভের জন্য নীলাম্বরের এই কায়াসাধন প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক সাধনারই পরিচয়াক। এই 'মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান' বা 'কায়াসাধন' সম্পর্কে নাথ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিজমাধবের কাব্যে কালকেতু কর্তৃক দেবীর চৌতিশাস্তব এবং মশানে শ্রীমন্ত কর্তৃক দেবীর চৌতিশা স্তবের মধ্য দিয়ে আদ্যাশক্তি মহামায়ার শক্তিতত্ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাংলার মঙ্গলকাব্যে এই 'চৌতিশা-স্তব' তন্ত্র-প্রভাবের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'চৌতিশা'র অর্থ ক-কারাদি চৌত্রিশটি অক্ষরে দেবতার স্তব। এই ক-কারাদি স্তবে তন্ত্রশাস্ত্রের পূর্বোক্ত 'বর্ণমালা'র প্রভাব রয়েছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রায় সমস্ত 'চৌতিশা' স্তবই শেষ হয়েছে 'ক্ষ' বর্ণের দ্বারা। যথা,—

(১) "ক্ষেমঙ্করী মূর্তি ধরি ক্ষয় কর যথ অরি
ক্ষম দোষ অভয়া পার্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া ক্ষিতি তলে লোটাইয়া
ক্ষয় কর দাসের দুর্গতি॥"

তুর চৌতিশা'।[৫৬]

(২) "ক্ষ-য়ে ক্ষেমঙ্করী-রূপে করিলা পালন।
খ্যাতি রাখিলা রাখি ত্রিদশের দেবগণ॥"

—'শ্রীমন্তের চৌতিশা'।[৫৭]

তন্ত্রশাস্ত্রে এই 'ক্ষ' হচ্ছে বর্ণমালার মেরু।[৫৮] এই 'বর্ণমালা' বা মাতৃকাবর্ণ সমূহের তত্ত্বজ্ঞান-লাভই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থেই মাতৃকাবর্ণ সমূহের তত্ত্ব পরিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধির পরমতত্ত্বের কথা বিবৃত হয়েছে। এই বর্ণসমূহ হচ্ছে শারদারূপিণী আদ্যাশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র।[৫৯] পরমাশক্তি স্বয়ং বর্ণরূপিণী, এ'কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। বাংলা মঙ্গলকাব্যে 'চৌতিশা স্তবে'র মধ্যে বাঙ্গালী-মানসের বহুযুগবাহিত তান্ত্রিক ভাবপ্রাধান্যেরই পরিচয় রয়েছে। দেবীতত্ত্বের সঙ্গে 'বর্ণতত্ত্বে'র যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে রয়েছে, তা'তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রচর্চার প্রাচীন পীঠভূমি বাংলাদেশে বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিল। ফলে, বাঙ্গালী কবিগণ লৌকিক বা পৌরাণিক যে-কোন শ্রেণীর দেবীই হোক না কেন, তাঁর বন্দনায় 'চৌতিশাস্তবের মাধ্যমে তাঁকে সর্বশক্তিময়ী জগজ্জননীর পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং মহাশক্তির তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন নাম স্মরণও করেছেন।

বস্তুতঃ, দ্বিজমাধবের কাব্যে দেবীর যে 'শান্তোগ্র'[৬০] রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তান্ত্রিকভাবধারার পরিচয় সুস্পষ্ট এবং তাঁর কাব্যের নানা স্থানে তন্ত্র-প্রভাব প্রকট।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও তন্ত্র-প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। মুকুন্দরাম কাব্যারম্ভে যে 'গণেশ বন্দনা' করেছেন, সেই বন্দনাংশে প্রথমেই তিনি 'আগম' অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন; যেমন,—

"বন্দো দেব গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিল আগম পুরাণ।।"[৬১]

গণেশের রূপবর্ণনায় কবি তন্ত্র-বর্ণিত গণেশের ধ্যানমন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশকে স্মরণ করেছেন। কবির 'গণেশ বন্দনার "শশিকলা মুকুটে মণ্ডন", "বিগলিত মদজলে মধুলোভে অলিকুলে"[৬২] প্রভৃতি অংশ তন্ত্র-বর্ণিত গণেশ-ধ্যানেরই অনুরণন। সরস্বতীর বন্দনায় কবি "বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী"[৬৪] বলে স্তুতি করেছেন; এ'কথা যে তন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি, তা'দ্বিজমাধবের কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সরস্বতীর বন্দনার "শিরে শোভে ইন্দুকলা"[৬৫] প্রভৃতি অংশ তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্র 'তরণশকল মিন্দোর্বিভ্রতী'[৬৬] ইত্যাদিরই অনুরণন। মুকুন্দরামের সরস্বতীর বন্দনায় দেবীর হস্তে শুকশিশুর উল্লেখটি ('শুকশিশু শোভে বাম করে'[৬৭]) 'কামধেনুতন্ত্রে' (৫। ১২) মাতৃকাসরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়; যথা,—"নানাবিদ্যাময়ীং দেবীং শেতাংশুক পরিস্থিতাম্।"

মুকুন্দরামের কাব্যের 'সৃষ্টি প্রকরণ' অংশটি সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিফলন। তন্ত্রের শিব-শক্তি বা পুরুষ প্রকৃতি সহযোগে সৃষ্টিলীলার বিষয়টিই মুকুন্দরামের আদিদেব ও আদিদেবীর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে, পরমপুরুষ বা শিব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যমাত্র; শক্তি বা পরমা প্রকৃতি ব্যতীত তিনি ক্রিয়াক্ষম নন।[৬৮] মুকুন্দরামের কাব্যেও এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। যথা,—

"আদিদেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ ॥

* * *

কোথাও সংহতি নাহি চিন্তিলেন গোঁসাঞি
আপনাদের অসক্ত সমান ॥
চিন্তিলেন এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।"[৬৯]

এরপর পুরুষ-প্রকৃতি সহযোগে সৃষ্টিতত্ত্বটি কবি সুন্দররূপে বর্ণনা করেছেন।

"একদেব নানা মূর্তি হইলা মহাশয়।
হেম হইতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয় ॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপময় হৈল তথি তনয় মহান ॥
মহতের পুত্র হৈল নাম অহঙ্কার।
যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার ॥
অহঙ্কার হৈতে হৈল এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥
এই পঞ্চজনে লোক বলে পঞ্চভূত।
ইহা হইতে প্রাণী বৃদ্ধি হৈল বহুত ॥
গুণভেদে একদেব হৈল তিনজন।
রজোগুণে হৈল ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ ॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ ॥"[৭০]

তন্ত্রশাস্ত্রে শিব-শক্তি তত্ত্বের সাহায্যে যেরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, উপরি-উক্ত অংশগুলিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। তন্ত্রে কথিত হয়েছে যে, প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তির গুণক্ষোভেই সৃষ্টির বিকাশ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমশিব বা পরমব্রহ্ম মূলপ্রকৃতিতে উপহিত হলেই আদ্যাশক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি থেকেই মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। তৎপর অহঙ্কারতত্ত্ব থেকে পঞ্চভূতের সৃষ্টি। মূলপ্রকৃতির গুণক্ষোভেই রজঃ, সত্ত্ব এবং তমঃ গুণকে আশ্রয় ক'রে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব। তন্ত্রশাস্ত্রের এই সৃষ্টিপ্রকরণের[৭১] আলোকেই মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'সৃষ্টিপ্রকরণ'টি রচিত। তন্ত্রের অনুসরণেই কবি বলেছেন যে, দেবী সতী বা পার্বতীই স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি এবং তিনিই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণস্বরূপা। যথা,—

"ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্যা সুতা সতী।
বন্দী মোক্ষ হেতু দেবী আপনে প্রকৃতি॥"[৭২]

কেবল 'চণ্ডীমঙ্গল' নয়, বাংলা মঙ্গলকাব্যের সমস্ত শাখাতেই 'সৃষ্টিপ্রকরণ' অংশে তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্বের ছায়াপাত ঘটেছে। আমরা 'ধর্মমঙ্গল' এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্য-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে 'কালকেতুর চৌতিশাস্তুতি'তে দেবীর তন্ত্রোক্ত নামরূপাদির প্রতিফলন ঘটেছে। যথা,—

"কালী কপালিনী কান্তা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রি কুন্দমুখী কত জান কলা।
* * *
ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রৈলোক্য-তারিণী।
ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি কুরঙ্গনয়নী॥
* * *
নিগম[৭৩] নিগূঢ়া তুমি নিদ্রা সনাতনী।
নৃপতি নিলয়ে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী॥
* * *
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষপ্রধান।
পদ্মযোনি পুরন্দর নিতি করে ধ্যান॥
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতি-রূপিণী।
পশুসম ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি॥"[৭৪]

কালকেতু কারাগারে বন্দীদশায় চণ্ডীদেবীর যে মন্ত্রাদি স্মরণ করেছে, তা'যে তান্ত্রিক মন্ত্র, নিম্নোক্ত অংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"সোঙরে চণ্ডিকা মন্ত্র পূজার বিধান-তন্ত্র
মনে মনে পূজে ভগবতী।"[৭৫]

কালকেতু-উপাখ্যানে 'দেবীর শতনাম কথনে'র মধ্য দিয়েও দেবীর তন্ত্রোক্ত নামাদির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

"কান্তি কীর্তি কপালিনী কলাবতী কমলিনী
কুণ্ডলিনী লীলা কামেশ্বরী।
কমলা কমলামালী কুমুদকর্ণিকা কালী
কৈলাসবাসিনী শাকম্ভরী॥"[৭৬]

'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'কালীতন্ত্র', 'বিশ্বসারতন্ত্র', 'মহানির্বাণতন্ত্র' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে দেবীর 'শতনাম' স্তোত্রাদিতে উল্লিখিত নামসমূহ মুকুন্দরামের কাব্যের 'চৌতিশাস্তুতি', 'শতনাম কথন' প্রভৃতিতে বহুলাংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

কালকেতুর মুক্তির জন্য কলিঙ্গরাজকে দেবীর স্বপ্ন-প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দেবীর তান্ত্রিক ভয়ঙ্করী রূপমূর্তিটিই ফুটে উঠেছে।

(১) "চণ্ডিকা চলিলা তথা নৃপতি-বসতি।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা-মূরতি॥
গলে মুণ্ডমালা দোলে বিকট-দশন।
কাতি খর্পর হাতে লোহিত লোচন॥"[৭৭]

(২) "দেখিনু ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল॥
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ॥"[৭৮]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাপক তন্ত্র-চর্চার ফলে বাঙ্গালী মানসে যে গভীর তন্ত্র-প্রভাব পড়েছিল, তারই ফলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য-আখ্যানের বিভিন্ন অংশে তান্ত্রিক ভাবধারার স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'মনসামঙ্গল' কাব্যধারায়ও আমরা তন্ত্র-ভাবনা ও

শাক্ত-সংস্কারের পরিচয় পাই। মনসাদেবীর উদ্ভব লৌকিক বা পৌরাণিক যে-কোন সূত্র থেকেই হোক না কেন এবং মনসার রূপ-কল্পনায় যে-কোন উপাদানই[৭৯] থাকুক না কেন, বাংলার মনসাপূজা পদ্ধতিতে এবং বাংলার 'মনসামঙ্গল' কাব্যধারায় মনসার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠায় তান্ত্রিক-চেতনা যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা' অস্বীকার করবার উপায় নাই। মনসার বীজমন্ত্র, পূজাক্রম প্রভৃতি তন্ত্রের আলোকেই বাঙ্গালীর সমাজজীবনে অনুসৃত হয়। এই বিষয়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি প্রণীত "ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী"[৮০] নামক একটি পুঁথি। ড: আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমতে এই গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং বিভিন্ন দিকের বিচারে পুঁথিটিকে বিদ্যাপতির রচনারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৮১] ড: সুকুমার সেনও 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী' পুঁথিটিকে বিদ্যাপতির রচনারূপে অনুমান করেছেন।[৮২] এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিদ্যাপতি অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রেরও যে অনুসরণ করেছিলেন, তার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশটি :—

> "স্মৃত্যাগম পুরাণাদিলোকবাদানুসারতঃ। ব্যাড়ীপূজার্বিধিনস্য প্রয়োগলিখ্যতেঽধুনা।"[৮৩]

এই পুঁথিটিতে মনসাদেবীর পূজাক্রমে এবং মনসাদেবীর বীজমন্ত্র উদ্ধারে তন্ত্র-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনসার "মংমনসাদেব্যৈ নমঃ", "বিং বিষহরায়ৈনমঃ"[৮৪]—এই মন্ত্রদ্বয়ের 'মং' এবং 'বিং' বীজ দুইটি দেবতার নামের আদ্যক্ষর-কেন্দ্রিক এবং ইহা তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি। তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, দেবতার নামের আদ্যক্ষরকে কেন্দ্র ক'রে দেবতার বীজমন্ত্রের সৃষ্টি তন্ত্রশাস্ত্রের এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য;যথা,—গণেশের বীজমন্ত্র 'গং', রামের বীজমন্ত্র 'রাং' ইত্যাদি।[৮৫] 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থটিতে মনসাপূজা-বিধান যেরূপে লিখিত হয়েছে, বাংলা দেশেও মনসাদেবীর পূজাবিধি সেইরূপেই অনুসৃত হয়। কাজেই মনসাদেবীর পূজায় আমরা তন্ত্র-প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারি না।

বাংলা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবিগণ মনসাদেবীকে সেই এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি বা পরমাপ্রকৃতির সঙ্গে একীভূতারূপে বর্ণনা করেছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীমানসের বহুকালসঞ্চিত শাক্ত-তান্ত্রিক সংস্কারেরই ফল। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। মনসা ও চণ্ডীর প্রাথমিক বিরোধটি কাব্য-কাহিনীর শেষাংশে যে মিলনমূলকতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে বা চণ্ডী ও মনসার যে অভেদত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, তা' তন্ত্রানুগ শক্তিতত্ত্বেরই প্রভাব-সঞ্জাত। প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ-মানসে তান্ত্রিক শক্তিবাদের যে ধারণা প্রচলিত ছিল, তারই উপর ভিত্তি ক'রে মনসাদেবীর শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ, বাংলা মনসামঙ্গলকাব্যে মনসাদেবীর

লৌকিক আখ্যানকে যেমন পৌরাণিক গরিমা দান করা হয়েছে, তেমনই এই দেবীর অপার মহিমা তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বের মধ্য দিয়েই গণমানসে উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির 'মনসামঙ্গল' কাব্য থেকে আমরা এই বিষয়ের উদাহরণ পূর্বেই দান করেছি। এখানে দ্বিজ বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্য থেকে মনসাদেবীর শক্তি-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার অনুরূপ উদাহরণ প্রদান করছি।

"করযোড়ে ভক্তিভরে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণী তুমি আদ্যা-প্রকৃতি।।
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ-চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।
তোমার অনন্ত মায়া কে বুঝিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে।।"[৮৬]

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' ('মনসাবিজয়') কাব্যে সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট বিষভক্ষণে অচৈতন্য শিবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য মনসার বিষ-ঝাড়ন মন্ত্রে আমরা তান্ত্রিকযোগের পরিচয় পাই; যথা,—

"কেন ত্রিভুবননাথ আপনা বিসর
মন-পবনের জীব পরিচয় কর।
*   *   *
দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট
আসুক পরমহংস চরুক নিবাট।
পুনরপি নিবর্তিয়া যাউক স্বস্থান
যথায় কমলে হংস করে মধুপান।।"[৮৭]

উদ্ধৃতাংশে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ বা কুণ্ডলিনীযোগ-সাধনই সূক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হয়েছে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে আমরা শিবের নিকট থেকে চাঁদসদাগররের 'মহাজ্ঞান'—লাভের যে উল্লেখ পাই, সেটি সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক ব্যাপার।

"শিব বলে, মহাজ্ঞান দিলাম তোমারে।
একবাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহারে।।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র তোমা দিলু আমি।
অন্যেতে কহিলে মাত্র পাসরিবা তুমি।।"

—দ্বিজবংশীদাসের 'মনসামঙ্গল'।[৮৮]

এই 'মহাজ্ঞান' তান্ত্রিক সাধনলব্ধ-জ্ঞান এবং 'মহাজ্ঞান'-অর্জনের জন্য যে 'আড়াই অক্ষর মন্ত্র'-এর কথা বলা হয়েছে, তা' হচ্ছে তন্ত্রোক্ত 'অজপা' বা 'হংস' মন্ত্র। এই 'মহাজ্ঞান' ও 'হংস' মন্ত্রের সাধন-বিষয়ে আমরা নাথসাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে আলোকপাত করেছি।

বাংলা মনসামঙ্গল-কাব্যধারায় তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনমৈত্র প্রভৃতি কবির 'মনসামঙ্গল' কাব্যসমূহে তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ, বঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মর্মমূলে যে তান্ত্রিক সংস্কার ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত রয়েছে, তা' বাঙ্গালী কবিগণের রচিত মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-গীতিতেও অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

বাংলা মঙ্গলকাব্যধারায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যসমূহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তন্ত্র ও তান্ত্রিক ভাবনার স্বাক্ষর বিরল নয়। ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। 'ধর্ম' ঠাকুরের স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ঠ মতভেদ দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতারূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে "ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।"[৮৯] কিন্তু, বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধদেবতা বলা চলে না। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "শূন্যপুরাণ, অনাদ্যমঙ্গল, ধর্মপূজাবিধান ও বিবিধ ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মের বর্ণনায় বহুস্থলে শূন্যমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধপ্রভাব প্রমাণ করা দুরূহ।"[৯০] ধর্মঠাকুর যে কোনক্রমেই বৌদ্ধদেবতা নন, তা' সুপণ্ডিত নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয়।

"...'শূন্যপুরাণ' ও বাংলা ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে 'শূন্য', 'নির্বাণ', 'ধর্ম', 'নিরঞ্জন' এই জাতীয় কতিপয় শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ধর্মঠাকুর নামে বাংলায়, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার এবং উড়িষ্যার কোন কোন স্থানের দেবতার পূজা যে বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপান্তর মাত্র, এইরূপ একটি মতবাদও প্রচারিত হইয়াছে, এবং বার বার প্রচারের ফলে সত্যের মুখোস পরিয়া জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছে।...উনবিংশ শতাব্দীতে যাবতীয় প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের ছায়া আবিষ্কার করার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, সেই সময়েই এই প্রৌঢ়িবাদটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন এই সহজ কথাটিও কেহ স্মরণ করিতে চাহে নাই যে, এই শব্দগুলি তাহাদের আদি সাম্প্রদায়িক মাহাত্ম্য ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্বেই হারাইয়া কতকগুলি ভেজাল-দুষ্ট সার্বত্রিক শব্দের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ধর্মপূজার পাণ্ডাগণ যদি না জানিয়া অথবা জানিয়াই এই শব্দগুলি সাহিত্যে ও পূজায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—কতিপয় রহস্য-ঘন বাক্যের প্রয়োগে অতি সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তির চোখে এই লৌকিক দেবতাটির মহিমা বর্ধন করা। 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল' শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, একদা কয়েককজন পরমোৎসাহী ইউরোপীয় কার্ষ্ণ বৈষ্ণবধর্মের উপর খ্রীষ্ট-ধর্মের যে ভুরি ভুরি প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ধর্মপূজার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ধর্ম-ঠাকুরটি যে কি, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কখনও তিনি যমরাজ, কখনও মহাদবে, কখনও যেন বিষ্ণু, কখনও আবার উপনিষদের নিরাকার ও অব্যয় ব্রহ্ম, কখনও সূর্যের এক অনুচর, কখনও বা অন্য কিছু। এই 'অন্যকিছু'র মধ্যে যদি তাহার গায়ে শেষ তান্ত্রিক যুগের খানিকটা বৌদ্ধ বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়, তবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্ত সেজন্য তাঁহাকে 'বৌদ্ধদেবতা' বলিয়া প্রচার করা অসমসাহসের কাজ। আসলে তিনি দেবাদিদেব, আদিপ্রভু, সমস্ত বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা,—কল্পনাকে যতদূর ঠেলিয়া লওয়া যায়, তাহার শেষ প্রান্তে তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই হিসাবে, তিনি যে 'শূন্য'কে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই 'শূন্য' বা আকাশ সহজবস্তু, উহা মোটেই মহাযানের বা অপর কোন শাস্ত্রের সাংঘাতিক কঠোর 'শূন্য' নয়।"..."কূর্মাকৃতি যে কতকগুলি পাথরের মূর্তি বা শিলাখণ্ডকে ধর্মের প্রতীক বলিয়া বাংলায় ও উড়িষ্যায় পূজা করা হয়, সেগুলির সহিত নেপালী বৌদ্ধদের পঞ্চ-বোধিসত্ত্বাঙ্কিত (কূর্মরূপী) স্তূপের সাদৃশ্য এমন থাকেই যদি, তবে সে সাদৃশ্য যে আকস্মিক নয়, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। প্রমাণিত হইলেও ধর্মকে বৌদ্ধ সাজান যায় না, কারণ কূর্ম-মাহাত্ম্য বড়ই জটিল। কূর্মদেব শুধু ব্রাহ্মণ্য উপনিষদে ও পুরাণগুলিতে নয়, প্রাচীন অনেক জাতিরই ধর্মতত্ত্বের আদিম কল্পনার সহিত তিনি জড়িত হইয়া আছেন,—তাঁহার আকৃতি আদি কারণার্ণবকে সূচিত করিয়া 'ধর্ম'-তত্ত্বকে শুধু একটা প্রাচীনত্বের ছাপ দিতে চায়, তাহার আকৃতিগত সাদৃশ্যের তুলনা টানিয়া আনিয়া ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ করিতে চায় না।"[৯১] ডঃ সুকুমার সেনও ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধদেবতারূপে স্বীকার করেন নাই। তাঁর মতে, "...জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (যম-সমেত), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে।'[৯২] ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরকে প্রাগার্য সূর্যদেবতারূপে মনে করেছেন।[৯৩] ধর্মঠাকুরের রূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এ'কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৈদিক-অবৈদিক ধর্মসংস্কার, শৈব ও নাথধর্ম, তন্ত্র, লৌকিক ধর্মাচার প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে। ধর্মঠাকুরের রূপ-পরিকল্পনা আর্য, অনার্য ও তান্ত্রিকতার

ভাব-সংস্কারে গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য,—"...মহাযানবৌদ্ধ, তন্ত্র, পৌরাণিক হিন্দু, বৈদিক সংস্কারের ছিটেফোঁটা, কোলগোষ্ঠীর বিস্মৃতপ্রায় অধ্যাত্ম বৈশিষ্ট্য—সব কিছু মিলিয়া শিলামূর্তি ধর্ম-ঠাকুরের পূজা-উপাসনাকে এখনও জিয়াইয়া রাখিয়াছে, এখনও ধর্মের পূজারী ও ভক্তসম্প্রদায় বর্তমান আছেন।"[৯৪]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এ'কথা সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বিভিন্ন ধর্মসংস্কারের সঙ্গে তন্ত্র-প্রভাবও ক্রিয়াশীল রয়েছে। ধর্ম ঠাকুরের মূল-রূপ যাই হোক না কেন, বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং ধর্মপূজা-পদ্ধতিতে বর্ণিত ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-প্রকৃতিতে তন্ত্রানুগ-সংস্কারের স্বাক্ষর যে রয়েছে, তা' অস্বীকার করার উপায় নাই। ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজায় তন্ত্র-প্রভাবের একটা বিশেষ প্রমাণ হচ্ছে রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত 'শূন্যপুরাণ' নামক পুঁথিটি। 'শূন্যপুরাণ' নামটি পুঁথিটির প্রকৃতনাম নয়, পুঁথিসম্পাদক নগেন্দ্রনাথ এই নামকরণ করেছিলেন। পুঁথিটিকে বহুস্থলে 'আগমপুরাণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে; কিন্তু কোথাও 'শূন্যপুরাণ' নাম নাই ('রামাই পণ্ডিত কহে আগম পুরাণ')। 'আগম' হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রের একটা বিভাগ। রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের অপর একটি বিভাগ 'নিগম'-এর উল্লেখ পাচ্ছি লাউসেনের বিদ্যালাভ প্রসঙ্গে,—

"যার তার সনে করে টীকার ব্যাখ্যান।
পড়িল নিগম শাস্ত্র ভ্রারথ পুরাণ।।"[৯৬]

মধ্যযুগের বাঙ্গালী সমাজ-মানসের সর্বস্তরে যে তান্ত্রিক সংস্কার বিজরিত ছিল, তা' ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী ও ধর্মপূজায়ও স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। ধর্মপূজায় আমরা ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তিদেবতার কথা পাচ্ছি,[৯৬] এটা তান্ত্রিক-শক্তিমাহাত্ম্যের সূচক। ধর্মপূজায় নবগ্রহ, দশদিকপাল, ক্ষেত্রপাল, আবরণদেবতা প্রভৃতির পূজা[৯৭], তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিরই প্রভাব। ধর্মের একজন দ্বারপাল বা দ্বারদেবতা মহাকাল[৯৮] তন্ত্রোক্ত দেবতা। ধর্মঠাকুরের পূজার একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পশুবলি। 'শূন্যপুরাণে' 'দেবীর মনঞিং'-তে গণ্ডার, অশ্ব, মহিষ ও অজ বলিদানের বিধান আছে।[৯৯] পাঁঠা, হাঁস, কবুতর, মুরগী, শূকর প্রভৃতি বিভিন্ন পশু-পক্ষী বলিদানের যে প্রথা আমরা দেখতে পাই, তা' তান্ত্রিক-সংস্কারের প্রভাবরূপে গণ্য করা যায়। বিশেষতঃ, ধর্মঠাকুরের পূজায় যে একসময় নরবলি দেওয়া হত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০০] ধর্মঠাকুরের পূজার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এই যে, ডোম ও ব্রাহ্মণ উভয়শ্রেণীর পুরোহিতের দ্বারা ধর্মদেবতার পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। "...ব্রাহ্মণ ও ডোমের এমন সম্মিলিতভাবে পূজানুষ্ঠান নির্বাহ করিবার চিত্র

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। পশ্চিম বাংলার হিন্দুর সামাজিক জীবনের এই যে একটি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের মিলনচিত্র, তাহার তাৎপর্য গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।"[১০১] আমার মনে হয়, ধর্মঠাকুরের পূজায় ডোম ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের এই সহাবস্থান তন্ত্র-প্রভাবের ফল। কারণ, তন্ত্র-সাধনায় ডোম ও চণ্ডাল শ্রেণীর এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া, তন্ত্রোক্ত সাধনা ও তন্ত্রাচারে বৈদিক বর্ণভেদের গুরুত্ব খুব বেশী নয়। উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সর্ববর্ণের লোক এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদিতে সমানাধিকার। তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ স্তরে এবং বিশেষ বিশেষ সাধন-ক্রমে জাতি বা বর্ণভেদের কোন স্বীকৃতি নাই। প্রাচীনযুগ থেকেই বাঙ্গালী-সমাজের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সর্বস্তরে যে তান্ত্রিক-চেতনা বিজড়িত ছিল, তারই প্রভাবে ধর্মঠাকুরের পূজায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের একত্র অবস্থান সহজ হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যেও তন্ত্র-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে তান্ত্রিক-সংস্কার মিলিত হয়ে যে ধর্মঠাকুরের পরিপূর্ণ স্বরূপটি গড়ে তুলেছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নাই। "...ধর্ম ঠাকুরের পরিকল্পনার মূলে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, পরবর্তীকালের বৌদ্ধদর্শন, আদিবাসীদের ধর্মাচার, নাথধর্ম, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র"[১০২] প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ধর্মঠাকুরের ধ্যানে ও মন্ত্রে 'শূন্যমূর্তিঃ', 'শূন্যরূপং', 'শূন্যদেহং', ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় ডঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদের শূন্যবাদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।[১০৩] কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য,[১০৪] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১০৫] প্রভৃতি অধিকাংশ পণ্ডিতগণ নানাদিক থেকে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধদেবতা নন এবং ধর্মঠাকুরের শূন্যমূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যবাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা পূর্বেও এ'বিষয়ে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি, যে, ধর্মঠাকুরের 'শূন্যরূপ' বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বের প্রভাব নয়। বাংলা ধর্মমঙ্গলসাহিত্যে, 'শূন্যপুরাণ', 'ধর্মপূজাবিধান' প্রভৃতিতে ধর্মঠাকুরের ধ্যানে ও পরিকল্পনায় তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নিরাকার-নির্বিকার-নির্গুণ পরমব্রহ্মের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় তন্ত্র-প্রভাব নির্ণয়-প্রসঙ্গে আমাদেরকে 'শূন্যপুরাণ' এবং বাংলা ধর্মমঙ্গলসাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিকাহিনী বা সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করতে হবে। এই সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী "ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব মৌলিকচিন্তা হইতে উদ্ভূত নহে।...প্রাক্‌বৈদিক অনার্য, বৈদিক আর্য, বৌদ্ধ, লোকশ্রুতি, তন্ত্র প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া গিয়া 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে।"[১০৬] বিভিন্ন ধর্মমতবাদের সংমিশ্রণে গড়িয়া-উঠা 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতত্ত্বে যে তন্ত্র-প্রভাব পড়েছিল, এ'কথা অবশ্য স্বীকার্য।[১০৭] তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এখানে বক্তব্য-বিষয়ের

পরিস্ফুটনের জন্য তন্ত্রমতে সৃষ্টিব্যাপারের মূলতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে আমরা এর সঙ্গে 'ধর্মমঙ্গল'-সাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের ঐক্য নির্ধারণ করব। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমব্রহ্মের বা পরমশিবের নির্গুণ ও সগুণভেদে দুইটি স্বরূপ। পরমব্রহ্ম প্রকৃতিতে অনুপহিত থাকলে তাঁকে নির্গুণ বলা যায়; এবং তিনি মায়াতে বা প্রকৃতিতে উপহিত হলে তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়ে থাকে।[১০৮] সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নাই এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই। অবশ্য প্রকৃতি বা শক্তির সঙ্গে ব্রহ্ম বা শিবের অবিনাভাব সম্বন্ধ;উভয়ে চণকাকারে একীভূত হয়ে আছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যখন এই তিনটি গুণের মধ্যে কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এই অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণপ্রকাশ না থাকাতে এঁকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হয়ে থাকে। সৃষ্টির পূর্বে মূলপ্রকৃতির সঙ্গে একীভূত ব্রহ্মের এই রকম অবস্থাই থাকে। কিন্তু সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মযুক্ত মূলপ্রকৃতিতে গুণক্ষোভ (উক্ত তিনটি গুণের চাঞ্চল্য) হয় এবং চৈতন্যযুক্ত মূল প্রকৃতি থেকে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে অভিহিতা এবং এই আদ্যাশক্তি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী—এই তিনশক্তির সহযোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পাদিত হয়।[১০৯]

আমরা এইবার 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যকাহিনীর সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করব। 'শূন্যপুরাণে' আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সৃষ্টির পূর্বে সর্বত্র এক মহাশূন্য বিরাজিত।

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহার দেউল নহি পরবত সকল॥

* * *

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ঠু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥"[১১০]

সেহ সময়,—

"সুন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভর।
কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর॥"[১১১]

সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন এই অবস্থাকেই তন্ত্রে বলা হয়েছে পরমব্রহ্মের নির্গুণ অবস্থা। অর্থাৎ এই সময় পরমব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত মূল প্রকৃতিতে কোন গুণক্ষোভ থাকে না। চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাকে একমাত্র শূন্যের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। তাই বলা হয়েছে,— 'শূন্যত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।' তারপর মায়াতে বা প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্মের সিসৃক্ষু অবস্থার পরিচয় পাই,———'কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মায়াধর।'

অতঃপর, 'আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ',—প্রভুর এই আপন কায়া সৃজনের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্বের ইঙ্গিত পাচ্ছি। 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে এই সৃষ্টি-পত্তন-প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিক্রিয়ার প্রভুর কণকপৈতা জলে নিক্ষিপ্ত হল এবং তার থেকে সহস্রমস্তকযুক্ত 'বাসুকি নাগের' জন্ম হল। বাসুকির আহারের জন্য কর্ণের কুণ্ডল ফেলে ভেকের সৃষ্টি করা হলে বাসুকি সন্তুষ্ট হলেন। এরপর বাসুকির মস্তকে প্রভুর গলার মলদ্বারা নবদ্বীপ-সমন্বিত ধরণীর সৃষ্টি হল এবং প্রভুর ঘর্মে আদ্যাদেবীর এবং আদ্যাদেবী থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্ম হল।

উক্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানে 'বাসুকি' অর্থে 'কুণ্ডলিনী শক্তি' এবং শব্দব্রহ্মদ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণ বোঝানোর জন্য জলে কর্ণ-কুণ্ডল নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। শব্দ-দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণই হচ্ছে বাসুকির সন্তুষ্টি। বাসুকি নাগের জন্ম এবং কর্ণ-কুণ্ডলের মাধ্যমে শব্দব্রহ্মদ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ তন্ত্রোক্ত যোগ সাধনার ইঙ্গিতবাহী।[১১২]

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের সৃষ্টিবর্ণনায় আমরা স্পষ্টতঃ তন্ত্র-প্রভাব লক্ষ্য করি। এখানে নিরাকার-নিরঞ্জন-সনাতন ব্রহ্ম হতে জগৎসৃষ্টির বর্ণনায় দেখতে পাই যে, 'পরমব্রহ্মের বামে (ঘামে?) পরাপ্রকৃতি'র[১১৩] জন্ম হল। প্রকৃতি থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হল এবং অন্যান্য সৃষ্টি কার্য সমাধা হল। এই ব্রহ্ম ও প্রকৃতি সহযোগে সৃষ্টি-বর্ণনা তান্ত্রিক ভাবনারই অনুগামী। মাণিকরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তন্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

"শক্তি সনে তথি একে একে স্থিতি
তিন মূর্তি সেই কালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেব
ইহার উপমা কিবা।
শক্তি হইলা তিন ইথে নাহি ভিন
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা॥

*　　　*　　　*

তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ্য হল্যা।
শুভ কালে শুভসৃষ্টি আরম্ভ করিলা॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে॥
রুদ্রাণী রুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে।
কমঠ পবনে ভর করিলেন তবে॥"[১১৪]

'শূন্যপুরাণ' ও বাংলার ধর্মমঙ্গলকাব্য সমূহের সৃষ্টি-বর্ণনায় তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বান্তর্গত পুরুষ প্রকৃতি বা শিব-শক্তিবাদের প্রভাব যে পড়েছে, তা' অবশ্য স্বীকার্য। ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিকাহিনীতে বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হলেও এর মূলসূত্রটি তন্ত্র-ভাবনার উপর সংগ্রথিত। কারণ, তন্ত্রের শিব-শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি-মাহাত্ম্যই 'ধর্মমঙ্গলে'র সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল। তন্ত্রশাস্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির তত্ত্বসমন্বিত সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি এবং এই তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব বাংলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যধারায় যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনা ও সষ্টিকাহিনীকেও ঐতিহ্যসূত্রে পরিপুষ্ট করেছে। বাঙ্গালীর ধর্মসংস্কারে এবং মানস-প্রকর্ষে যে তান্ত্রিক শক্তিমাহাত্ম্য গভীরভাবে প্রোথিত, তা' ধর্মঠাকুরের কাহিনীতেও স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। 'শূন্যপুরাণে' দেখা যায় যে, যে-আদ্যাশক্তি থেকে শিব জন্মগ্রহণ করলেন, সেই আদ্যাশক্তির সঙ্গেই পুনরায় শিবের বিবাহ হল। এর মধ্য দিয়ে তন্ত্রের সেই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে যে, একই শক্তি মাতা, জায়া প্রভৃতি বিভিন্নরূপে বিরাজিতা।[১১৫] 'মহানির্বাণতন্ত্রে'ও চতুর্থোল্লাসে (৪।১২) শিব দেবী পার্বতীকে এই কথাই বলছেন,—

"ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপিজন্মভূঃ।"

কবি মাণিকরামও দেখিয়েছেন যে, একই শক্তিমূর্তি রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি মূর্তিতে প্রকাশিত। বিশেষতঃ কবি যখন বলেন,—

"অসুর বধের কালে হলে দিগম্বরী।
ত্রিভুবন রাখিলে আপনি অসি ধরি॥
মুণ্ডমালা পরিলে রুধির করিলে পান।
শবশিশু শ্রুতিমূলে দুলে অবিশ্রাম॥

সত্ত্বগুণে ব্রহ্মাণী আপণি মহামায়া।
জগৎজননী তুমি তুমি সর্বজায়া॥
রজোগুণে বিষ্ণু তুমি তমোগুণে ভব।
সৃজন পালন ধ্বংস তোমা হতে সব।।”[১১৬]

তখন তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বই উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যে ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমূর্তিতে নানা লীলায় বিরাজিতা, উদ্ধৃতাংশে কবি সেই অদ্বিতীয়া মহাশক্তিরই বন্দনা করেছেন।

ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিলীলায় তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের প্রভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে কবি সহদেব চক্রবর্তীর ‘অনিলপুরাণ’ কাব্যে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি,—

“ঘর্মকিছু উপজিল ধর্মের কপালে।
বামকরে মুছিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
তাহে জন্মিল আদ্যা সৃষ্টি কারিণী।
পূর্ণ শশধর মূর্তি কুঞ্জর গামিনী।

* * *

আদ্যার বদন হেরি নিরঞ্জন মোহিত হইল মনে।
কহ তপোধন ইহার কারণ বাপা বলে কি কারণে।
কহে তপোধন তুমি নাহি জান আমি কি কহিতে জানি।
এই ভগবতী তোমার প্রকৃতি যদি রাখ মোর বাণী।।”[১১৭]

তন্ত্র-প্রভাবের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে কবি যদুনাথ বা যাদবনাথের ‘ধর্মপুরাণ’ কাব্যটি (খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ)। “এই ধর্মকাব্যকে ‘আগমপুরাণ’ নাম দিয়া এবং চণ্ডীর বিস্তারিত পরিচয় দিয়া কবি ধর্ম-‘কাল্ট’ ও শাক্ত—‘কাল্টে’র সংমিশ্রণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।”[১১৮]

উপরি-বর্ণিত আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি হবে যে, বাংলার ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় এবং ধর্মমঙ্গলকাব্য ধারায় তান্ত্রিক ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলার ধর্মঠাকুরের রূপ-প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বিভিন্ন ধর্মসংস্কারের সঙ্গে বাংলার গণমানসের বহুকালপ্রচলিত তান্ত্রিক চেতনার ধারাও যে এসে মিলিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি তন্ত্র-প্রভাবের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশে তান্ত্রিক সাধনা ও শাক্তভাবনার যে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারাটি প্রবাহিত ছিল, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে রামপ্রসাদ প্রমুখ তান্ত্রিক সাধকদের আবির্ভাবে তা' কূলপ্লাবী রূপলাভ করে। কবি ভারতচন্দ্রের জীবৎকালটি তান্ত্রিক সাধনার গৌরবে সমুজ্জ্বল এবং শাক্ত-সঙ্গীতের বিচিত্র সুরমূর্ছনায় ঝঙ্কৃত। বিশেষতঃ, ভারতচন্দ্র যাঁর সভাকবি ছিলেন এবং যাঁর আদেশ শিরোধার্য ক'রে 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মত'[১১৯] 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করেছিলেন, সেই নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শক্তি-উপাসক এবং তান্ত্রিক-সাধনার বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। এই কারণেই, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তন্ত্র-প্রভাবের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর বিদ্যমান। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনায় তন্ত্রগ্রন্থাদির যে অনুসরণ করেছিলেন, তা' ভারতচন্দ্র নিজেই কাব্যমধ্যে স্বীকার করেছেন।

(১) "বিস্তর অন্নদাকল্পে কতগুণ কব অল্পে
নিজগুণে হবে বরদায়।"[১২০]

(২) "অন্নপূর্ণা মহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্রমন্ত্র বহুতর॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত॥"[১২১]

উপরি-উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে কবি দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অন্নদাকল্পতন্ত্র' নামক গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। এই তন্ত্রগ্রন্থটিতে দেবী অন্নপূর্ণার বীজমন্ত্র, ধ্যান, স্তোত্র, পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত আছে। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণার মঙ্গলগীতি-রচনায় এই 'অন্নদাকল্পতন্ত্র' সহ বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থাদির প্রভাব রয়েছে। একান্নপীঠ বর্ণনাতেও কবি তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। যথা,—

"করিয়া একান্নখণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥

একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত।।"[১২২]

উদ্ধৃতাংশে 'মন্ত্রচূড়ামণি' বলতে কবি সম্ভবতঃ 'তন্ত্রচূড়ামণি' নামক তান্ত্রিকগ্রন্থকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, 'মন্ত্রচূড়ামণি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গেলেও ঐ গ্রন্থটিতে একান্নপীঠের বর্ণনা ছিল কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।[১২৩] সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র যে আগমাদিশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সেকথা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবির নিজের উক্তিতেই (আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে) প্রমাণিত হয়। যথা,—

"পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী ফারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী।।
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়।।"[১২৪]

বস্তুতঃ, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তন্ত্র ও আগমাদিশাস্ত্র সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ বহুস্থানে রয়েছে এবং কবির রচনায় তন্ত্র-প্রভাবের স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(১) "আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।"[১২৫]

(২) "নিগম আগমে তুমি নিরুপাম কায়া।
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদিবের জায়া।।"[১২৬]

(৩) "এতশুনি শিবের হইল চমৎকার।
প্রকাশ করিলা তন্ত্রমন্ত্র সবাকার।।"[১২৭]

(৪) "তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার।"[১২৮]

ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই তন্ত্র-প্রভাব এবং তান্ত্রিক ভাবধারা সম্পর্কে আমরা এবার আলোচনা করছি।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'শিববন্দনা'-অংশে কবি বলছেন যে,—

"মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিবে তোমার মায়া।"[১২৯]

উক্ত কথাটি সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক বচন। তন্ত্রমতে জীবমাত্রেই শিব স্বরূপ। কিন্তু মায়াবৃত বা পাশবদ্ধ হওয়ায় জীব আত্মজ্ঞানবিহীন এবং কর্মচক্রে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করে। কিন্তু, সাধনবলে জীব পাশমুক্ত বা মায়াবিমুক্ত হলেই শিবত্ব লাভ করে। যথা,—

"জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবল শিবঃ।
পাশবদ্ধ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥"
—'কুলার্নবতন্ত্র', ৯।৪২।

শিবের সঙ্গে জীবের এই সম্পর্ক বিষয়ে 'কুলার্নবতন্ত্রে'র প্রথম ও নবম উল্লাসে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নপূর্ণাবন্দনা' অংশের 'রক্তজবা প্রভাহর অতিমনোহরতর'[১৩০] ইত্যাদি অংশ তন্ত্রের[১৩১] ছায়াবলম্বনেই রচিত। 'অন্নপূর্ণাবন্দনা'র নিম্নোদ্ধৃত অংশটি 'অন্নদাকল্প' তন্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানমন্ত্রেরই পূর্ণ অনুরণন।

"বাম করতলে ধরি কারণ অমৃত ভরি
পানপাত্র রতননির্মিত।
রত্নহাতা ডানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত ॥
* * *
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া ॥"[১৩২]

উদ্ধৃত-বর্ণনাটি 'অন্নদাকল্পতন্ত্রে'র (৭।৪-৬) অন্তর্গত দেবীর ধ্যানমন্ত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়,—

"বামে মাণিক্যচষকং কারণামৃত পূরিতম্।
রত্নদর্বিং দক্ষ করে পল্লান্নঘৃত পূরিতাম্ ॥
পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পলান্নকম্।
পীত্বা ভুক্তানন্দময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরম্ ॥
বিলোক্য হৃষ্ট্যাং পদ্মান্তঃ ষট্‌কোণান্তর্নিষেদুষীম্।
মুক্তাহারলসত্তুঙ্গ কুচযুগ্মমনোহরাম্ ॥"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন'[১৩২]—এই প্রসিদ্ধ পংক্তিটি "অন্নদাকল্পতন্ত্রে'র 'মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি শরীরং বাথ পাতয়ে"[১৩৩] ছত্রটিরই প্রতিরূপ।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'গীতারম্ভ' অংশটিতে কবি সৃষ্টিতত্ত্বের যে বর্ণনা করেছেন, তা' তন্ত্রের তত্ত্বালোকেই উদ্ভাসিত। নিম্নে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল,—

"অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া
পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি।
অনির্বাচ্যা নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥

* * *

বিনা চন্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনাগর্ভে প্রসব হইলা ॥
গুণসত্ত্বতমোরজে হরিহরকমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর তিনজনে পরস্পর
করেন কারণ জলে তপ ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচা গন্ধে মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে ॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা ॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া ॥
দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভার্যারূপা ভবানী হইলা।

পতিরূপ পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥"[১৩৪]

উপরি-উক্ত অংশে তন্ত্রের শিব-শক্তিতত্ত্ব বা পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বই কাব্যরূপ লাভ করেছে। পূর্ব-বর্ণিত তান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্বই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। তন্ত্রে কথিত হয়েছে যে, পরমাপ্রকৃতির গুণক্ষোভেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় ক'রে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব। মহাশক্তিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। তিনি সগুণা, আবার নির্গুণা। এ'বিষয়ে 'অন্নদাকল্পতন্ত্রে' উক্ত হয়েছে যে,—

"সৃজামি পালয়ামীতি সংহারামি পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দ বিভবঃ প্রকৃতিঃ কারণং মম॥
তস্মাত্তু প্রকৃতের্মূলং কারণং নৈব দৃশ্যতে।
নির্গুণা সগুণা দ্বেষা সগুণা সা ত্রিধা মতা॥"
—প্রথম পটল, ৮। ৯।

উদ্ধৃতাংশে 'কারণজলে' ভাসমানা 'শবরূপা' পরাপ্রকৃতি মহাশক্তির নির্গুণত্বের দ্যোতক। মহাশক্তি সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই এবং তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। বিভিন্নতন্ত্র গ্রন্থে মহাশক্তির যে তত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে, ভারতচন্দ্রের লেখনীতে তা'ই পরিস্ফুট হয়েছে। মহাশক্তি হতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবির্ভাব এবং শক্তি সহযোগেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। এ'বিষয়ে 'নির্বাণতন্ত্রে'র প্রথম পটলে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। আমরা তার অংশবিশেষ উদ্ধার করলাম;—

"সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী।
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসন্তজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥
শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্বতি॥

* * *

দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ॥

* * *

তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ।
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্মুদা॥

শৃণু পুত্র মহাযোগিন্! মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু।
তাং বিনা পুরুষঃ কো বা মাং বিনা কাপি মোহিনী॥
অতস্ত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব॥

* * *

আদীভূতা যথা কালী তথা ভুবনেশ্বরী।
তামাশ্রিতা মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ॥"

—প্রথম পটল (১।১৪-২৮)।

অর্থাৎ মহাশক্তি যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জননী স্বরূপা ('ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং জননী সুরসুন্দরী'[১৩৫]), তেমনই আবার সর্বদেবতার শক্তিস্বরূপিণী।[১৩৬] 'নিরুত্তরতন্ত্রে' সর্বকর্তৃত্বময়ী পরমাপ্রকৃতি সম্পর্কে যা'উক্ত হয়েছে, এখানে তা' উদ্ধৃত হল,—

"নির্গুণা জ্যোতিষাং বৃন্দং পরং ব্রহ্মসনাতনী।
পরঞ্চ পুরুষং বিদ্ধি মহানীলমণি প্রভম্॥
জ্যোতিশ্চ দক্ষিণাকালী দূরস্থা স্যাৎ প্রপঞ্চসূঃ।
বিপরীতরতা কালী নির্গুণা সগুণাপি চ॥
অমাস্যান্নির্গুণে সাপি অনিরুদ্ধ-সরস্বতী।
সগুণা সুরগর্ভে চ মহাকালনিরূপিণী॥
নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী মোহয়ত্যখিলং জগৎ॥"[১৩৬]

এই আদ্যাশক্তির মহিমাই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পূর্বোদ্ধৃত সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। তন্ত্রোক্ত এই পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব শক্তিতত্ত্ব 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে; যথা,—

"নিগম আগমে তুমি নিরুপম কায়া।
ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদিবের জায়া॥

* * *

কালীমূর্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব সর্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥

তিনজনে তোমরা কারণ জলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা।।
তিনজনে পরস্পর লাগিলা জাপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে।।

*   *   *

তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন।।
পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে।।"[১৩৭]

এখানে পুরুষ-প্রকৃতির অবিনাভাব-সম্বন্ধটি সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কালী-তারাদি দশ-মহাবিদ্যার রূপবর্ণনা[১৩৮] সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রানুসারী। 'অন্নদামঙ্গলে' কালীরূপের বর্ণনায় কবি বলছেন যে,—

"মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা।।
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে।।
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান।।
লোলাজিহ্বা রক্তধারা মুখের দু পাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে।।"[১৩৯]

উদ্ধৃতাংশটি তন্ত্রের নিম্নোক্ত কালীধ্যানেরই প্রতিধ্বনি;—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃখড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ পাণিকাং।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরার্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং।

ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাং।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাং।"[১৪০]

'তারারূপে'র বর্ণনায় উক্ত হয়েছে যে,—

"নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ একজটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥"[১৪১]

উদ্ধৃতাংশটি নিম্নোলিখিত তন্ত্রোক্ত তারাদেবীর ধ্যানমন্ত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়;—

"প্রত্যালীঢ় পদার্ঙ্ঘ্রি-শবহৃদ্‌ঘোরাট্টহাসাপরা খড়্গোন্দীবর-কর্ত্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারোবীজোদ্ভবা। খর্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ং।।"[১৪২]

'অন্নদামঙ্গলে' ভুবনেশ্বরী ও ভৈরবী মহাবিদ্যার রূপবর্ণনাও তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রের অনুরূপ। আমরা নিম্নে 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্তর্গত এই দুই দেবীর রূপ-বর্ণনাংশটি এবং তান্ত্রিক ধ্যানমন্ত্র যথাক্রমে উদ্ধৃত করলাম।

(১) ভুবনেশ্বরী ঃ—

'রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মনিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥"[১৪৩]

এই দেবীর তান্ত্রিক ধ্যান ঃ—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং দাড়িমীকুসুমোপমাং।
চন্দ্ররেখাংজটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীং॥
নানালঙ্কার সুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীং।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥"[১৪৪]

(২) ভৈরবী ঃ—

"রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারিকর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥"[১৪৫]

ভৈরবীর তন্ত্রোক্ত ধ্যান ঃ—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং। হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাং॥"[১৪৬]

দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত রাজরাজেশ্বরী (ষোড়শী), ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী দেবীর (কমলা) রূপ-বর্ণনা যেভাবে 'অন্নদামঙ্গলে' চিত্রিত হয়েছে,[১৪৭] তা'ও তন্ত্রশাস্ত্রেরই প্রতিবিম্বন।

'অন্নদামঙ্গলে' 'পীঠমালা'-বর্ণনার প্রারম্ভে কবি 'ভবভবানী' অর্থাৎ শিবশক্তি সম্বন্ধে বলছেন যে,—

"ভবসংসার ভিতরে। ভবভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নরনারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।

চেতনা চেতনে মিলি দুইজনে
দেহিদেহরূপে চরে ॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
একি করে চরাচরে।"[১৪৮]

অর্থাৎ এই জগতের সর্বজীবের মধ্যেই শিবশক্তি বিরাজিত। প্রাণী জগতের পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মধ্যে যথাক্রমে শিব-শক্তি লীলায়িত। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিব-শক্তিরই অভিব্যক্তিমাত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্বেরই ভাষ্য হচ্ছে উদ্ধৃতাংশটি। প্রমাণ স্বরূপ তন্ত্র-বচন প্রদত্ত হল ঃ—

(১) "নানয়োর্বিদ্যতে ভেদো যা শক্তিঃ সা শিবো ধ্রুবম্।"
—'গন্ধর্বতন্ত্র', ৪০।৪।

(২) 'পুংস্ত্রীরূপণি সর্বাণি চাবয়োরংশকানি হি।"
—"কুলার্নবতন্ত্র', ৩।৯১।

(৩) "মদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে ত্বদ্রূপাঃ প্রমদা প্রিয়ে।"
—'কুলার্ণবতন্ত্র', ৮।১০২।

(৪) "শুক্রতো জায়তে বিশ্বং শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।
শিবশক্তির্দ্বিধা দেবি নির্গুণা সগুণাপি চ ॥
* * *
সহবানেব সা দেবী যোনিমার্গে চরাচরম্।
শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
* * *
সিদ্ধবিদ্যাসু সর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিঃ পুমান্।
অবিনাভাবসম্বন্ধ-স্তয়োরেব পরস্পরম্।।"
—'নিরুত্তরতন্ত্র', ২।৮, ২।১৩-১৬।

অর্থাৎ এই জগৎ শক্তিশিবাত্মক। জগতের পুংচিহ্নিত সমস্ত প্রাণী শিবস্বরূপ এবং সমস্ত প্রাণী শক্তিস্বরূপা। 'গন্ধর্বতন্ত্রে' উক্ত হয়েছে যে, "চেতনাচেতন জগতকে শিবশক্তিময় বলে জানবে।"[১৪৯] শিবশক্তি অভিন্ন।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা' নামক অংশে ব্যাসের আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক তত্ত্বের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। যথা,—

"বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায়।।
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল।।
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।।
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞান ঈশের ঈশ্বত্ব।।"[১৫০]

উদ্ধৃতাংশে কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব এবং পরমাপ্রকৃতির সর্ব-কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি বা পরমাশক্তি থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উদ্ভব এবং প্রকৃতিতেই এঁরা লয় প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্।
তথা প্রলয়কালে তু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ।।"
—'নির্বাণতন্ত্র', ৩।২।

তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রসাধনায় উক্ত হয়েছে যে, মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যে সুষুম্না নাড়ী রয়েছে, সেই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে মৃণালতন্তুসদৃশ চিত্রিণী নাড়ী আছে। মূলাধারনিবাসিনী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি ষট্‌চক্রভেদ ক'রে যখন সহস্রারপদ্মে পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন, তখন ষট্‌চক্রস্থ সমস্ত তত্ত্বের সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব কুণ্ডলিনীতে লয় প্রাপ্ত হন এবং কুণ্ডলিনী মূলাধারে প্রত্যাগমনকালে সমস্ত চক্র বা পদ্মস্থিত তত্ত্ব ও দেবতাসমূহও আবির্ভূত হয়ে স্ব স্ব স্থানে বিরাজিত থাকেন। উদ্ধৃতাংশে এই কুণ্ডলিনীশক্তিতত্ত্বের মহিমাই ব্যক্ত হয়েছে। পরমাপ্রকৃতি বা মহাশক্তির এই সর্বকর্তৃত্বময়ীলীলা যুগপৎ মানবশরীর ও বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সংঘটিত হচ্ছে। পরমাশক্তিই হচ্ছেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদ্বিতীয়া অধিশ্বরী। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মূল এবং তিনি একাধারে স্থূল ও সূক্ষ্ম, সাকার ও নিরাকার এবং বাক্য ও মনের অতীত।

"ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র', ৪।১৫।

শক্তি সহযোগেই 'ঈশের ঈশ্বত্ব' (ঈশ্বরের সর্ব-কর্তৃত্ব) ;—
"পঙ্গুপ্রায়ঃ সদা ঈশঃ গমিতুং নৈব শক্যতে।
ভুবনেশীং সমারাধ্য সর্বাস্বামী চ ঈশ্বরঃ।।

ভুবনেশীং বিনা ঈশঃ কিঞ্চিৎকর্তুংনশক্যতে।।"
—'নির্বাণতন্ত্র', ৭।১৮-২০।

ব্রহ্ম বা শিব শক্তিহীন হলেই শবস্বরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াহীন ;যথা,—

(১) "শক্তিহীনঃ শবঃ সাক্ষাচ্ছক্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ৪।৩৩।

(২) "শক্ত্যা যুক্তো যদা দেবী তদৈব শিবরূপকঃ।"
—'তোড়লতন্ত্র', ১।২৪।

অতএব, "শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব" বাক্যটি তন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। "আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব" তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত প্রধান তিনতত্ত্ব।[১৫১] তান্ত্রিক-সাধনতত্ত্বের মূল এই তিনতত্ত্বেই নিহিত ;এই তিনটি তত্ত্ব-স্মরণ দ্বারাই তান্ত্রিক আচমন করতে হয়।[১৫২] অতএব, 'অন্নদামঙ্গলে'র উদ্ধৃতাংশটিতে তন্ত্রতত্ত্বই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

মশানে সুন্দরের কালিকা-স্তুতি প্রসঙ্গে কবি বলছেন যে,—

"পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে কলিকার স্তুতি করে
কবিরায় গুণাকর কয়।"[১৫৩]

এই 'পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষর' যে তন্ত্রোক্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ, তা' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তন্ত্র-সাধনায় ও জপাদিতে এই পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই বিষয়ে 'কামধেনুতন্ত্র', ' তোড়লতন্ত্র', 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রভৃতিতে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। স্বয়ং মহাশক্তি এই পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণরূপিণী এবং স্বয়ং দেবী কালিকা এই পঞ্চাশটি বর্ণরূপ মুণ্ডমালায় বিভূষিতা।

(১) "পঞ্চাশন্মাতৃকাদেবীং নানাসুখবিলাসিনীং।
নানাবিদ্যাময়ীং দেবীং মহাবিদ্যাময়ীং তথা।।"
—'কামধেনুতন্ত্র', ১।৭।

(২) "পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্।"
—'নিরুত্তরতন্ত্র', ২।৩৫।

এইজন্যই ভারতচন্দ্র 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে সুন্দর কর্তৃক দেবী কালিকার স্তুতি করিয়েছেন। এই স্তবে ভারতচন্দ্র স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধবর্ণনায় দেবীর তন্ত্রোক্ত ভীষণ-মধুর রূপটিকে সার্থকভাবে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।[১৫৪]

মহাদেবের 'সিদ্ধিভক্ষণ'-প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে,—

"সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।।
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগলয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একাভাব হয়ে।।
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিঃশ্বাসে পিয়া করিল নিঃশেষ।।"[১৫৫]

এখানে কবি একটি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'সিদ্ধি'র তান্ত্রিক পারিভাষিক নাম হচ্ছে 'সম্বিদা' বা 'বিজয়া'। তন্ত্রে যেমন 'পঞ্চতত্ত্ব' (মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন) শোধনের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট রয়েছে,[১৫৬] তেমনই সিদ্ধি বা 'বিজয়া' সাধনাঙ্গরূপে শোধন ক'রে গ্রহণ করতে হয়। বিজয়া-শোধনের মন্ত্র হচ্ছে,— "ওঁ হ্রীঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃত-মাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা।"[১৫৭] এ'ছাড়া সিদ্ধি বা বিজয়ার উপর মূলমন্ত্র জপ করতে হয়। 'অঙ্গুলির অগ্রভাগে'র দ্বারা তান্ত্রিক তত্ত্বমুদ্রাকেই (অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলির যুক্তাবস্থা) নির্দেশ করা হচ্ছে। এই বিজয়া যথাবিহিত শোধন ক'রে তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা গুরু ও ইষ্টদেবীর তর্পণপূর্বক প্রথমতঃ কুণ্ডলিনীমুখে "ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বসত্ত্বশঙ্করি স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি প্রদান করতে হয়।[১৫৮] এই বিশেষ তান্ত্রিক পদ্ধতিই উদ্ধৃতাংশের 'ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে', 'মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মহাদেবের সিদ্ধিভক্ষণের লৌকিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ার এই প্রক্ষেপটি ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভায় তন্ত্র-প্রভাবের গভীরত্বই সূচিত করে।

'অন্নদামঙ্গলে' 'শিবের পঞ্চতপ'-অংশে মহাদেব কর্তৃক অন্নপূর্ণা-স্তুতির নিম্নোদ্ধৃত অংশটি তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের আধারেই রচিত। যথা,—

"তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল।।
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া কর যেই জনে।।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রসবিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি।।

বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানামূর্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর।।"[১৫৯]

পরমাপ্রকৃতি যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ প্রসব ক'রে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন, সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তি সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই এবং তিনিই সৃষ্টিলীলার একমাত্র কারণস্বরূপিণী,[১৬০]—তন্ত্রের এই শক্তি-মাহাত্ম্যই উদ্ধৃতাংশে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে।

'শিবের অন্নদাপূজা' অংশে 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল' নামক পূজাদি কার্যে প্রযুক্ত একটি তান্ত্রিক মণ্ডল[১৬১] বা যন্ত্র-অঙ্কনের কথা উল্লিখিত হয়েছে ;যথা—

"সর্বতোভদ্রনাম মণ্ডলচিত্রধাম
লিখিলা আপনি বিধাতা।"[১৬২]

শিব কর্তৃক এই অন্নদাপূজার ক্রম (বলি-হোমাদি) সম্পূর্ণরূপে তন্ত্র-বিহিত পূজারই নির্দশন।[১৬৩]

এইরূপে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার দ্বারা এই কাব্যে তন্ত্র-প্রভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের শক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণনা, দেবীর স্তব-রচনা, অন্নপূর্ণাদেবীর রূপকল্পনা ও পূজা-পদ্ধতির চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে তন্ত্র ও তান্ত্রিক ভাবধারার স্বাক্ষর স্বচ্ছরূপ লাভ করেছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্তিমলগ্নে কবি ভারতচন্দ্র দেবী অন্নপূর্ণার যে মাহাত্ম্য-গীতি রচনা করেছিলেন, তা' কেবলমাত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রস-পিপাসা চরিতার্থতার জন্যই নয়, কবি-মানসে এবং বাংলার জাতীয় জীবনে ও ধর্মে তন্ত্র ও তান্ত্রিকতার ব্যাপক প্রভাবের রসোচ্ছল পরিচিতি-দানও কবির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই কবি কাব্যমধ্যে পুনঃ পুনঃ তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রাদির সভক্তি-উল্লেখ করেছেন।

(১) "শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে।
নিগম আগমে যারে আদ্যাশক্তি বলে।।"[১৬৪]

(২) "তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশিত তাহা পূরণ করিলা।।"[১৬৫]

'কালিকামঙ্গল' (বিদ্যাসুন্দর) কাব্য

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় তন্ত্র-প্রভাবের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হচ্ছে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যসমূহ। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যগুলিতে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বিদ্যা-সুন্দরের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। দেবী কালিকা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যগুলিতে কালীর তান্ত্রিক রূপ-প্রকৃতি ভাস্বর হয়ে উঠেছে এবং এতে বর্ণিত সুন্দরের কালী-সাধনার চিত্র তন্ত্রানুসারী সাধন-পদ্ধতির সার্থক আলিম্পন। এই প্রসঙ্গে একজন গবেষকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ;—"তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তির অসম্ভবকে সম্ভব করানোর ক্ষমতা খুব প্রসিদ্ধ। একসময় বাংলা দেশে তন্ত্রবিদ্যার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতিরই কিয়দংশ মন্ত্রশক্তি বিদ্যার সহিত যুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে মনে হয়।"[১৬৬] দেবীকালিকার প্রসাদেই 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়লীলা সার্থকতা লাভ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যা-সুন্দর কাব্যধারায় কবি শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ, প্রাণরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কয়েকজন কবির কাব্যকে কেন্দ্র ক'রে আমরা তন্ত্র-প্রভাবের একটা রেখাচিত্র দান করব।

প্রথমেই খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' কাব্য (১৬৭৬ খ্রীঃ)[১৬৭] সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাংলা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারায় কবি কৃষ্ণরামের কাব্যটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাঁর কাব্যে কালিকার মাহাত্ম্য সবিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। কবি কাব্যারম্ভেই দেবী কালীর তন্ত্র-বর্ণিত রূপের বন্দনা করেছেন ; যথা,—

"শম্ভুর উপর চরণ জোর
সজল জলদ বরণ ঘোর,

* * *

বাম যুগল করহ্ চণ্ড,
সুখর খড়্গ মনুজ মুণ্ড,
অভয় বরদ অপরা হাত
নরশিরচয় মালিনী।"[১৬৮]

তন্ত্রের শিব-শক্তির অভেদত্ব সুন্দরের কথায় বলিষ্ঠ রূপলাভ করেছে।

"যোগী মহাশয় তুমি জগত পূজিত।
শিব শিবা ভেদ কর নহেত উচিত।।"[১৬৯]

এই কাব্যে সুন্দরের কালীপূজা ও কালীস্তুতিও তন্ত্রের অনুসরণে রচিত।

"লহো লহো করে লোল লোহিত রসনা।
জল জলদতনু ককুভভূষণা।।
অভয় বরদে দুই দক্ষিণ করেতে।
খড়্গ চন্দ্রহাসমুণ্ড শোভে সর্বহাতে।।
চিকুরে গাথিল গলে নরশিরহার।
করাল কলিঙ্গে দুই বদন বিথার।।
সদাশিব উপরে চরণপদ্ম সাজে।
গাঁথিল ধমনী করকিঙ্কিণী বিরাজে।।"

* * *

"গুণসাগরের পুত্র গুণের গরিমা।
শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠিলা কালীর প্রতিমা।।
নানারত্ন অলঙ্কারে করিল ভূষিত।
ভকতের পূজাতে ভবানী হরষিত।।"

* * *

"পুলকেতে গুণসিন্ধু রাজার কুমার।
বলিদান কৈল কত হাজার হাজার।।
মেড়া অজা হয় পর না যায় গণন।
রুধিরে খর্পর পুরি দিল ততক্ষণ।।"

* * *

"তুমি রাত্রি তুমি দিবা তুমি শম্ভুকাল।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত (তুমি) সে পাতাল।।
তুমি ভীমা ভয়রূপা তুমি ভয় হরো।
লীলায় পাতিয়া সৃষ্টি কত রঙ্গ করো।।"[১৭০]

এই কাব্যে সুন্দর কর্তৃক দেবী কালিকার 'চৌত্রিশা' স্তবটিও [১৭১] তন্ত্র-প্রভাবের নিদর্শন। এ' সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ, কবি কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যটি আদ্যন্ত কালীর মহিমা-কীর্তনে মুখর। কবি কাব্যাখ্যানে সুন্দর ও বিদ্যার প্রণয়লীলার

প্রতিটি পদক্ষেপে যেমন মহাশক্তি কালীর বরাভয়দানের চিত্রটিকে সার্থক কাব্যরূপ দান করেছেন, তেমনই নিজেও তদ্গতচিত্তে ক্ষণে ক্ষণে দেবীকালিকার কৃপা ও প্রসাদ প্রার্থনা করেছেন।

(১) "মায়ায় মোহিত মিছা যতো দেখ আর।
কালিকা করুণামই সবে ঐ সার।।
কাতর হইয়া কবি কৃষ্ণরাম বলে।
কি গুণে শরণ পাবো চরণ কমলে।"[১৭২]

(২) "কালিকামঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম বলে।
অন্তকালে দিও স্থান চরণ কমলে।।"[১৭৩]

এরপর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী। কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল' কাব্যটি পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, কবি আখ্যানাংশের বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়োপাখ্যান অপেক্ষা দেবী কলিকার অঘটন-ঘটনপটয়সী মহিমার বর্ণনাতেই অধিকতর আগ্রহী। কবি বলরাম চক্রবর্তী তন্ত্রশাস্ত্রে যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্য-বর্ণিত তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন চক্র, মণ্ডল, পূজাক্রম প্রভৃতির বর্ণনায়। কবির 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে তন্ত্র-প্রভাবের নিদর্শন-স্বরূপ আমরা কয়েকটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

(১) সুন্দর কর্তৃক কালিকার পূজা :—

"পাইয়া উপাক্ষণ নৃপতি নন্দন
পূজয়ে দেবী ভদ্রকালী।
রজনী নিশাভাগে মন্ত্র জপি জাগে
শতেক ছাগ দিয়া বলি।।
জবা পুষ্প শত শত চন্দনে ভূষিত
নৈবেদ্য দিয়া ধূপধুনা।
প্রণতি নুতি স্তুতি করিয়া ভকতি
পূজয়ে দেবী ত্রিনয়না।।"

এবং,

"কূর্মচক্র নিরমিয়া তাহে সব থুয়্যা।
তাহার উপরে বৈসে সুসজ্জিত হৈয়া।।

একে একে ন্যাস করে যার যত বীজ।
শোষণ দহন বৃষ্টি উৎপাতন নিজ।।
করিলেক ভূতশুদ্ধি একান্ত হইয়া।
পঞ্চদশ দলে পূজে মাতৃ আরোপিয়া।।"[১৭৪]

(২) দেবী কালিকা সুন্দরের আরাধনায় চঞ্চল হয়ে দাসী বিমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে তাঁকে স্মরণ করছে। দেবী-আজ্ঞায় তখন বিমলার গণনা-পদ্ধতিটি লক্ষণীয় ;—

"সর্বতোভদ্র পাতি বিমলাযুবতী
জানিঞা তারে কিছু বলে।
শ্রীকবিশেখর করিয়া জোড় কর
বলে কালী পদতলে।।"[১৭৫]

উপরি-উদ্ধৃত অংশসমূহ তান্ত্রিক ক্রিয়াদির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। উক্ত অংশসমূহে উল্লিখিত 'কূর্মচক্র', 'সর্বতোভদ্র' ('সর্বতোভদ্রমণ্ডল') প্রভৃতি চক্র ও মণ্ডল তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়ার অঙ্গীভূত। 'ভূতশুদ্ধি' তন্ত্রোক্ত সমস্ত রকম সাধনা ও পূজার অপরিহার্য অঙ্গ।[১৭৬] এই 'ভূতশুদ্ধি' বা দেহশুদ্ধি-প্রক্রিয়ার দ্বারাই সাধক নিজে দেবতাময় হয়ে সাধনা ও পূজার যথার্থ অধিকারী হয় এবং সিদ্ধির চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়।

বস্তুতঃ, কবিশেখর বলরামের 'কালিকামঙ্গলে' বিবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি দেবী পূজায় পশুবলি, শ্মশানসাধনা প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বিদ্যা কর্তৃক কালীপূজার উল্লেখ থেকে [১৭৭] সেকালে অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যেও কালীপূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল অনুমিত হয়। সুন্দরের কালিকাস্তবে শক্তির অনন্ত মহিমা ঘোষিত হয়েছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন দেবী কালিকাকে সর্বকর্মের ও সর্বশক্তির মূল রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সুন্দরও তেমনই শাস্ত্রানুযায়ী কালিকার স্তুতি করেছে।

পারস্পরিক মিলনকাঙ্ক্ষায় বিদ্যা ও সুন্দর উভয়ের দ্বারাই দেবী কালিকার আরাধনার মধ্য দিয়ে কবিশেখর বলরাম তন্ত্রানুযায়ী কালীসাধনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

সর্বশেষে, 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারায় আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করব। বাংলা শাক্তপদাবলী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে তন্ত্র-সাধক ছিলেন, তা' সর্বজনবিদিত। সিদ্ধ তান্ত্রিক-সাধকরূপে রামপ্রসাদ আজও বাঙ্গালীর হৃদয়ে অম্লান গৌরবে

অধিষ্ঠিত আছেন। কৌলাচারী তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন সাধন-ক্রিয়া নিজ-জীবনে গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। সেই কারণেই, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্র-সাধনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কাব্যের বন্দনাংশে কবি দেবী কালিকার তান্ত্রিক ধ্যান-রূপেরই[১৭৮] অনুসরণ করেছেন।

> "কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
> লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদল বিশাল।।
> হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
> বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান।।
> অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে।
> বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে।।
> বিবস্ত্রা যোগিনী ঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
> বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে।।"[১৭৯]

বিদ্যাকর্তৃক দেবীস্তবের নিম্নোদ্ধৃত অংশটিও এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—

> "তুমি নিত্যা পরাৎপরা — জন্মজরামৃত্যুহরা
> তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব।।
> তুমি জল তুমি স্থল — ধর্মাধর্ম ফলাফল
> তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
> তুমি কুলাচল সিন্ধু — তুমি রবি তুমি ইন্দু
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী।।
> তুমি শান্তি পুষ্টি স্বধা — তুমি লজ্জা তুমি মেধা
> মহামায়া করালরূপিণী।
> শক্তিরূপা সর্বভূতে — বিহরসি শৈলসুতে
> কুণ্ডলিনী চক্র বিভেদিনী।।
> ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ — রূপিণী লিখনকন্দ
> স্থূল সূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
> অপর্ণা অভয়া উমা — ভবানী ভৈরবী ভীমা
> সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী।।"[১৮০]

বিদ্যার এই কালীস্তব এবং সুন্দরের চৌত্রিশ অক্ষরে কালীস্তুতিটি[১৮১] বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত কালীস্তোত্রের[১৮২] অনুসরণেই রচিত।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে "সুন্দরের দক্ষিণাকালিকা মূর্তি সংস্থাপন"[১৮৩] ক'রে কালীপূজা এবং শ্মশানে শবসাধনার বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী। রামপ্রসাদ স্বয়ং নিষ্ঠাবান বীরাচারী সাধক ছিলেন। এই কারণে সুন্দরের 'শবসাধনা'র[১৮৪] যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা' তন্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতির অবিকল কাব্যরূপ। প্রমাণস্বরূপ আমরা রামপ্রসাদ কর্তৃক সুন্দরের শবসাধনার বর্ণনার অংশবিশেষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রদত্ত-বিধান ও পদ্ধতি পর পর উদ্ধৃত করলাম।

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দরের শবসাধনা ঃ—

"প্রযত্নে সংগতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব।।
ভৌমবার যুতা কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী।।

*　　*　　*

পূর্ব উক্ত স্থানে গেলা কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি।।
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র।।
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব দিক ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি।।
বীরার্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহাকুতূহলে।।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ।।
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ।।
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়।।

তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেই রূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ।।
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন।।
শূলে খড়্গো বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে।।

* * *

সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর।।

* * *

মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সকৌতুকে জলবিন্দু দিল।।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশিত মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম।।
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে।।
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেই মত চন্দনাদি করিল লেপন।।
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শব করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে।।
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটি দেশ।
পূজা স্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ।।
অতঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব শির রাখে শব আছে যেবা বিধি।।
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল।।
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ।।
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র[১৮৫] মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার।।

দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পুষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র।।

* * *

উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে।।
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন।।
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ষু পূর্বমত রাখে স্থানে স্থান।।
ইন্দ্রাদিদেবতা পূজে স্বামি সম্বোধনে।
বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে।।
চতুঃষষ্ঠি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত।।
মূলমন্ত্রে শবাসন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি।
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধর‍্যে করে যুটিকাবন্ধন।।
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি মত কৈল প্রাণায়াম।।
ক্ষেপ করে দশ দিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্ধনে।
তদন্তে সংকল্প কৈল উল্লসিত মনে।।
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়।।
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ।।
ততঃশব দুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া।

* * *

শিব শিবা গুরুভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা[১৮৬] জপ করে মহাকবি।

কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জরবলি আশু ধরাপতে।।
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননী।।
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী।।

* * *

লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণী ভূষণ।
পুরমধ্যে তিনদিন রহে সঙ্গোপন।।
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা।।
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক।।
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ।।"[১৮৭]

সুন্দরের উপরি-উল্লিখিত শবসাধনার বর্ণনাটি তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদত্ত বিধি-বিধানেরই যেন বঙ্গানুবাদ। রামপ্রসাদ উপরি-উক্ত বর্ণনায় 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আমরাও এজন্য 'তন্ত্রসারে' বর্ণিত শবসাধনার পদ্ধতির অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করলাম।

"বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং। * * * ততঃ পূর্বোক্তান্যতমস্থানং গত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় পূর্ব-মুখোমূলান্তে ফট্‌কারং দত্ত্বা যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য গুরুং গণেশং বটুকং যোগিণীঞ্চ চতুর্দিক্ষু পূর্বাদিতঃ সংপূজ্য পূর্বোক্ত বীরার্দনমন্ত্রং ভূমৌবিলিখ্য যেচাত্রেত্যাদি পূর্বোক্তক্রমেণ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পূর্বোক্তক্রমেণ পূর্ববদ্বলিং দত্ত্বা অঘোরমন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং বিধায় সুদর্শনমন্ত্রান্তে আত্মানং রক্ষ রক্ষেতি হৃদি হস্তং দত্ত্বা আত্মরক্ষার্থং কুর্যাৎ। * * * ততঃ পূর্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং ন্যাসজালঞ্চ বিধায় জয়দুর্গামন্ত্রেণ দিক্ষু সর্ষপান্ বিকীর্য তিলোঽসীতি মন্ত্রেণ তিলাংশ্চ বিকীর্য বিহিত শবসমীপংগচ্ছেৎ। বিহিত শবো যথা ভাবচূড়ামণৌ—যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতং। বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতিকং। তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টঃ সমুজ্জ্বলং। পলায়নবিশূন্যন্ত সংমুখে রণবর্তিনাং।* * * এবমুক্তং শবং গৃহীত্বা

মূলমন্ত্রেণ পূজাস্থানমানয়েৎ। তৎসমীপং গত্বা ওঁ ফট্ ইতি শবমভ্যুক্ষ্য *** পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা জলেন স্নাপয়িত্বা বাসসা জলমুত্তোল্য ধূপৈর্ধূপয়িত্বা চন্দনাদিনা শবং প্রলিপ্য শবস্য কটীদেশং ধৃত্বা পূজাস্থানং সমানয়েৎ। * * * ভাবচূড়ামণৌ—ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ। রক্তাঙ্গো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকং। ততঃ এলা-লবঙ্গকর্পূর-জাতী-খাদিরাদ্যার্দ্রকং তাম্বুলং তন্মুখে দত্ত্বা শবং অধোমুখং কুর্যাৎ। * * * তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্যপ্রয়তঃ সুধীঃ। বাহুমূলাদি কট্যন্তং চতুরস্র বিধায় চ। মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতং। পীঠমন্ত্রং লিখেন্মধ্যে তত্তৎকল্পবিধানতঃ। * * * তদুপরি কম্বলাদ্যাসনং ন্যসেৎ। গত্বা শবস্য সান্নিধ্যং ধারয়েৎ কটিদেশতঃ। যদ্যুপদ্রাবয়েত্তস্য দদ্যান্নিষ্ঠীবনং শবে। পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমানয়েৎ। ততো দ্বাদশাঙ্গুল যজ্ঞকাষ্ঠানি দশদিক্ষু পূর্ব্ববৎ সংস্থাপ্য ইন্দ্রাদিদশ-দেবতাঃ সংপূজ্য সামিষান্নেন বলিং দদ্যাৎ। * * * অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো-বলিঞ্চ স্মারয়েত্ততঃ। চতুঃষষ্ঠী যোগিনীভ্যো-ডাকিনীভ্যোঽপি সংদিশেৎ। * * * অথ * * * শবং সংপূজ্য * * * অশ্বারোহণ ক্রমেণ শবোপর্যুপবিশ্য স্বপদতলে কুশান দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য ঝুটিকাং বদ্ধা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়াম-ষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা পূর্ব্ববৎ বীরার্দন মন্ত্রেণ দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ নিক্ষিপ্য সংকল্পং কুর্যাৎ। * * * শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য শবঝুটিকায়াং পীঠপূজাং কৃত্বা * * দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। *** ততঃ শবচরণৌ পট্টসূত্রেণ বদ্ধা মূলেন দৃঢ়ং বন্ধয়েৎ। * * * শবস্য পাদমূলে ত্রিকোণং যন্ত্রং লিখেৎ। ততঃ শবোপর্যুপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা বিহিতমালয়া মৌনীভূত্বা বিগতভীর্জপেৎ। * * * যদি জপকালে আকাশগত্যা কুঞ্জরাদিকং প্রার্থয়তে তদা দিনান্তরে দাস্যামি মমস্থানে স্বনাম কথয় ইত্যুক্ত্বা পুনর্জপেৎ। * * * ত্রিরাত্রং বাথ ষড়্রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ। * * * গীত্বং শ্রুত্বা চ বধিরো-নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ। যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাস্য মূকতা ভবেৎ। পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ।”[১৮৮]

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রামপ্রসাদ সুন্দরের শবসাধনার বর্ণনায় তন্ত্র-নির্দেশকে সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন। বস্তুতঃ রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যটির ছত্রে ছত্রে-শক্তি সাধক কবির তন্ত্রানুগত্য ও কালিকাভক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিরাজমান। তন্ত্রোক্ত মহাদেবী কালিকার মাহাত্ম্য এবং তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির বর্ণনাই রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। কেবল রামপ্রসাদের কাব্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ‘কালিকামঙ্গল’ বা ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য-কাহিনীতেই দেবী কালিকার তন্ত্রানুগ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং তান্ত্রিক সাধন-রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যগুলিতে বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার সঙ্কেত রয়েছে। এইপ্রসঙ্গে একজন সুপণ্ডিত সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"বামাচারী শক্তি সাধনায় স্থূলশক্তিকে লইয়া সাধন করার রীতি আছে। 'শিবায়ন' কাব্যের হর-পার্বতীর বিচিত্র দাম্পত্য মিলনের মধ্যে সেই গূঢ়তর রহস্যের সঙ্কেত রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া কোচ-পল্লীতে শিবের গতায়াত এবং কোচরমণীর রূপে রূপমুগ্ধতা অনুরূপ সাধনরীতিরই ইঙ্গিত বহন করে। তবে রূপকাবরণ এবং দেবীর গৃহস্থালীর বিবিধ বর্ণনার মধ্যে এই সাধন-রহস্য তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।"[১৮৯]

এইভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ করলে তন্ত্র-প্রভাব সহজেই লক্ষিত হবে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, চৌতিশা-স্তব প্রভৃতি অংশে শাক্ত-তান্ত্রিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির অনুষ্ঠান ও চর্চা সুপ্রাচীন কাল থেকেই উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাংলার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্যগুলির আখ্যানভাগে শক্তিতত্ত্ব ও তান্ত্রিক সংস্কারের স্বাক্ষর রয়েছে। শাক্ত-তান্ত্রিক ঐতিহ্যজাত বিচিত্র উপলব্ধি ও প্রেরণা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তুকে পরিপুষ্ট করেছে।

পাদটীকা

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলকাতা, ১৯৭৫ ; পৃ: ৬৯।
২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৪৭।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী ; ১৯৬৪ ; পৃ: ১৪৮-১৪৯।
৪. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকা', কলকাতা, ১৯৭৪; পৃ: ৪৩, ৬০।
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৭।
৬. 'মহানির্বাণতন্ত্র' (৪।১০-৩৩), 'কুব্জিকাতন্ত্র' (১।১৮-২৯)।
৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৪৮
৮. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৩।
৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২১০।
১০. 'মহনির্বাণতন্ত্র'—৪র্থ উল্লস ; কুব্জিকাতন্ত্র

১১. প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, 'বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ', প্যারাডাইজ, কলকাতা, ১৩৩৭; পৃ: ২৭৫।

১২. প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ২৭৬।

১৩. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯ ; পৃ: ৩৩৫।

১৪. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ৩৩০।

১৫. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫, ভূমিকা।

১৬. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ৩।

১৭. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ১০৮-১০৯।

১৮. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১১৩।

১৯. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল', কলকাতা, ১৯৭৫ ; পৃ: ১৬৬-১৬৭।

২০. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭৫।

২১. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭৬।

২২. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭৬।

২৩. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি কৃষ্ণরামের গ্রন্থাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮ ; পৃ: ১৬১।

২৪. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ:

২৫. ঐ, ঐ ; পৃ: ২৭৭-২৭৮।

২৬. ঐ, ঐ ; পৃ: ৩৩৬।

২৭. ঐ, ঐ ; পৃ: ৩৩৭।

২৮. ঐ, ঐ ; পৃ: ৩৫০।

২৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৯ ; পৃ: ৮-৯।

৩০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ১৪।

৩১. ঐ, ঐ ; পৃ: ১৩১।

৩২. ঐ, ঐ ; পৃ: ৩৪৭।

৩৩. ঐ, ঐ ; পৃ: ২৭৯।

৩৪. 'কামধেনুতন্ত্র' (১।৬-৯)।

৩৫. 'কামধেনুতন্ত্র' (১২।১-৪)।

৩৬. 'অন্নদাকল্পতন্ত্র' নামক তন্ত্রগ্রন্থ। এতে দেবী অন্নপূর্ণার অর্চনাপদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ১০।
৩৮. ঐ, ঐ ;পৃ: ২৬।
৩৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ১১।
৪০. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', কলকাতা, ১৯৬৭ ;পৃ: ১৮৪-১৮৫।
৪১. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ১৮৫।
৪২. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৪৩. ঐ, ঐ ; ভূমিকা।
৪৪. ঐ, ঐ ; ভূমিকা।
৪৫. ঐ, ঐ ;পৃ: ৩২৪।
৪৬. ঐ, ঐ ; 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৪৭. ঐ, ঐ ; 'ভূমিকা', পৃ: ৩।।. ।
৪৮. ঐ, ঐ ; ভূমিকা, পৃ: ৩।।. ।
৪৯. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য দ্বিজমাধবের কাব্যটির 'সারদাচরিত' নামকরণের পশ্চাতে প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ 'সারদাতিলকে'র প্রভাব রয়েছে ব'লে মনে করেছেন। তিনি কাব্যবর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে তান্ত্রিক সরস্বতী বা বাগীশ্বরীর প্রভাব প্রমাণ করেছেন। (দ্রষ্টব্য—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত';ভূমিকা)
৫০. (ক) 'আদিত্যং পূজয়েদাদৌ প্রতক্ষ্যং লোকসাক্ষিণং।
অনথা নৈব সিদ্ধিঃস্যাৎ কল্পকোটিশতৈরপি।।"
(খ) "স্নানন্তু বিধিবৎ সন্ধ্যাং তর্পণং সূর্যপূজনং।
কৃত্বা পূজালয়ে চাত্র পঞ্চমীং পূজয়াম্যহমিতি।।"
—'তন্ত্রসার', পৃ: ৫৩৫
৫১. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ৬।
৫২. 'কামধেনুতন্ত্র'—প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পটল দ্রষ্টব্য।
৫৩. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃ: ৩০-৩১।
৫৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৯-১০।
৫৫. ঐ, ঐ, পৃ: ১২১-১২২।
৫৬. ঐ, ঐ, পৃ: ১১০।
৫৭. ঐ, ঐ, পৃ: ১৯২।
৫৮. "ক্রমোৎক্রমগতৈর্মালা মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেরুকৈঃ।"
—তন্ত্রসার, পৃ: ৬৮।
৫৯. 'কামধেনুতন্ত্র' ;(১।৬-১৫), (৪।৭৮-৮০)।
৬০. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা—৩।।. ।
৬১. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৪৯
৬২. ঐ, ঐ, পৃ: ১৫২।

৬৩. তন্ত্রসার, পৃ: ২০০
৬৪. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৫২।
৬৫. ঐ, ঐ, পৃ: ১৫২।
৬৬. তন্ত্রসার, পৃ: ২৪৬।
৬৭. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৫২।
৬৮. কুব্জিকাতন্ত্র, ১।২৫-২৯।শারদাতিলক—প্রথম পটল।
৬৯. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৭৮।
৭০. ঐ, ঐ, পৃ: ১৭৫-১৭৬, ১৭৮।
৭১. 'নির্বাণতন্ত্র' (১ম, ২য়, ৭ম ও ১০ম পটল), 'কুব্জিকাতন্ত্র' (১ম পটল), 'মহানির্বাণতন্ত্র' (৪র্থ ও ১১শ উল্লাস) দ্রষ্টব্য।
৭২. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৮২।
৭৩. 'নিগম' তন্ত্রশাস্ত্রের একটি বিভাগ। তন্ত্রশাস্ত্রের দু'টি প্রধান বিভাগ হচ্ছে 'আগম' ও 'নিগম'।
৭৪. সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৫১-৪৫৪।
৭৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫০।
৭৬. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৫৫।
৭৭. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫৮।
৭৮. ঐ, ঐ, পৃ: ৪৫৯।
৭৯. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ), কলকাতা, ১৯৭০ ;পৃ: ২২৬-২২৭।
৮০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯৯৬-১০০১।
৮১. ঐ, ঐ, পৃ: ২৯৭-৩০৩।
৮২. সুকুমার সেন, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২২২।
৮৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১০০১।
৮৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৯৯৭-৯৯৮।
৮৫. 'তন্ত্রসার', পৃ: ১৫০-৩০০।
৮৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাইশকবির মনসামঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪ ;পৃ: ৭৯।
৮৭. সুকুমার সেন, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৯৮।
৮৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাইশকবির মনসামঙ্গল', পৃ: ৬০
৮৯. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বৌদ্ধগান ও দোহা', কলকাতা, ১৩২৩ ;'মুখবন্ধ'— পৃ: ৪।
৯০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৬ ;পৃ: ২৫৮।

৯১. নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত, 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' ;কলকাতা, ১৩৫৫ সাল ;পৃ: ২৩১-২৩৩।
৯২. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, অপরার্ধ), কলকাতা, ১৯৬২ ; পৃ: ১২৬-১২৭।
৯৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৬৯৩।
৯৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৬০।
৯৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৩০।
৯৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৫৩, পৃ: ৮৯।
৯৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৮৯।
৯৮. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৯।
৯৯. ঐ, ঐ, পৃ: ৯১।
১০০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৬২১।
১০১. ঐ, ঐ, পৃ: ৬৯৫।
১০২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৫৫।
১০৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯০।
১০৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৫৭৮-৫৭৯, ৬৯৩।
১০৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৫৫-২৫৮।
১০৬. ঐ, ঐ, পৃ: ২৭৯।
১০৭. কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালী', কলকাতা, ১৯৫০ ;পৃ: ১৪৬।
১০৮. 'মহনির্বাণতন্ত্র', তৃতীয় ও চতুর্থ উল্লাস।
১০৯. 'কুব্জিকাতন্ত্র', প্রথম পটল।
১১০. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯৩।
১১১. ঐ, ঐ, পৃ: ৯৩।
১১২. কল্যাণী মল্লিক, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১৪৬।
১১৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৯৮।
১১৪. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, 'মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০ ;পৃ: ২৫-২৭।
১১৫. 'নির্বাণতন্ত্র', প্রথম পটল।
১১৬. বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪।
১১৭. সুকুমার সেন, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২০৮।
১১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ৪৪২।
১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৯ সাল ;পৃ: ১০।

১২১. ঐ, ঐ, পৃ: ৬৯।
১২২. ঐ, ঐ, পৃ: ২৬।
১২৩. ঐ, ঐ, টিপ্পনী, পৃ: ৪২৭
১২৪. ঐ, ঐ, পৃ: ৩৪৯।
১২৫. ঐ, ঐ, পৃ: ৯।
১২৬. ঐ, ঐ, পৃ: ১৮।
১২৭. ঐ, ঐ, পৃ: ১৯।
১২৮. ঐ, ঐ, পৃ: ১৩৩।
১২৯. ঐ, ঐ, পৃ: ৩।
১৩০. ঐ, ঐ, পৃ: ৮-৯।
১৩১. 'অন্নদাকল্পতন্ত্র'—৭।২-১০ ; ১৭।৫-১০।
১৩২. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ: ১২৫।
১৩৩. অন্নদাকল্পতন্ত্র ; ২। ১৯।
১৩৪. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৪-১৫।
১৩৫. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১।৫৯।
১৩৬. 'নিরুত্তরতন্ত্র', ২।৯-১২।
১৩৭. 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', পৃ: ১৮-১৯।
১৩৮. ঐ, ঐ, পৃ: ১৬-২৮।
১৩৯. ঐ, ঐ, পৃ: ২৮।
১৪০. 'কালীতন্ত্র', পৃ:
১৪১. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৭।
১৪২. 'তন্ত্রসার', পৃ: ৬৫০-৬৫১।
১৪৩. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৭।
১৪৪. 'তন্ত্রসার', পৃ: ৪৭৬-৪৭৭।
১৪৫. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৭।
১৪৬. 'তন্ত্রসার', পৃ: ৪৫৭।
১৪৭. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৬-১৯।
১৪৮. ঐ, পৃ: ২৭।
১৪৯. 'গন্ধর্বতন্ত্র', ৩৬।২৯।
১৫০. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ১৩১।
১৫১. উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, 'পরশুরামকল্পসূত্রম্', কলকাতা, ১৩৮৫ ; 'তত্ত্বসংখ্যানির্ণয়ঃ', পৃ: ৫০-৫২।
১৫২. তান্ত্রিক আচমনমন্ত্রঃ—"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।"

১৫৩. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ২৭৫।

১৫৪. ঐ, পৃ: ২৭৫-২৭৯।

১৫৫. ঐ, পৃ: ৪৮।

১৫৬. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫ম ও ৬ষ্ঠ উল্লাস।

১৫৭. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫।৮২-৮৮।

১৫৮. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫।৮২-৮৮।

১৫৯. 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', পৃ: ৮১।

১৬০. "নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্বভূত-প্রকাশিনী।।
সর্বতত্ত্বময়ী দেবী সর্বতত্ত্ব প্রকাশিনী।
ত্রিগুণা চ মহেশানি! ত্রিগুণস্য প্রকাশিনী।।"
—'কুব্জিকাতন্ত্র', ১।৫৪-৫৫।

১৬১. 'তন্ত্রসার', পৃ: ১৪৬-১৫০।

১৬২. 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', পৃ: ৮৬।

১৬৩. 'অন্নদাকল্পতন্ত্র', ষষ্ঠ পটল থেকে ষোড়শ পটল।

১৬৪. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ: ৬৯।

১৬৫. ঐ, পৃ: ৭৯।

১৬৬. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ ; ভূমিকা—৩।।

১৬৭. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', ভূমিকা—দথ.

১৬৮. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১—৩।

১৬৯. ঐ, ঐ, পৃ: ১২।

১৭০. ঐ, ঐ, পৃ: ১৩৫-১৩৬।

১৭১. ঐ, ঐ, পৃ: ১০৫-১০৮।

১৭২. ঐ, ঐ, পৃ: ১৩০।

১৭৩. ঐ, ঐ, পৃ: ১৪৩।

১৭৪. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বলরাম চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলকাব্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৩৭ সাল ; পৃ: ১১, ১৬১।

১৭৫. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১১।

১৭৬. 'কুলার্ণবতন্ত্র', 'মাতৃকাভেদতন্ত্র', 'কুব্জিকাতন্ত্র', 'মহানির্বাণতন্ত্র', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ সমূহে 'কূর্মচক্র', 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল', 'ভূতশুদ্ধি'-প্রক্রিয়া প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে।

১৭৭. "বিদ্যা বলে মাতা আমি করি নিবেদন।
নিত্যপূজা করি আমি কালীর চরণ।।"
—ঐ, 'কালিকামঙ্গল', পৃ: ৪৯।

১৭৮. 'তন্ত্রসার', পৃ: ৬০৩-৬০৫।

১৭৯. 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, পৃ: ৪।

১৮০. 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী', পৃ: ১৮।

১৮১. ঐ, পৃ: ৪৫-৪৭।

১৮২. 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', 'কালীতন্ত্র', 'কালীকুলসর্বস্ব', 'মহানির্বাণতন্ত্র' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৮৩. 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী', পৃ: ৫৭।

১৮৪. ঐ, পৃ: ৫৮-৫৯।

১৮৫. সম্ভবতঃ এটা ছাপার ভুল। শব্দটি 'চতুরস্র' (তান্ত্রিক পূজা ও হোমাদিতে অঙ্কিত সম চতুষ্কোন বিশিষ্ট যন্ত্র বা মণ্ডল) হবে।

১৮৬. মনুষ্যের ললাটাস্থি দ্বারা নির্মিত মালাকে 'মহাশঙ্খমালা' বলা হয়।—'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ২য় পটল।

১৮৭. 'রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী', পৃ: ৫৮-৫৯।

১৮৮. 'তন্ত্রসার', পৃ: ৬৬৯-৬৭৭।

১৮৯. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্ত-পদাবলী ও শক্তিসাধনা', কলকাতা, ১৩৬৭ ;পৃ: ৩০।

———

অষ্টম অধ্যায়

তন্ত্র ও শাক্তপদাবলী

শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঃ

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তন্ত্র-প্রভাবের প্রত্যক্ষ ও প্রোজ্জ্বল স্মারক শাক্তপদাবলী সাহিত্য। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক চেতনার অপূর্ব গীতি আলিম্পন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার শাক্ত-সঙ্গীত। তন্ত্র-প্রভাবকে বক্ষে ধারণ ক'রেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সূচনা হয়েছিল এবং মধ্যযুগের সমাপ্তি লগ্নে সেই তন্ত্র-প্রভাবেরই উচ্ছ্বসিত কলনিনাদ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে শাক্তপদাবলীতে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ('তন্ত্রসার' গ্রন্থ-প্রণেতা), ব্রহ্মানন্দ ('শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য' প্রণেতা), পূর্ণানন্দ পরমহংস ('শ্যামারহস্য' প্রণেতা) শঙ্কর আগমাচার্য, রঘুনাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিতগণের আবির্ভাব ও প্রেরণায় তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রতত্ত্ব-বিচারের যে উচ্ছ্বসিত স্রোত-ধারা বাঙ্গালী সমাজে প্রবাহিত হয়েছিল, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা'-ই এক বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি তান্ত্রিকসাধকদের সাধনা ও স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তিতে শাক্তপদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীই হচ্ছে শাক্তপদাবলীর বিকাশ ও পরিণতির যুগ। কিন্তু, শাক্তপদাবলীতে তন্ত্রতত্ত্বের ও শাক্তধর্মের যে অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ ঘটেছে, সেই তান্ত্রিক ভাবধারা ও শাক্তচেতনা বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রভাবিত করেছে, সেবিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি।

'মালসী' বা 'মালবশ্রী' নামে একশ্রেণীর দেবীবিষয়ক বা শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত পূর্বে প্রচলিত ছিল।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তসঙ্গীতগুলির ক্ষেত্রে 'শাক্তপদাবলী' নামটি প্রযুক্ত হয়েছে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুসরণে আধুনিককালে। শাক্তপদাবলীতে পরমাশক্তি কালিকা বা তাঁর বিভিন্ন নাম ও রূপের (উমা, চণ্ডী, দুর্গা, তারা ইত্যাদি) মহিমা ও সাধনতত্ত্ব সঙ্গীতাত্মক বাণীরূপ লাভ করেছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত

ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলীতে, চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যের দেবীবন্দনা ও বিভিন্ন অংশে, অনুবাদ সাহিত্যের শক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণনায়, বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধাতত্ত্ব ও বৈষ্ণব সহজিয়া পদাবলী প্রভৃতিতে শক্তিদেবীর মহিমাতত্ত্ব ও তান্ত্রিকচেতনার অভিব্যক্তির যে বিচিত্র ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা'ই শক্তিসাধক কবিগণের লেখনীতে শতধারে উৎসারিত হয়। একদা পাঠান রাজত্বের অবসানকালে ব্যাপক অরাজকতার সম্মুখীন হয়ে বাংলার মানুষ প্রচণ্ড ক্ষমতাশালিনী দেবীর বরাভয় প্রার্থনা ক'রে মঙ্গলকাব্যকে বাংলার জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ছিল, তখন সকল দুর্বিপাক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভক্তহৃদয় জগন্মাতা আদ্যাশক্তির নিকট আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার জনজীবনের এই সার্বিক অসহায়ত্ব ও উৎকণ্ঠাই শাক্ত পদাবলীর উৎসমুখ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ জীবনের সর্বত্র এক দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখন চরম অরাজকতা বিরাজমান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর মোগল বাদশাহের শাসন শৈথিল্যের সুযোগে সেই সময়ের বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারে এবং করভারে তখন বাংলার গণজীবন সদাসন্ত্রস্ত ও অতিষ্ঠ, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন শোষণ এবং অভাব-অনটনের তাড়নায় বিপর্যস্ত। জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় ; সামাজিক জীবন এক সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তা ও হাহাকারে নিমজ্জিত—এই অবস্থায় আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর চরণাশ্রয়ই ছিল বাঙ্গালীজাতির পরম অবলম্বন। সেইসময়ে দেশের অগণিত শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অভিযোগ ও মর্মবেদনাই তন্ত্র-সাধকদের বাণী-আলাপনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তৎকালীন জাতীয় জীবনের যন্ত্রণা ও অসহায়ত্বই তন্ত্র-সাধনার ইঙ্গিতবাহী শাক্ত-সঙ্গীতের নির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছে। তন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির বরাভয়-কামনাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত-পদাবলীর বিকাশের পথকে করেছে অবাধ ও উচ্ছ্বসিত এবং আজও সেই শাক্তগীতির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

শাক্তপদাবলীর কবিবৃন্দ ঃ

বাংলার শাক্তপদাবলীর কবিগণের অধিকাংশ ছিলেন তান্ত্রিকসাধক এবং এঁদের অনেকেই জনসমাজে সিদ্ধপুরুষরূপে বন্দিত। এইজন্যই কেবলমাত্র কাব্যরস স্ফূর্তির জন্য বা ভক্তির আবেগে শাক্তগীতিগুলি রচিত হয় নি, সাধনজনিত তত্ত্বোপলব্ধিই শাক্তপদাবলীতে কাব্যরূপ লাভ করেছে। তন্ত্রসাধনার বিচিত্র অনুভূতি ও শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যই শাক্তসঙ্গীতগুলির গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কণ্ঠেই শাক্তপদাবলীর প্রথম সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যময় বিকাশ। রামপ্রসাদই প্রকৃতপক্ষে শাক্তপদাবলী সাহিত্যধারার প্রবর্তক।[২] খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আনুমানিক দ্বিতীয় দশকে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রায় ষাটবৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।[৩] পিতৃবিয়োগের পর রামপ্রসাদকে দুঃখ-দারিদ্র্যময় তীব্র জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হলেও আপন মহত্ত্বে তিনি কোনও একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির (যাঁর আধীনে তিনি মুহুরিগিরি করতেন) গুণগ্রাহিতায় মোটামুটিভাবে অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পান। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর তান্ত্রিকসাধন মাহাত্ম্যে এবং অপূর্ব কবিত্ব শক্তি ও সঙ্গীতপ্রতিভার গুণে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন বহু রাজা ও জমিদারের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, স্বয়ং বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্‌ও কবির অলৌকিক সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪] রামপ্রসাদ অল্পবয়সেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং সমগ্রজীবনব্যাপী তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন সাধনপ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা জনসমাজে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকরূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অম্লান আসন লাভ করেন।[৫] কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'কালীকীর্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর'। কিন্তু, যে গুণে রামপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন, তা' হচ্ছে তাঁর আদ্যাশক্তির প্রতি অতলান্ত ভক্তি-সুধামণ্ডিত অজস্র শাক্তসঙ্গীত। কবি ব্যক্তিগত জীবনে তন্ত্রের বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির অনুশীলন করেছিলেন এবং সেই সাধন-রহস্যের বিচিত্র উপলব্ধিই সমসাময়িক সমাজজীবনের পটভূমিকায় গীতিময় রূপদান করেছেন। অনবদ্য শাক্তসঙ্গীতগুলির মাধ্যমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তৎকালীন দিক্‌ভ্রান্ত-নিপীড়িত-অসহায় জাতিকে তন্ত্র-শক্তির অভিসিঞ্চনে এবং মহাশক্তির চরণাশ্রয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছিলেন।

শাক্তপদাবলীর অপর একজন শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সাধক কবি কমলাকান্তের বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক পর্যন্ত কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য জীবিত ছিলেন।[৬] কমলাকান্ত অতি উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। সিদ্ধ কৌলাচারী তান্ত্রিক সাধকরূপে তিনি সমসাময়িককালে অশেষ খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র অলৌকিক সাধনশক্তির জন্য তাঁর একান্ত অনুগত ছিলেন এবং বর্ধমান রাজপরিবারের নিকট কমলাকান্তের আসন ছিল পরমপূজনীয়। সাধক কমলাকান্তের তন্ত্র-সাধনায় অলৌকিক সিদ্ধি সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কমলাকান্ত তন্ত্রোক্ত সাধন-ভজনে রত থাকতেন, প্রবাদ আছে যে, সেই আসনেই তিনি দেহরক্ষা করেন এবং তাঁর ইহলীলা

সংবরণের কাহিনীও অলৌকিক।[৭] 'সাধনরঞ্জন' নামে তন্ত্রসাধনার বিষয়ে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীতে কমলাকান্ত একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন—এ'রকম প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাব্যগ্রন্থটিতে কমলাকান্ত তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী ষট্‌চক্রভেদ, নাড়ীতত্ত্ব, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, বিভিন্ন আসন, মুদ্রা প্রভৃতি শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনার বিচিত্র প্রক্রিয়া ও সূক্ষ্মতত্ত্ব অনবদ্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তন্ত্র-সাধনরহস্য সংবলিত কমলাকান্তের এই কাব্যপুস্তকটি বাস্তবিকপক্ষে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন।

কমলাকান্তের শাক্তপদের সংখ্যাও সুপ্রচুর। অনন্যসাধারণ ভক্তি, ঐকান্তিক আত্মনিবেদন ও চিত্তের উদ্বেলিত ভাব-মাধুর্যের আলিম্পনে সাধক কমলাকান্তের শাক্ত সঙ্গীতগুলি বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। কমলাকান্তের শাক্তপদগুলিতে একদিকে যেমন মাতৃপাদপদ্মে সমর্পিত প্রাণের ভক্তি ও আকুলতা শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, তেমনি অপরদিকে তন্ত্রতত্ত্ব ও শাক্ত সাধনার বিচিত্র রহস্যগুলি অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের ন্যায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী শাক্তপদকর্তাদের অধিকাংশই শক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মহারাজা, রাজা, জমিদার ও দেওয়ান প্রভৃতি।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তিদেবীর উপাসক ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে তন্ত্র-সাধনার সবিশেষ প্রসার ঘটেছিল। তাঁর রচিত "অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা-রজ্জুরূপিণী"[৮] তান্ত্রিক শক্তিতত্ত্বের যথার্থ পরিচয়বাহী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহারাজ নন্দকুমার রায় তন্ত্রমার্গের একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তাঁর জীবনাচরণের মধ্য দিয়েও শক্তিশালী তন্ত্র-সাধকের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ওয়ারেণ হেস্টিংস এবং তাঁর কয়েকজন তাঁবেদারের ষড়যন্ত্রে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে। কথিত আছে যে, ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জপ-ধ্যানে বিভোর হয়ে ছিলেন।[৯] মহারাজ নন্দকুমার কয়েকটি সুমধুর শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত পদগুলিতে তন্ত্র-সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ সাধনলব্ধ অনুভূতি এবং প্রগাঢ় ভক্তিরসের অভিসিঞ্চনে অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

বাংলার শাক্তপদাবলীর ইতিহাসে বর্ধমান রাজবংশের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ, তেজশ্চন্দ্র, মহাতাবচাঁদ প্রভৃতি সকলেই তান্ত্রিক সাধনার বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাধকপ্রবর কমলাকান্ত মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের গুরু

ও সভাসদ ছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের পুত্র মহারাজ প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের প্রভাবে তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ তন্ত্রশাস্ত্রানুয়ায়ী দশমহাবিদ্যার ধ্যান-সংবলিত অনেকগুলি শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন।[১০]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কালে বর্ধমানরাজের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় এবং তাঁর পুত্র নন্দকুমার রায়, নন্দকিশোর রায় ও রঘুনাথ রায় বেশ কিছু সংখ্যক শাক্তপদ রচনা করেছিলেন। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। রঘুনাথ রায় তন্ত্রোক্ত সাধন-ভজনে সুগভীর ভক্তির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

বাংলার তান্ত্রিক সাধনা ও শাক্তপদাবলীর ইতিহাসে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের নাম সবিশেষ স্মরণীয়। সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন মহীয়সী নারী রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র। বিশাল জমীদারীর অধিকারী হয়েও রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন এক নিঃস্পৃহ ও নিরাসক্ত ব্যক্তি। তিনি বিষয়-সম্পত্তি পরিচালন-কর্ম ত্যাগ ক'রে সর্বদাই তন্ত্র-সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান, শবসাধনা প্রভৃতি সাধনপদ্ধতির ফলে সিদ্ধতান্ত্রিকরূপে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়। রাজা রামকৃষ্ণের রচিত শাক্তপদগুলিতে তান্ত্রিক সাধন-রহস্য যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনই আদ্যাশক্তির প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও আকুলতা শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

কুচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর এবং ত্রিপুরা রাজের দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ ভক্ত রামদুলাল নন্দী কয়েকটি সুন্দর-রসমধুর শাক্তগীতি রচনা করেছিলেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বহু রাজা-মহারাজা, জমিদার, দেওয়ান, ভক্ত-ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি শাক্তগীতি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শাক্ত-পদাবলীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ভক্ত-কবি হচ্ছেন, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাস প্রভৃতি। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে হরু ঠাকুর, নীলুঠাকুর, এ্যান্টুনি ফিরিঙ্গি, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালা ; নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রভৃতি টপ্পাগায়ক এবং পাঁচালীকার দাশরথি রায়, রসিক রায়, ঠাকুর দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের আরম্ভ, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক আমূল পট-পরিবর্তন। কিন্তু, এই বিরাট পটপরিবর্তনের যুগেও শাক্তপদাবলীর মন্দাকিনীপ্রবাহ শুষ্ক হয়ে যায় নি। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহু কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক শাক্তসঙ্গীত রচনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহাকবি মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম

প্রভৃতির নাম সবিশেষ স্মরণীয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শাক্তসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।[১১] আজও বাংলা সাহিত্যে এই শাক্তগীতি বা শ্যামাসঙ্গীত রচনার গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' তান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বক্ষে ধারণ করেই আবির্ভূত হয়েছিল, তারপর শত শত বৎসর যাবৎ সেই তান্ত্রিক-ভাবনা ও শাক্ত-চেতনা বিচিত্র গতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে পরিপুষ্ট ক'রে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে শাক্ত পদাবলীতে প্রত্যক্ষরূপে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর সাহিত্য-চেতনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রবল জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশমাতৃকার অভিনব রূপ-কল্পনার মধ্যেও ভাস্বর হয়ে উঠেছে বাঙ্গালীর মজ্জাগত শাক্ত-তান্ত্রিক সংস্কার।

বাংলার শাক্তপদাবলী ধারার উদ্ভব ও বিকাশ প্রসঙ্গে আমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, নিছক কবিত্বশক্তির ফলে এই পদগুলি রচিত হয় নি। তন্ত্র-সাধনজাত উপলব্ধিই শাক্তপদসাহিত্যকে বিকশিত করেছে। শাক্তপদকারেরা অধিকাংশই ছিলেন তন্ত্র-সাধক। তন্ত্র-সাধনার বিভিন্নস্তরে আরোহণ ক'রে এই শক্তি-সাধকগণ সহজাত কবিত্বশক্তির আলিম্পনে সেই সাধন-রহস্যকে পরিস্ফুট করেছেন। তন্ত্রোক্ত সাধ্য-সাধনতত্ত্বই শাক্তপদাবলীর মুখ্য বিষয়। জাতির জীবনের এক মহাদুর্যোগময় ক্ষণে শক্তি-সাধক কবিগণ মুমূর্ষু সমাজ-জীবনে তন্ত্র-শক্তির অমোঘ মহিমা সঞ্চারিত করেছেন। কুলবধূর ন্যায় গোপনীয়া ('গুপ্তা কুলবধূরিব'[১২]) তন্ত্রবিদ্যাকে প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে আনয়ন ক'রে শাক্ত পদকারগণ সমসাময়িক বঙ্গ-মানসকে এক নব প্রেরণায় উজ্জীবিত

শাক্তপদাবলী ও তন্ত্র ঃ

বাংলার শাক্তপদাবলীসাহিত্য তন্ত্রের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তন্ত্রশাস্ত্রের সূক্ষ্ম-জটিল তত্ত্বগুলি শক্তিসাধক কবিগণের কণ্ঠে অনবদ্য সঙ্গীতাত্মক বাণীরূপ লাভ করেছে শাক্তপদাবলীতে। তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে আত্মনিয়োগ ক'রে সাধক কবিগণ যে-সকল তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, অথবা তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের যে বিচিত্র অনুভূতিতে তাঁরা আপ্লুত হয়েছিলেন, তা'ই অপূর্ব রসমাধুর্যে উদ্গীত হয়েছে শাক্তপদাবলীতে। তন্ত্রশাস্ত্রের যে নিগূঢ় রহস্যগুলি সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল, শাক্তপদকারগণ সেই রহস্যগুলিকে কখনও সরাসরি প্রত্যক্ষীভূত করেছেন, কখনও বা সমকালীন সমাজ-জীবনের ছায়ালিম্পনে ও যুগ-যন্ত্রণার অভিসিঞ্চনে অভিব্যক্ত করেছেন। এ'প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি

প্রণিধানযোগ্য,—"শাক্ত-পদাবলীগুলি মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালীওয়ালা এবং পরবর্তীকালের কবি-নাট্যকারগণ কর্তৃকও রচিত হইয়াছে—সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তি-আকুতি প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা প্রসূত।"[১৩] এই শাক্ত পদাবলীকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়,—'লীলাসঙ্গীত' ও 'সাধনসঙ্গীত'। 'বাল্যলীলা', 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের গীতিগুলি মূলতঃ 'লীলাসঙ্গীত' বিভাগের অন্তর্গত এবং 'বাল্যলীলা', 'আগমনী', 'বিজয়া' ছাড়া অন্যান্য প্রায় সমস্ত পদই সাধনসঙ্গীত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাল্যলীলার পদগুলিতে গিরিরাজের গৃহে মাতা মেনকার স্নেহচ্ছায়ায় বালিকা উমার মান-অভিমান ও লীলামাধুর্য বর্ণিত হয়েছে। 'আগমনী'র পদগুলিতে উমার পতিগৃহ কৈলাস থেকে পিতৃগৃহ গিরিপুরে আগমনকে কেন্দ্র ক'রে জননী মেনকার স্বপ্ন, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা, গিরিরাজের প্রতি অনুযোগ, আনন্দোদ্বেল হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি অঙ্কিত হয়েছে। 'বিজয়া'র পদগুলিতে উমার পিতৃগৃহ থেকে পুনরায় পতিগৃহে যাত্রা উপলক্ষে মাতা মেনকার উদ্বেগাকুল হৃদয়-বেদনা সকরুণ সুর-মূর্ছনায় ঝঙ্কৃত হয়েছে। শাক্তপদাবলীর এই 'লীলাসঙ্গীত'গুলিতে বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বাস্তবরস-সমৃদ্ধ চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে বটে, কিন্তু এই লীলাবিষয়ক গীতিগুলির মধ্যেও সাধনতত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা রয়েছে। তান্ত্রিক সাধনা এবং শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য এই লীলাসঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়েও দ্যোতিত হয়েছে। 'বাল্যলীলা' ও 'আগমনী-বিজয়া' পর্যায়ের সঙ্গীতগুলি ব্যতীত আর সব গীতিগুলিই সাধনসঙ্গীত পর্যায়ের অন্তর্গত। 'সাধন-সঙ্গীত' বিভাগের পদগুলিতে পরমাশক্তি জগজ্জননীর রূপ, গুণ ও ক্রিয়া, শিবশক্তিতত্ত্ব, ষট্চক্রভেদ, তান্ত্রিকীদীক্ষার তাৎপর্য, শক্তি সাধকের সিদ্ধিলাভের পথ প্রভৃতি তন্ত্র-সাধনার বহুবিচিত্র ক্রম, পদ্ধতি ও রহস্য ঐকান্তিক ভক্তি-আবেগে অনবদ্য গীতিরূপ লাভ করেছে। শাক্তপদাবলীতে এই তন্ত্রতত্ত্ব ও শাক্ত-সাধনার যে প্রতিফলন ঘটেছে, আমরা এইবার তারই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দান করব।

তন্ত্রশাস্ত্রে আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ, গুণ ও ক্রিয়া সম্পর্কে যেসকল তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কালী-তারাদি মহাবিদ্যার ধ্যান-মূর্তির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, শাক্ত-পদকারগণ তারই অনুসরণে জগজ্জননীর রূপ-প্রকৃতির বন্দনা-গীতিগুলি রচনা করেছেন। তন্ত্রগ্রন্থের শবাসনা-নৃমুণ্ডমালিনী-খড়্গাধারিণী, বরাভয়দাত্রী শ্যামার রূপধ্যানের ভক্তিমধুর চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত পদাংশগুলিতে।

(১) "লোলজিহ্বা শবাসনা, শবকর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—

বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ তরঙ্গে, ঘোর বদনা।[১৪]

(২) "দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধির ধারা করালবদনী।
এ নব বয়সী, ঘোর রূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর-কর-রচিত কিঙ্কিণী।।
পয়োধর পীনোন্নত, রুধির-ধারে আবৃত বিকটরূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্ধচন্দ্র সাজে ভালে, হেরি বিবসনী।।
অসিমুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী।
ভীমাবেশী ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদধরি, দক্ষিণারূপিণী।।
চতুর্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অট্ট অট্ট হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়ণী।"১৫

(৩) "অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ-রসনা,
রুধির-ধার-স্রুত বিপুল দশনা,
* * *
অতিক্ষীণ কটি বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিণী,
মহাকাল-কামিণী, উৎকট আসব-পান-মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মর্দিনী টলটল মেদিনী।
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশানবাসিনী।"[১৬]

উদ্ধৃতাংশগুলিতে দেবী কালিকার যে রূপালেখ্য ফুটে উঠেছে, তা' তন্ত্রোক্ত শ্যামাধ্যানেরই অনুরণনমাত্র। নিম্নে তন্ত্রোক্ত কালিকা-ধ্যানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :—

(১) "করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গাবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং।

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাং।
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত ধারাবিস্ফুরিতাননাং।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং।
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং।
***
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।।"[১৭]

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তারাদেবীর তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রের যে উল্লেখ করা হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে শাক্তপদাবলীর নিম্নোক্ত তারারূপের বর্ণনাসমূহ।

(১) "নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী।।
নিরমল নিশাকর-কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী,
নৃকর চারুকর সুশোভিনী
লোলরসনী করালবদনী।।
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দুল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী।।
নিপতিত পতি শব-রূপে পায়,

নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্য সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী।।"[১৮]

(২) "ঊর্দ্ধ জটাজুট গভীর-নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব-বিমর্দিনী।।
দনুজ হ্রাস ত্রাস, লক্ লক্ রসনা,
অসুর শির-চুর, ভীষণ দশনা,
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী।।
নরকর-বেষ্টিত কপালমালিনী,
রুধির-অধরা তারা, শিশুশশী-ভালিনী,
নয়ন-জ্বলন-জ্বালা, সুখ-হৃদি বর্ধিনী।।[১৯]

শাক্তপদকারের কণ্ঠে দেবী ছিন্নমস্তার রূপ-বর্ণনা তন্ত্রশাস্ত্রকে অনুসরণ করেই উদ্গীত হয়েছে।

"কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণা কার নারী।
কমল কর্নিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতিকারী, রতি-কাম তদুপরি।।
তদূর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যালীঢ়চরণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ত্রিনয়ণা শঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ-সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী।
কণ্ঠ-নির্গত-ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজাধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী।।
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বর্ণন করি।
করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করি।।"[২০]

ছিন্নমস্তাদেবীর উপরি-উদ্ধৃত রূপ-চিত্রটি তন্ত্র-বর্ণিত ছিন্নমস্তার ধ্যানমন্ত্রেরই প্রতিরূপ ; যথা,—"স্বনাভৌ নীরজং ধ্যায়েৎচ্ছুদ্ধং বিকশিতংসিতং। তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং

চণ্ডরোচিষঃ। জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধুকসন্নিভং। রজঃ-সত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলমণ্ডিতং। মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাং। ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকং। প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্র-জিহ্বিকাং। পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠাবিনির্গতাং। বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাং। দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাং। অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞো-পবীতিনীং। রতিকামো-পবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ। সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনন্নোতপয়োধরাং। বিপরীতরতাশক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ। ডাকিনীবর্ণিনীযুক্তাং বাম-দক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলোচ্ছল-দ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীং। বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং। কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব। প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাং। সদা ষোড়শবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাং। ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্যানলোপমাং। বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তিবলাকীনীং। দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাং। মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং। লোলিহানমহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। দেবীগলচ্ছদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্বতীং। করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতি-ভীষণাং। আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ।।”[২১]

এইরূপে শাক্তপদাবলীতে দশমহাবিদ্যার (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা) যে রূপ-বর্ণনা ফুটে উঠেছে[২২] তা' সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল দেবীর তান্ত্রিক ধ্যানেরই গীতি আলিম্পন।[২৩] আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার বর্ণনায় শাক্তসঙ্গীতগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে তন্ত্র-বাক্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদ যখন বলেন,—“মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন,”[২৪] তখন তন্ত্রের নিম্নোক্ত বাণীই মনে পড়ে যায়,—

> “শশিসূর্যাগ্নির্নেত্রৈঃ অখিলং কালিকাং জগৎ।
> সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম।।”
>
> —‘মহনির্বাণতন্ত্র’, ১৩।৮।

তন্ত্রের অনুসরণেই যে শাক্ত পদকারগণ আদ্যাশক্তি মহামায়ার মহিমাস্তুতি রচনা করেছেন, তার প্রমাণস্বরূপ আমরা শাক্তপদাবলীর কয়েকটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

(১) “জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।”[২৫]

(২) অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মারূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা-হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী।"[২৬]

(৩) "অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা শ্যামবরণী।
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ।।
যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ।
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব-নিদান।।"[২৭]

(৪) সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
মূলাধার কমলবাসিনী।।
আগমনিগমাতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয়স্থিতি, ত্রিধাকারিণী।।"[২৮]

(৫) "কে জানে মা তব তত্ত্ব মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।"[২৯]

এইরূপে শাক্তপদকারগণ বিভিন্ন পদে পরমাপ্রকৃতি মহাশক্তির রূপ-গুণ-ক্রিয়াকে ভক্তিপ্লুতচিত্তে স্মরণ ক'রে যে মহিমা-তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তা' তাঁদের স্বকলোকল্পিত নয়,—বরং তন্ত্রশাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। তন্ত্র-বর্ণিত নিম্নোক্ত অংশগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(১) "ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
তত্ত্বো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।।
মহদাদ্যণুপর্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তৎধীনমিদং জগৎ।।"[৩০]

(২) "উপাসকানাং কার্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।।
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।।

অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ।।
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্।।"[৩১]

(৩) "ত্বমেব সূক্ষ্ম স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।।"[৩২]

(৪) "নিগুর্ণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্বভূত-প্রকাশিনী।।
সর্বতত্ত্বময়ী দেবী সর্বতত্ত্ব প্রকাশিনী।
ত্রিগুণা চ মহেশানি। ত্রিগুণস্য প্রকাশিনী।।"[৩৩]

শাক্তপদাবলীর 'জগজ্জননীর রূপ', 'মা কি ও কেমন', 'ভক্তের আকুতি', 'ইচ্ছাময়ী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা' প্রভৃতি অংশে পরাপ্রকৃতি মহামায়ার এই নিগূঢ় মহিমা ও শিবশক্তিতত্ত্ব শাক্তপদকারগণের কণ্ঠে নানাভাবে উদ্গীত হয়ে উঠেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের 'পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' সম্পর্কে পূর্বে বিভিন্ন আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তন্ত্রের প্রধান সিদ্ধান্তই হচ্ছে যে,—'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।'[৩৪] অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর দেহটি হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ আছে, এই শরীরে সেই সমস্তগুণ বিদ্যমান। তান্ত্রিক এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডেই সর্বতীর্থ, সর্বপীঠস্থান, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, সপ্তদ্বীপ প্রভৃতির অধিষ্ঠান চিন্তা করেন। তন্ত্রমতে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ হচ্ছে দেহরূপ ভাণ্ড। শাক্তপদকারগণ এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়েই বাহ্যিক তীর্থভ্রমণের কামনা করেন নি। দেহভাণ্ডেই সর্বতীর্থের সন্ধান লাভ করেছেন ;—

(১) "জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান দেহ-কাশী কর ধ্যান ;
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মারূপ ভাব মনে।
ষোড়শদল উপরে বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে।"[৩৫]

(২) "মন, যেতে চাও কেন কাশী
ও মন, পাবি রে সকল ঘরেতে বসি।"[৩৬]

তন্ত্রশাস্ত্রের এই আত্মজ্ঞানলাভ এবং নিজের দেহমধ্যে সর্ব-সর্বতীর্থাদি ও আরাধ্যবস্তুর সাক্ষাৎকারের জন্যই বিভিন্ন সাধন-ক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[৩৭] তন্ত্রোক্ত মানসপূজার বিষয় নিম্নোদ্ধৃত শাক্তপদটিতে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে,—

"হৃদ-কমল-মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে,
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে।।
সহস্রার চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে,
পূজ যথাবিধি মতে, অর্ঘ্য দিয়া মনেরে।
তদামৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান,
আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন ;
চিত্ত পুষ্প, প্রাণধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ,
ক'রে নৈবেদ্যস্বরূপ দেও অমৃত অম্বুধিরে।।
অনাহত ঘন্টা কর বায়ুকে কর চামর।
সহস্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর ;—
শব্দতত্ত্ব কর জ্ঞান, নর্তকী ইন্দ্রিয়গণ,
কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অসি করে ধ'রে।।"[৩৮]

উপরি-উদ্ধৃত অংশটি তন্ত্র-বর্ণিত নিম্নলিখিত অংশেরই অনুবাদ মাত্র ;যথা,—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।।
তেনামৃতে নাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্।।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্।।
অনাহতধ্বনিং ঘন্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।।
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদন্তথা।।

* * *

কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।।"

—'মহানির্বাণতন্ত্র', ৫।১৪৩-১৫১।

তন্ত্রশাস্ত্রের কুলকুণ্ডলিনীতত্ত্ব, ষট্‌চক্রভেদ, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতি নিম্নোক্ত শাক্তপদসমূহে সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে।

(১) "মা কি শুধুই শিবের সতী?
যারে কালের কাল করে প্রণতি।।
ষট্‌চক্রে চক্র করি' কমলে করে বসতি।
সে যে সর্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি।।"[৩৯]

(২) "কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন।।"[৪০]

(৩) "ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা।।"[৪১]

(৪) "কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।
অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্বতত্ত্বাতীত, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্বে ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পর-তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।

* * *

করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল ল'য়ে জীবনে,
মনিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।"[৪২]

উপরি-উদ্ধৃত অংশসমূহে তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা মূলাধার পদ্মস্থিতা পরমাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মে পরম শিবের সঙ্গে সম্মিলনের মাধ্যমে সাধকের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার বা সমাধি লাভের কথা বলা হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত তন্ত্র-বচন সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—

"মূলাধারে সরোজে তু ত্রিকোণং সুমনোহরম্।
কামং ভ্রমন্তং তন্মেধ্যে বালার্ককোটি সন্নিভম্।।

তদূর্ধ্বে কুণ্ডলী শক্তিং তড়িৎ কোটিসমপ্রভাম্।
প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।।

আরাপ্যোরোপ্য শক্তিং কমলজ-নিলয়ামাত্মসাক্ষাৎ ক্রমেষু।
স্থানেষ্বাজ্ঞাবসানে প্রণিহিতহৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ।
নিত্যানন্দাবসানং খড়্গামুদ্গারমহাপদ্মমধ্যান্তরস্থাম্।
ধ্যায়েচ্চৈতন্যরূপামভিনবজলদাং মোক্ষমার্গৈকমার্গাম্।।
সাক্ষাল্লাক্ষারসাভাং গগনগতমহাপদ্মসংস্থাচ্চ হংসাৎ।
পীত্বা দিব্যামৃতৌঘং পুনরপি চ বিশেন্মধ্যদেশংকুলস্য।।"[৪৩]

শাক্তপদকারগণের লেখনীতে এই তান্ত্রিকযোগসাধনার বিভিন্ন তত্ত্ব ও রহস্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী কালিকার গলদেশে দোদুল্যমান মুণ্ডমালা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে,—

(১) "অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃ পাণিকাম্।
পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালীগলদ্রুধির চর্চিকাম্।।"[৪৪]

(২) "অকারাদি ক্ষ-কারান্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।"[৪৫]

অর্থাৎ অ-কারাদি পঞ্চাশটি বর্ণই হচ্ছে মুণ্ডমালার প্রকৃততত্ত্ব। দেবী স্বয়ং পঞ্চাশৎমাতৃকাবর্ণরূপিণী এবং এই বর্ণসমূহ ব্রহ্মস্বরূপ।

"অকারাদিক্ষকারান্তং বর্ণাস্তু শিবশক্তয়ঃ।।
পঞ্চাশচ্চ ইমে বর্ণা ব্রহ্মরূপাঃ সনাতনাঃ।
যেষাং জ্ঞানং বিনা বামে সিদ্ধির্নস্যাদ্ গুরুস্তনি।।"[৪৬]

দেবীর মুণ্ডমালার এই সূক্ষ্মতত্ত্বই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত পদাংশগুলিতে ঃ—

(১) "যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।"[৪৭]

(২) "রাজার মেয়ে রাজনন্দিনী, মুণ্ডমালা পেলে কোথায়?
যখন অসুরগুলো ছিল না মা, তখন কি মা পরতে গলায়?"[৪৮]

(৩) "যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে।।"[৪৯]

শাক্তপদকারগণ আদ্যাশক্তি মহামায়ার গুণ ও মহিমাকে স্মরণ ক'রে ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে যে স্তুতিগীতিসমূহ গেয়ে উঠেছেন, তা' কেবলমাত্র কবিচিত্তে স্বকীয় অনুভূতির ফসল নয়,—ঐগুলির মধ্য দিয়ে সাধন-লব্ধ তন্ত্রতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সাধক কমলাকান্ত যখন বলেন,—

"তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।।"[৫০]

তখন তন্ত্রোক্ত যৌগিকস্নানেরই সঙ্কেত পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রে মূলাধারচক্রে এবং আজ্ঞাচক্রে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীর মিলন-স্থলকে যথাক্রমে যুক্ত-ত্রিবেণী ও মুক্তত্রিবেণী বলা হয়। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী স্বরূপ উক্ত তিন নাড়ীর ত্রিবেণীসঙ্গমে (মিলন-স্থলে) তান্ত্রিক সাধকের যৌগিক স্নান সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ে 'শিবসংহিতা'য় উক্ত হয়েছে যে,—

"ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্লভঃ।।
সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্।।

*   *   *

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাং সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য য স্তজেৎ প্রাণান্ সঃ তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।।"
—'শিবসংহিতা', ৫।১৩৩-১৩৪, ১৩৯।

তান্ত্রিক সাধকগণ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহমধ্যেই সর্বতীর্থের অধিষ্ঠান সন্দর্শন করেন। শাক্তপদকারগণও তাই গেয়ে উঠেছেন,—

(১) "মন, যেতে চাও কেন কাশী
ও মন, পাবি রে সকল ঘরেতে বসি।

দেখ না হৃদে, নয়ন মুদে, শ্যামা-পদে বারাণসী;
বহে তিনটি ধারা সরিদ্বরা, জাহ্নবী বরুণা অসি।"[৫১]

(২) "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।।
সার্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণ-বাসী।

যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী?
হৃৎ-কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি' পাবে কাশী দিবানিশি।।"[৫২]

উপরি-উক্ত পদসমূহ কেবলমাত্র আদ্যাশক্তির চরণে আত্মসমর্পিত কবিচিত্তের ঐকান্তিক আকুলতাই নয়,—ঐ গুলির মধ্য দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্বই অভিব্যক্ত হয়েছে। তন্ত্রে দেহমধ্যে বিভিন্ন তীর্থাদির স্থাননির্দেশসহ যে জটিল সুউচ্চ সাধনতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, তা'-ই- শাক্ত-পদকারগণের কণ্ঠে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। দেহমধ্যে বারাণসী বা কাশীর অধিষ্ঠান সম্পর্কে 'শিব-সংহিতা'য় (৫।১০০) উক্ত হয়েছে যে,—

"ইড়া কি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ।।"

তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিই প্রধান। মহাশক্তির আশ্রয় ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়। চেতন-অচেতন বস্তুসমন্বিত বিশাল সৃষ্টি সেই এক পরমাশক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র। তন্ত্রে আদ্যশক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,—

(১) "ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা।
ত্বয়ৈব ধার্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্।।
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারঃ ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী।।
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিন্ ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ।।"
—'মহানির্বাণতন্ত্র' (১১।৬০৮)।

(২) "শক্তিমার্গং বিনা জন্তোর্ণ ভক্তির্ণ চ সদ্গতিঃ।
শক্তিমূলং জগৎ সর্বং শক্তিমূলং পরং তপঃ।।
শক্তিমূলং পরং কর্ম জন্ম কর্ম মহীতলে।
বিনা শক্তি প্রসাদেন ন মুক্তির্জায়তে প্রিয়ে।।"
—'মুণ্ডমালাতন্ত্র' (১০।৭-৮)।

এইরূপে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে যে শক্তিমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, শাক্তপদাবলীতে তারই ঐকান্তিক অনুরণন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে;যথা,—

(১) "তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অসুরদল-দলনী।।

তুমি আকাশ-প্রকাশ, তুমি গো চপলা-হাস,
প্রলয়ে মা তুমি ভাস, হ'য়ে অনন্তশায়িণী।।
গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সর্বাণী।।"[৫৩]

(২) "শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়।
শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হবে সুনিশ্চয়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয়।।
শক্তিপূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি-যোগে কালে জয়।"[৫৪]

এক উদার-অসাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডল হচ্ছে শাক্ত-পদাবলীর একটা উল্লেখযোগ্য দিক। শাক্তপদকারগণ কৃষ্ণকালী, শিব-শক্তির অভেদত্বকে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

(১) "ও মন, তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
হরি-হর তোর এক হ'লো না।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূলকথা মনে বোঝ না,
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
ক'রে আত্ম-প্রতারণা।"[৫৫]

(২) মন, ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি।।"[৫৬]

(৩) "হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।

নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।"[৫৭]

উদ্ধৃতাংশগুলিতে শ্যাম-শ্যামা, হরিহর, বৃন্দাবন-কাশীর যে একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, তা' কেবলমাত্র পদকর্তাদের ভক্তির আবেগ প্রসূত নয়, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ যুগজীবনে সমন্বয়ের শান্তিবারি অভিসিঞ্চনের প্রয়াসমাত্র নয়। এই অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রের অবদান। পূর্বেই বলেছি যে, শাক্তপদকারগণ অধিকাংশই তন্ত্রমতে সাধন-ভজন করতেন এবং তন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিতি প্রায় সকলেরই ছিল। শিব-শক্তির অভেদত্ব এবং সর্বদেব-দেবী যে সেই এক ব্রহ্মময়ীর অভিব্যক্তিমাত্র, তা' সুপ্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রে বিঘোষিত হয়ে আসছে। 'কুব্জিকা তন্ত্রে' এ'বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,—

"যা তু কৃষ্ণা সৈব কৃষ্ণস্তথা ব্রহ্ম প্রকীর্তিতঃ।।
অভেদং চিন্তয়েৎযস্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
বিভিন্নং চিন্তয়েদ্ যস্তু মূঢ়বুদ্ধিঃ স পাতকী।।

* * *

কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য বৃন্দাবনবিহারিণী।
বংশীনাদ-বিনোদেন মোহয়েত্যখিলংজগৎ।।

* * *

নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্বভূত-প্রকাশিনী।।"
—প্রথম পটল (৩১, ৩২, ৩৪, ৫৪)।

'মুণ্ডমালাতন্ত্রে'ও ভেদজ্ঞানের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে,—

"যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা শিব এব সা।
তত্র যঃ কুরুতে ভেদং স এব মূঢ়ধীর্ণরঃ।।
দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃন্নরকংযাতি রৌরবং পাপপুরুষঃ।।"
—দ্বিতীয় পটল (১৬,১৭)।

বস্তুতঃ, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলকথাই হচ্ছে অভেদজ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞানভূমির উপর অধিষ্ঠিত তান্ত্রিকসাধনার বহুবিচিত্রতার মধ্যে মন্দ্রিত হচ্ছে এক পরম ঐক্যের বাণী। দেবতত্ত্বের

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে তন্ত্র অভেদজ্ঞানেরই জয়ঘোষণা করেছে। শাক্তপদকারগণ তন্ত্রের এই স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই কৃষ্ণ ও কালীর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি। তন্ত্র-প্রভাবের ফলেই তাঁদের কণ্ঠে মহা ঐক্যের বাণী পরমভক্তিভরে উদ্গীত হয়েছে।

"অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।।

* * *

কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-মূর্তি, কভু কাল, কভু যে কালী।

* * *

শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলিঃ—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।।"[৫৮]

শাক্তপদাবলীর 'আগমণী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ভুক্ত লীলাসঙ্গীতগুলির মধ্যেও তন্ত্র-সাধনার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা রয়েছে। 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র সঙ্গীতগুলিতে যদিও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র, পতিগৃহে আগতা কন্যার জন্য মাতার স্নেহাকুলতা এবং কন্যার পতিগৃহে গমনোপলক্ষ্যে মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ ও আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও এইগুলির মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি ঘটেছে। উমা যে আদ্যশক্তি মহামায়া, তিনি যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী, শাক্তপদকারগণ তা' আমাদেরকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(১) "তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে।
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া-ছলে, ব্রহ্মময়ী
মা বলে তোমারে মেনকারাণি।"[৫৯]

(২) "ওহে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে?

লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।"[৬০]

(৩) "তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি,
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ঐ পদ তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।"[৬১]

এইভাবে দেখা যায় যে, 'আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে লৌকিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি তত্ত্ব, আদ্যাশক্তি কালী-তারাদির রূপ-মহিমা, সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গীতগুলিতে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তন্ত্র-নিহিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা—মায়া ও মহামায়া, মানবী ও দেবী, পার্থিব ও অপার্থিবের এক তত্ত্বমধুর সমন্বয় সাধিত হয়েছে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র ভাবোদ্বেল গানগুলিতে।

বস্তুতঃ, বাংলার 'শাক্তপদাবলী'-সাহিত্য তন্ত্রতত্ত্ব ও তান্ত্রিক সাধন-রহস্যের ভাষ্য-গীতি। শাক্ত-তান্ত্রিক মতবাদের এক পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হচ্ছে শাক্তপদাবলী। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে বিশেষ যুগ-প্রয়োজনে শাক্ত-পদকারগণ মাতৃ-বন্দনার যে গীতিমাল্য রচনা করেছিলেন, সেই মাল্যটি তন্ত্রতত্ত্বের বিচিত্র পুষ্পে গ্রথিত। শিব-শক্তিতত্ত্ব, ষট্‌চক্রসাধন, সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ, কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, মানসপূজা, সংসারবদ্ধ মানুষের অবিদ্যা থেকে বিদ্যায় উত্তরণ, মহাশক্তি-মহামায়ার বিচিত্র রূপ ও ক্রিয়া প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি ও আচারানুষ্ঠানের এক অপরূপ সঙ্গীতালিম্পন বাংলার শাক্তপদাবলী সাহিত্য। সমসাময়িক কালের সামাজিক, পারিবারিক এবং কবিগণের ব্যক্তিগত সমস্যা ও সঙ্কট শাক্তসঙ্গীতগুলির স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হলেও এইগুলির মুখ্য বিষয় হচ্ছে তন্ত্রের সাধ্যসাধন-তত্ত্ব। তান্ত্রিক সাধনার বিচিত্র রহস্য ও উপলব্ধিই শাক্তপদাবলীর রস-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে। ভাব ও তত্ত্ব, কাব্য ও দর্শন, রস ও সাধনার এক মনোহর আলিম্পন শাক্তপদাবলী-সাহিত্য।

পাদটীকা

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৩য় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৬ ; পৃ: ১১০৬।
২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', কলকাতা, ১৩৬৭ ; পৃ: ২২৮।
৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১১৩১।
৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১১৩২।
৫. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', কলকাতা, ১৯৬৭ ; পৃ: ৪৪-৪৯।
৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ১১৫৯।
৭. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা', কলকাতা, ১৯৬৭ ; পৃ: ২৫৯।
৮. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'শাক্ত পদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬২ ; ২১৬ নং পদ, পৃ: ১৪৭।
৯. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২৭২।
১০. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১ নং পদ।
১১. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; ১০৮ নং পদ, পৃ: ৭৮।
১২. 'কুলার্ণবতন্ত্র'—১১।৮৪-৮৫।
১৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'প্রাগুক্ত', পৃ: ২২৭-২২৮।
১৪. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ; ৫৬নং পদ, পৃ: ৩১।
১৫. ঐ, ঐ, ১২০নং পদ, পৃ: ৮৫।
১৬. ঐ, ঐ, ১১১নং পদ, পৃ: ৮০।
১৭. রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'তন্ত্রসার', পৃ: ৬০৩-৬০৪।
১৮. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত', ১২১ নং পদ, পৃ: ৮৬।
১৯. ঐ, ঐ, ১২২ নং পদ, পৃ: ৮৬-৮৭।
২০. ঐ, ঐ, ১২৬ নং পদ, পৃ: ৮৯।
২১. তন্ত্রসার, পৃ: ৫৮৬।
২২. অমরেন্দ্রনাথ রায়, 'প্রাগুক্ত' ; পৃ: ৭৬-৯২।
২৩. তন্ত্রসার, পৃ: ৫৬১, ৫৮২-৫৮৬, ৫৯৮-৬০৪, ৬৩৫-৬৫৮।
২৪. অমরেন্দ্রনাথ রায়, 'প্রাগুক্ত' : পৃ: ৭৬।
২৫. ঐ, ঐ, পৃ: ১০১।
২৬. ঐ, ঐ, পৃ: ১০৩।
২৭. ঐ, ঐ, পৃ: ৮৩।
২৮. ঐ, ঐ, পৃ: ১৪২।

২৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯৮।
৩০. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৪।১০-১১।
৩১. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ১৩।৪-৭।
৩২. 'মহানির্বাণতন্ত্র', ৪।১৫।
৩৩. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১।৫৪-৫৫।
৩৪. 'মুণ্ডমালাতন্ত্র', ৬।৪০।
৩৫. অমরেন্দ্রনাথ রায়, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ২২২।
৩৬. ঐ, ঐ, পৃঃ ২২৩।
৩৭. 'তোড়লতন্ত্র', 'কুলার্ণবতন্ত্র', 'কুব্জিকাতন্ত্র', 'শিবসংহিতা' প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৩৮. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ২০৪।
৩৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯৫।
৪০. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৯৮।
৪১. ঐ, ঐ, পৃঃ ২০০।
৪২. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪৬।
৪৩. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ৬।৪০-৬৫।
৪৪. 'নিরুত্তরতন্ত্র', ২।৩৫।
৪৫. 'কামধেনুতন্ত্র', ৪।৭৮।
৪৬. 'কঙ্কলমালিনীতন্ত্র', ১।১১-১২।
৪৭. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, 'প্রাগুক্ত' ;পৃঃ ১০৪।
৪৮. ঐ, ঐ, পৃঃ ১০৪।
৪৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৭৪।
৫০. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৭৭।
৫১. ঐ, ঐ, পৃঃ ২২৩।
৫২. ঐ, ঐ, পৃঃ ২২৩।
৫৩. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৩২।
৫৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ২০৪-২০৫।
৫৫. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৫৯।
৫৬. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৭৫।
৫৭. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪৯।
৫৮. ঐ, ঐ, পৃঃ ১০২-১০৩।
৫৯. ঐ, ঐ, পৃঃ ২৮।
৬০. ঐ, ঐ, পৃঃ ৩১-৩২।
৬১. ঐ, ঐ, পৃঃ ৭০।

পরিশিষ্ট

বাংলার লোকসাহিত্যে তান্ত্রিকসংস্কার ও চেতনা

বাংলার লোকসাহিত্য বাঙ্গালীর ঐতিহ্যগত প্রাণসম্পদ। ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা-উপকথা, ব্রতকথা, জারি-ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, টুসু, ঝুমুর, ঘাটু, বাউল প্রভৃতি লোকগীতি এবং ধাঁধাঁ প্রবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলার লোক-সাহিত্যের যে বহু বিচিত্র বলয়টি গড়ে উঠেছে, তা' বাংলার লোকসংস্কৃতি, লোকমানস ও লোকজীবনের বর্ণোজ্জ্বল স্মারক। এ' প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ;— 'লোকসাহিত্য যেন এক বিরাট মহীরুহ—ইহার মূল অতীতের মধ্যে নিহিত, কিন্তু ইহার কাণ্ডের মধ্যে যে নিত্য-নূতন শাখা-পল্লব সঞ্চারিত, ফুলফল বিকশিত হইতেছে, তাহা বর্তমানের মধ্যে সমাহিত।"[১] যেহেতু "লোকসাহিত্য সামগ্রিক সমাজ-চৈতন্যেরই বাহন,"[২] সেহেতু বাংলার সমাজ মানসেরও সামগ্রিক প্রতিফলন বাংলার লোকসাহিত্য।

বহুযুগ ধরে বাংলার জাতীয় জীবন ও গণমানসে যে-সকল আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, কামনা-বাসনার সঞ্চরণ ঘটছে, বাংলার লোকসাহিত্যের বহু বিচিত্র শাখা তার মূর্ত আলিম্পন। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার সমাজ-জীবনে ও লোকসংস্কৃতিতে যে তান্ত্রিক সংস্কার ও ভাবনা বিজড়িত রয়েছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলার লোকসাহিত্যেও। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাংলার লোকসাহিত্যে এই তান্ত্রিক সংস্কার তন্ত্রচর্চার ফল নয়; এটা বাংলার জনমানসে বহুকাল প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও সংস্কারেরই প্রভাবজাত। পূর্বেই বলেছি যে, প্রাগার্যযুগের বাংলার গণজীবনে যে-সব আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্কার বিদ্যমান ছিল, তার সঙ্গে তান্ত্রিক সংস্কারের সংযোগ রয়েছে। বাংলার আদিম অধিবাসীদের মন্ত্রবিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপে আগ্রহ, নানা দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন গুহ্যক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা তান্ত্রিকতার প্রতিফলন দেখতে পাই। বাংলার লোকজীবন ও লোকমানসে সেই প্রাচীনকাল থেকে তান্ত্রিকতার যে-সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান লালিত ও পরিপোষিত হয়েছিল, বাংলার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ক্ষণে ক্ষণে সেইগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কখনও মন্ত্র বিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মাধ্যমে, কখনও তন্ত্রের 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' ও ষট্‌চক্রভেদকে কেন্দ্র করে, কখনও শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার লোকসাহিত্যে তন্ত্র-

ভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রথমেই বাংলার ব্রতকথাগুলির আলোচনা করা যাক।

ব্রতকথাগুলি বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতিবিম্বন। এ'প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মরণীয়,—"ব্রতকথাগুলির সমাজচিত্রের একটা ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যই নহে,—প্রাগৈতিহাসিক কিংবা আদিম সমাজের বহু উপকরণ ইহাদের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে নরবলি ও ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে (Magical power) বিশ্বাস অন্যতম।"[৪] বাংলার সাধারণ রমনী সমাজই ব্রতকথাগুলির উৎসমুখ। পরিবারের এবং নিজের পারত্রিক কল্যাণ-চেতনা থেকেই নিরক্ষর ও সাধারণ রমনী কুলের দ্বারা বাংলার ব্রতকথা সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত। ব্রতকথার মধ্যে বাংলার বহুকাল প্রচলিত জীবন-সংস্কার প্রোজ্জ্বল। বাংলার অধিকাংশ ব্রতকথাগুলিই লৌকিক। এগুলির নাম যেমন লৌকিক, তেমনই এদের রূপ-প্রকৃতি ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও লোকায়ত-জীবনপ্রবাহের অনুষঙ্গী। এজন্যই যে শাক্ততান্ত্রিক সংস্কার বাঙ্গালী জীবনে সজ্জাগত, সেই শক্তি দেবীর মহিমাকে কেন্দ্র করেই ব্রতকথাগুলি সৃষ্ট। বেশীর ভাগ ব্রতকথাই শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য-সূচক; যেমন,—'সঙ্কটার ব্রত', 'উদ্ধারচণ্ডীব্রত', 'কুক্কুটিব্রত', 'লোটনষষ্ঠী ব্রত', 'কুলকুলতিব্রত', 'কুলাইমঙ্গলচণ্ডীর ব্রত', 'সুবচনী ব্রত' ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্রতের আরাধ্যা ষষ্ঠী, সঙ্কটা, চণ্ডী, বুড়াঠাকুরানী, নাটাই দেবী, প্রভৃতি শক্তিদেবী। পারিবারিক ও জাগতিক বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের জন্য বাংলার রমনীসমাজ শক্তি দেবীকেই আকুলভাবে স্মরণ করেছে। বাংলার জাতীয় মানসে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের যে প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিকাশ ঘটিয়েছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাতত্ত্বের বিস্তার করেছে, কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' দুর্গা এবং কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে' চামুণ্ডার আবির্ভাব ঘটিয়েছে, সেই শাক্ত-চেতনাই বাংলার ব্রতকথাগুলিতে শক্তিদেবীর বিভিন্ন রূপ ও নামের কল্পনা করেছে।

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ বাংলার ব্রতকথাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র ব্রতকথা নয়; রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি বাংলার লোক-কথার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মন্ত্রশক্তি, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ, অলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা মনোভীষ্ট পূরণ। ব্রতকথা ও লোককথাগুলিতে অলৌকিক উপায়ে কার্যসিদ্ধি নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী-মানসে তান্ত্রিক সংস্কারের প্রভাবজাত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলেছেন,—"কামরূপের অন্তর্গত কামাখ্যাতীর্থ একদিন তান্ত্রিকসাধনার পীঠস্থান ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রও ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তান্ত্রিক প্রভাবিত বাংলাদেশ হইতেই একদিন যাদুবিদ্যা ভারতের সর্বত্র এবং ভারত হইতে ভারতের বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়াছিল। সেই সূত্রেই ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস সম্পন্ন লোককথা দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল।

সুতরাং বাংলার লোককথায় ঐন্দ্রজালিক প্রাধান্য থাকিবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।"[৫] 'সঙ্কটার ব্রতকথা', 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা', 'অশ্বত্থপাতাব্রত', প্রভৃতিতে এই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও অলৌকিক উপায়ে ফললাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'জয়মঙ্গলচণ্ডী'র ব্রতকথার অংশবিশেষ উল্লেখ করা গেল ঃ—

"হারালে পাওয়া যায়, মরলে জিয়ানো যায়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সতীন মেরে ঘর হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

'সঙ্কটার ব্রত' প্রভৃতি কয়েকটি ব্রতকথায় নরবলি, সন্ন্যাসী কর্তৃক কালীপূজা, রক্তের পুকুরে ভাসমান নরমুণ্ড এবং অলৌকিকভাবে মৃত মানুষদের পুনর্জীবন লাভ প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জীবনের যে আদিম সংস্কার উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তা' তান্ত্রিক সংস্কার ও চেতনারই ফল। শক্তিপূজায় যেমন কোন কোন স্থানে স্বগাত্র-রুধিরাদির দ্বারা দেবীর তৃপ্তি-সাধনের প্রয়াস দেখা যায়, বাংলার লৌকিক সূর্যপূজার একটি ব্রত কাহিনীতে সেইরকম আচারের ইঙ্গিত পাই; যেমন,—"পাত্রের রানী আপনার জিব কেটে সলতে করে প্রদীপ দিলেন, হাঁটুর মালুই চাকি কেটে তাইতে করে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন।"[৬]

বাংলার ব্রতকথাগুলিতে পাঁচ-আট ইত্যাদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ফল, ফুল বা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণে ফললাভের যে কথা বর্ণিত আছে, তার মধ্য দিয়েও বাঙ্গালী গণজীবনে তন্ত্রোক্ত দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসের সংস্কারই ফুটে উঠেছে। আরও লক্ষণীয় এই যে, বিভিন্ন ব্রতে নানা প্রকার মণ্ডল অঙ্কণের প্রথা দেখা যায়। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও আচারের একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্তাকার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র-অঙ্কন। তন্ত্রে এই যন্ত্রগুলি কাম্যকর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতীক। বাংলার ব্রতকথাগুলিতেও অনুরূপ মণ্ডলাদি অঙ্কন করা হয়; যেমন 'মাঘব্রতে' বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ গর্তঅঙ্কন, 'বুড়া ঠাকুরাণীর ব্রতে' আতপ চাল সহ ত্রিভুজাকার কলাপাতাকে ভাঁজ করে বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি। বাংলার ব্রতকথায় মনোবাসনার ও কাম্যরূপের প্রতীকস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার মণ্ডলাদি অঙ্কন নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী জনজীবন ও লোকসংস্কৃতিতে যে বহুযুগপ্রচলিত সুপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্যের দ্যোতক, তার প্রমাণস্বরূপ ডঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি উল্লেখ করতে পারি ;—"It is.........abundantly clear that rites similar to many of those prescribed in the Tantras were quite well-known among primitive peoples of all countries..........According to scholars some at least of these or similar ones were known to Dravidian and other Non-Aryan peoples of India

from whom they were borrowed by the Aryans and systematised in the Tantras."[৭]

অতএব বাংলার ব্রতকথা ও লোককথাগুলির মধ্যে যে মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের প্রতি বিশ্বাস, ঐন্দ্রজালিক ও অভিচারিক ক্রিয়াদির পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা' বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ও অনুশীলিত তন্ত্রাচার ও সংস্কারেরই পরিচয়বাহী।

বাংলার লোকসাহিত্যের সার্থক পরিচয়বাহী বাংলার বাউলগান। এই বাউল গানে আমরা তান্ত্রিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই। বাংলার বাউল-সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে সত্য, কিন্তু বাউলদের গুহ্যসাধন-প্রক্রিয়া মূলতঃ তন্ত্র-ভিত্তিক। তন্ত্রের গুরুবাদ, 'শিব-শক্তি' বা 'পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব', 'ভাণ্ডাব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব', ধর্মসাধনায় রমণীর প্রয়োজনীয়তা বাউলধর্ম ও সঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তন্ত্র-সাধনার ন্যায় বাউলদের সাধনাও গুরুমুখী। যেহেতু বাউলগণ তন্ত্রের গুহ্য-সাধন-প্রক্রিয়াকে নিজেদের সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু বাউলসঙ্গীতেও তান্ত্রিক গুরুবাদের প্রতিধ্বনি পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে। যেমন,—

(১) "গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী,
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী,
না বাজাও বাজবে কেনে।"

(২) "গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার,
অধঃপাতে গতি হয় তার।"

বাউলগণ পরমসত্য লাভের জন্য মানবদেহকেই মূল আধার মনে করেছেন। তাঁদের 'মনের মানুষ' মানব দেহেই বিরাজিত। বাউলের এই দেহতত্ত্ব-কেন্দ্রিক সাধনা সম্পূর্ণরূপে তন্ত্রাশ্রয়ী। তন্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তিতে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গুণ ও বস্তুনিচয় দেহেই বিদ্যমান। দেহে মধ্যেই নদ-নদী, পর্বত-সমুদ্র, অগ্নি, বায়ু, জল, ব্যোম্, চন্দ্র, সূর্য, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভৃতি চতুর্দশ ভুবন মানবদেহেই বর্তমান। তন্ত্রের এই 'ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' অর্থাৎ দেহের সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যানুভূতি বাউল গানের মধ্যে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। যেমন,—

(১) "আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাপায়ে।।"

(২) "আগে দেহের খবর জান গে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল,
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ।"

(৩) "সে তো এই ভাণ্ডে আছে, ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজলে পাবি কিরে।"

বাউলেরা 'মনের মানুষ' বা পরম সত্যের অনুসন্ধানের জন্য তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদ, 'কুণ্ডলিনী'-যোগক্রিয়া, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতিকে ভিত্তি করেই যে অগ্রসর হয়েছেন, তার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বাউলগীতির অংশবিশেষ উদ্ধৃতি হল ;—

(১) "দ্বিদলে হয় বারামখানা।
চতুর্দলে সাঁই বিরাজ করে, মৃণালে হয় সদরখানা।"

(২) "ষট্‌চক্রীভেদী যবে হবে পাবে তব ঠিকানা।
দেখবে আলোর ভিতর কালো মাণিক
ঘুচবে ভবের যন্ত্রণা।।"

(৩) "কুণ্ডলিনী সহায় রেখে উর্ধ্বে বাদাম তোল,
দশ-ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে জ্ঞান-বড়শিতে টান।"

(৪) "মনের মানুষ হয় রে জনা,
(ও সে) দ্বিদলে বিরাজ করে এই মানুষে,
তুমি সহজ মানুষ চিনলে না।
যোড়শদল আর দশম দলে,
তার পিছে মানুষ দোলে নর্মদার কূলে,
বামে কুলকুণ্ডলিনী, যোগেশ্বরী, যোগরূপিণী।" ৮

বাউলগানগুলিতে 'ত্রিবেণী', 'মৃণাল', 'মণিপুর', 'বারুণী-যোগ', 'কামব্রহ্ম', 'ষট্‌চক্রভেদী', 'অষ্টপাশ', 'ইড়া', 'পিঙ্গলা', 'কুণ্ডলিনী' প্রভৃতি তান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহৃত হয়ে তন্ত্র-সাধনার গূঢ় তত্ত্বসমূহকে নির্দেশিত করেছে।

বাউলগান ও সাধনমার্গে রমণীকে সঙ্গিনী করার অপরিহার্যতার মধ্যে তান্ত্রিক সংস্কারই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাউলগানের মধ্যে সর্বসংস্কারমুক্তি ও তথাকথিত বাহ্য আচারাদির ঊর্ধ্বে উপনীত হওয়ার যে আকুল আহ্বান উদ্গীত হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে বাংলার জীবন-প্রবাহের মূলগত তান্ত্রিক সংস্কার ও ভাবনা।

বাঙ্গালীর বিভিন্ন পূজা-পার্বণকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। এ'গুলিকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতও বলা হয়। বৎসরের বিভিন্ন মাসে অনুষ্ঠিত বিবিধ পূজা-পার্বণ ও উৎসবকে কেন্দ্র করে লোকসঙ্গীতের এই ধারার উদ্ভব হয়। এই পার্বণ সঙ্গীতগুলির মধ্যে একদিকে যেমন পূজা-পার্বণের পৌরাণিক আচারঅনুষ্ঠানের পরিচয় আছে, অপরদিকে তেমনি মানবিক গুণসম্পন্ন লৌকিক রূপটিও বিচিত্র রসরূপ লাভ করেছে। পার্বণ-সঙ্গীতের এই লৌকিক রূপটির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মজ্জাগত শাক্ত-তান্ত্রিক চেতনারও স্ফুরণ দেখা যায়। শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষ্যে যে মেয়েলী গীত শুনতে পাওয়া যায়, তাতে 'মনসা'র পূজায় বলিদানের উল্লেখ আছে,—

"আলিম্পন চিত্রপটে রক্ত পদ্মপাতে।
আতপ-তণ্ডুল ক্ষীর ঘৃত মধু তাতে।।
স্থানে স্থানে পাতিয়াছে রক্ত পদ্মপাতে।
কুশিয়ারী খণ্ড খণ্ড শোভিয়াছে তাতে।।
হংস কবুতর বলি ছাগ মেষ সনে।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে পূজে কল্যাণ কারণে।।
রুধিরে বহন্তি নদী মাংস পক্ষকুলে।
চৌদিকে থাকিয়া লোক হরি হরি বলে।।"

(ময়মনসিংহ)

বাংলার লোকসমাজে তান্ত্রিক সংস্কারের প্রাবল্যের ফলেই মনসা-পূজার এই লোক-গীতিতে 'হরি' নামের সঙ্গে 'রুধিরের নদী' ও বলিদানের প্রসঙ্গটি অবলীলাক্রমে উচ্চারিত হয়েছে।

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে মেয়েলী গীত গাওয়া হয়, তাতে দেবী কালীর তান্ত্রিকী রূপটিই ফুটে উঠেছে। যেমন,—

"বাম হস্তে রুধির ভাণ্ড ডাইন হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করছ রাশি রাশি।।

জিহ্বায় রুধির ধারা গলে মুণ্ডমালা।
হেট্‌মুখে চাইয়া দেখ, মা, পদতলে ভোলা।।"

—(ময়মনসিংহ)

ফাল্গুন মাসে হোলি-উৎসবকে (দোলযাত্রার উৎসব) কেন্দ্র করে বাংলাদেশে কিছু লোক-সঙ্গীত রচিত হয়েছে। হোলিগানে সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ ও বসন্ত ঋতুর বর্ণনাই গীত হয়। কিন্তু, বাঙ্গালীর সংস্কারে শক্তি-ভক্তি এতই প্রবল যে, হোলিগানে সরস্বতী দেবীকে আবাহন জানান হয়েছে। যেমন,—

"এস গো জননী, বাণী বীণাপাণি অম্বিকে,
অজ্ঞান সন্তানে ডাকে, দয়া কর বরদে।

* * *

তব সন্তানে সান্ত্বা কর, মা বিনে আর করে কে।
এস গো জননী, বাণী বীণাপাণি অম্বিকে।"

—(ময়মনসিংহ)

'গম্ভীরা গান' বাংলার লোকসঙ্গীতের একটা উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলাদেশে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে একসময় গম্ভীরা গানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। আদ্য বা শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করেই এই গম্ভীরা গানগুলি রচিত। শিব প্রাগার্য যুগের দেবতা ; শিবের উপাসনা ভারতের এবং বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নানা আকারে প্রচলিত ছিল। বাংলার লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডলে লোকধর্ম, লোকগীতি প্রভৃতিতে শিবের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিবের পূজা অনুষ্ঠানাদিকে কেন্দ্র করে সেই কোন্ সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলার লোকজীবনে নানাবিধ আচার ও সংস্কার প্রচলিত হয়ে এসেছে। শিবই হচ্ছেন বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রাণের দেবতা। তাই, সংসারের নানা অভাব-অভিযোগে ক্লিষ্ট মানুষের সকাতর আর্তি গম্ভীরা গানগুলির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের পটভূমিকায়। সাধারণ গ্রাম্য লোক-জীবনেও যে কি অপূর্ব তত্ত্বজ্ঞান বিরাজ করে, তা' নিম্নোক্ত গম্ভীরা গানের ছত্রকয়টিতে অনুরণিত হয়ে উঠেছে,—

"তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর
কর্মক্ষেত্র এ ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে

কর্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া-রজ্জু নাসায় ছেঁদে কতই বা আর তাড় ?
সুখ-দুঃখ দুই শক্ত জোতা
সেই জোয়ালে আছে যোতা
আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা ওহে দিগম্বর।"

এই গানটির মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় যে-কথাটি উচ্চারিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মায়া-মোহযুক্ত মানুষের সংসার-বন্ধন সম্পর্কে তান্ত্রিক সংস্কার ও ভাবনা। পাশবদ্ধ মানুষ পাশমুক্ত শিবের নিকট অভিমান করেছে জাতীয় জীবনের বহুকালের ধারণা ও সংস্কারের মাধ্যমে।

বাংলার লৌকিক দেবদেবী, লৌকিক ধর্মাচার, লোক সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণমূলক বিবিধ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে অজস্র লৌকিক মন্ত্রমূলক ছড়া সৃষ্টি হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোক-সমাজে 'গুণিন'-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ ওঝা, সাপুড়ে, ভৈরবী, পীর-ফকির, হিরালী, বিবি, বহরদার প্রভৃতি নামে অভিহিত হয় এবং এদের দ্বারাই বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা, আপদ-বিপদ অভীষ্টপুরণ প্রভৃতি কার্যে লৌকিক মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। প্রাগার্যযুগের লোকায়ত সমাজ-জীবনের সংস্কার ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই লৌকিক মন্ত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন উপভাষায় লৌকিক মন্ত্রসমূহ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের এই লৌকিক মন্ত্রের সঙ্গে তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয়। তন্ত্রসাধনায় মন্ত্র-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেমন গুরুর উপর নির্ভর করতে হয়, লৌকিক মন্ত্রের সাধনা ও অনুশীলনে তেমনই গুরু বা উপযুক্ত গুণিনকে অবলম্বন করতে হয়। লৌকিক মন্ত্রের প্রয়োগকারী গুণিনকে শান্ত, সংযমী, শুদ্ধাচারী, দৃঢ়চেতা, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও গুরুভক্ত হতে হয়। গুণিনের এই সমস্ত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য তন্ত্রোক্ত ধ্যান-ধারণারই অনুবর্তী। তন্ত্রে মন্ত্র-সাধন তৎপর ব্যক্তিকে যেসমস্ত নির্দেশাদি পালন করতে হয়, লৌকিকমন্ত্রের প্রয়োগকারী গুণিনকেও সেই সমস্ত নির্দেশ ও আচার অনুশীলন করতে হয়। তন্ত্রমার্গে অভীষ্ট সিদ্ধির ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যশক্তির যথার্থ সমাহার অপরিহার্য। লৌকিক মন্ত্রগুলি সুপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কার ও বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হওয়ায় গুণিনেরা বিভিন্ন লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া প্রভৃতি দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার-বিধির সঙ্গে মন্ত্রশক্তিতে প্রয়োগ করেন। তন্ত্রে মন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণের উপর যেমন ফল নির্ভর করে, লৌকিক মন্ত্রও তেমনই নির্দিষ্ট ক্রম-অনুযায়ী বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় উচ্চারণ করতে হয়। লৌকিক মন্ত্রে তন্ত্র-প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ আমরা নিম্নে কয়েকটি মন্ত্র উল্লেখ করলাম।

(১) প্রসব বেদনায় 'জলপড়া' মন্ত্রের অংশবিশেষ ঃ—

"ওরে ব্যথা খারে রক্ত
রক্ত খা ওরে ব্যথা।
যদি নড়িস চড়িস
কালীর নাম স্মরণ করিস্।
ওরে ব্যথা চেয়ে দ্যাখ
কালীর চরণে ভস্ম হয়ে থাক।
কার আজ্ঞে দহাই মা কালীর আজ্ঞে
অমুকের ব্যথা ভস্ম হয়ে যাকগে।"[৯]

(২) রমণী-বশীকরণ মন্ত্র (সিন্দুর মন্ত্র) ঃ—

"সিন্দুর সিন্দুর সিন্দুর পাতি।
কামুক্ষা পর্বতে তোমার উৎপত্তি।।
সিন্দুর সিন্দুর সিন্দুর কপাট।
কালীর বদনে রক্ত হয় দোপাটি।।
হৃদয়ের সিন্দুর এই কপালে পরি।
শিব দুর্গা আর রতি কামের স্মরণ করি।।"[১০]

(৩) ভূতঝাড়ান মন্ত্র (সরিষা বাণ) ঃ—

সরিষা বাণের চোটে গগন ফাটে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা কাটে।
ডাকিনী যোগিনী পালায় পালায় দানব দূত
সরিষার বাণে পালায় যত প্রেত ভূত।
মন্ত্রের মান্য যদি রাখিবারে চাও
যথা হইতে আসিয়াছিলে তথা চলি যাও।
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামাক্ষ্যার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।"[১১]

কোথাও কোথাও তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের অনুসরণে মন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন,—

"ওঁ হ্রীং হং ফট্ স্বাহা।
তিন চাপড়ে বিষ পালা।।"[১২]

তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। বাংলার লোকসংস্কৃতির সেই সুপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক লৌকিক মন্ত্রগুলিতে তারই স্বাক্ষর বিদ্যমান।

আমরা বাংলার লোকসাহিত্যে তন্ত্র-ঐতিহ্যের একটা সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দান করলাম। অতিপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার লোকজীবন ও লোকমানসের নানা স্তরে তান্ত্রিকতার ধারা বয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। বাঙ্গালীর মানস-চৈতন্যে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বহুযুগব্যাপী যে তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক-সংস্কার প্রবাহিত হয়েছে এবং প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তন্ত্র-প্রভাবের যে গভীর ও ব্যাপক স্বাক্ষর বিদ্যমান, সেই তান্ত্রিক সংস্কার ও চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলার লোকসাহিত্যের ব্রতকথা, উপকথা, লোকগীতি, ছড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায়। তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব, যৌগিক প্রক্রিয়া, মন্ত্র ও দ্রব্যশক্তিতে বিশ্বাস, বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাংলার জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে গভীর ও ব্যাপকভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল বলেই বাংলার লোক-জীবন-সম্ভূত লোকসাহিত্যেও তার সুরমূর্ছনা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

পাদটীকা

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬২ ; পৃঃ ২৯।

২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ১২।

৩। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', কলকাতা, ১৩৬৪ ; পৃঃ ১৮২।

৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'প্রাগুক্ত', পৃঃ ৫৫১।

৫। ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪৬।

৬। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'বঙ্গে সূর্যপূজা ও সূর্যের নূতন পাঁচালী', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৪০ ; পৃঃ ১-১১।

৭। Chintaharan Chakraborty, 'Tantras, Studies on their Religion and Literature', Kolkata, 1972; Page-9.

৮। দ্রষ্টব্যঃ—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', কলকাতা, ১৩৬৪।

৯। সুভাষমিস্ত্রি, 'দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র', কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৮৫।

১০। ঐ, ঐ, পৃঃ ১০১।

১১। ঐ, ঐ, পৃঃ ১০২।

১২। ঐ, ঐ, পৃঃ ২১৮।

সমাপ্ত